শ্রেষ্ঠ গল্প

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

(প্রথম পর্ব)

তের "বি" ব্লক বাঙুর এভিন্যু
কলকাতা সাত লক্ষ পঞ্চান্ন

SUCHITRA BHATTACHARYA
SRESHTHA GALPA
(1st. Part)

BCSC Public Library
11th Fin. Com No. 796
11th Fin. Com. M R No. 1092

প্রচ্ছদ ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

॥ প্রকাশক ঃ ভারতী দত্ত 'পুষ্প'
প্রযত্নে ঘোষ লাইব্রেরী, ১৩ ব্লক 'ব' বাঙুর এভিন্যু, কলকাতা-৭০০০৫৫ ॥ বর্ণ গ্রন্থনে ঃ দি এক্‌জিকিউটিভ প্রিন্টার, ৩৭ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ ॥ মুদ্রণে ঃ শ্রী পীযুষ ভট্টাচার্য গিরি প্রিন্ট সারভিস ৯১, বৈঠকখানা রোড কলিকাতা-৭০০০০৯ ॥
[চিঠি পত্র এবং যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ 'এ' ব্লক বাঙুর এভিন্যু ফ্ল্যাট নং ৬, কলি-৭০০০৫৫]

উৎসর্গ

সুমিত্রা ভট্টাচার্য

অমিতাভ ভট্টাচার্য

প্রিয়জনেষু

আমাদের প্রকাশিত

সুচিত্রা ভট্টাচার্যর বই

'প্রেমের গল্প'

সূচী

আরও ছ'ইঞ্চি	৭
টান	২০
অন্তু বাঁচেনি	৩৫
আমি মাধবী	৪৯
ঊনসত্তর আর তেষট্টি	৬০
সাত বছর এগারো মাস আট দিন	৭৩
মানুষ যেমন	৮৪
বিকেল ফুরিয়ে যায়	৯৯
দৃষ্টিহীন	১২০
সাদা গুঁড়ো লাল রং	১৩৬
দুই নারী	১৫২
দ্বিতীয় মুখ	১৬২
শহিদের বাবা	১৭১
সীমার মধ্যে	১৮৪
আজ সুবর্ণজয়ন্তী	১৯৭
অনুভব	২১০
বিপ্রতীপ	২২২
মধ্যবিত্ত	২৩২
রামধনু রং	২৪৬
এই মায়া	২৫৮
খাঁচা	২৬৭
আত্মহত্যার পরে	২৮৪
দাগবসন্তী খেলা	২৯৯
নারীতান্ত্রিক	৩১১

আরও হুইস্কি

চা খেতে খেতে আপন মনে মাথা নাড়ছিল দীপক। আপন মনেই মন্তব্য করল,—ফ্ল্যাটটায় একটা মোক্ষম ডিফেক্ট আছে।

চিত্রলেখা পাশেই, সোফায়। চোখ খবরের কাগজে গাঁথা, হাতে পেনসিল। সাড়ে আটটা বাজে, এবার সে স্নানে যাবে, অফিস বেরোনর সময় প্রায় হয়ে এল। তার আগে পঞ্চম পৃষ্ঠার শব্দজব্দর সমাধান সেরে ফেলছে দ্রুত। নেশা।

কিন্তু এমন একটা টিপ্পনী সে উপেক্ষা করে কী করে? বিশেষ করে এই নতুন ফ্ল্যাট নিয়ে?

গ্রীবা হেলিয়ে স্বামীকে দেখল চিত্রলেখা,—কী ডিফেক্ট?

—আমাদের জানলার গ্রিলগুলো লক্ষ করো।

—করেছি। যথেষ্ট মজবুত। এত মোটা গেজের গ্রিল এখন আর কেউ লাগায় না।

—ওহ্ হো, সে কথা বলিনি। দীপক উঠে জানালার ধারে গেল,—ভাল করে দ্যাখো। গ্রিলটা ভেতরে, পাল্লাগুলো বাইরে!

—এ আর এমন কী! চিত্রলেখা ঠোঁট উল্টে আবার শব্দের হেঁয়ালিতে মনোযোগী। নির্লিপ্ত ভাবে বলল,—সব বাড়িতেই এরকম থাকে।

—যার থাকে, তার থাকে। আমাদেরটা এরকম হবে কেন? দীপক সিগারেট ধরাতে ধরাতে সোফায় ফিরল। বিজ্ঞের মতো বলল,—জানো এতে কত অসুবিধে? আজ যদি একটা পাল্লার কাচ ভাঙে, মিস্ত্রি এসে সারাবে কী করে? এই চারতলায়?

—যেভাবে সবাই সারায়।...অকারণে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?

—কারণ মগজে আমার কিছুটা ঘিলু আছে। দীপক পুটুস করে একটু হুল

ফুটিয়ে নিল,—তোমার কোনও প্র্যাকটিকাল সেন্স আছে? বাইরে থেকে ভারা বেঁধে উঠতে হবে মিস্ত্রিকে...। এবার তার খরচটা হিসেব করো। একটা কাচ রিপ্লেস করতে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোবে।

—সক্কাল সক্কাল কু গাইছ কেন বলো তো? কাচ কেন ভাঙবে?

—বা রে, ভাঙতে পারে না? বল লেগে ভাঙতে পারে, ঢিল লেগে ভাঙতে পারে...

—এই চারতলা অব্দি বল আসে? দেখেছ কোনওদিন?

একটু বুঝি থমকে গেল দীপক, তবে দমল না। তর্ক জুড়েছে,—ঝড় বৃষ্টিতেও তো কাচ ভাঙে, না কী? এই পরশু সন্ধেবেলা আমরা সব জানালা হাট করে রেখে বেরোইনি? ভাগ্যিস ঝড়টা ফেরার পর উঠল...।

এ মানুষকে নিয়ে আর পারা যায় না। এই হলে সেই হত, ওই হলে সেই হবে...! এখন এই নিয়ে কানের কাছে একটানা রেকর্ড বাজিয়ে যাবে।

চিত্রলেখা কাগজ ভাঁজ করে রাখল, রিডিং গ্লাস খুলেছে চোখ থেকে। ভুরু কুঁচকে বলল,—বুঝলাম। কিন্তু কী করতে হবে শুনি?

—ভাবছি।

—নিশ্চয়ই এখনই পাল্লাগুলো খুলে উল্‌টো করে বসাতে বলবে না?

—সে তো হবেও না। আমি দেখে নিয়েছি। পাল্লা ফ্রেমের সঙ্গে ওয়েল্ডিং করা আছে, গ্লাস আটকানোর খাঁজগুলোও বাইরের দিকে।

—তাহলে?

—দেখি। চিন্তা করি।

—করো। আমি উঠছি। ...তোমার আজ ফ্যাক্টরি যাওয়া নেই?

—একটু দেরিতে বেরোব। আগে ব্যাঙ্কে কাজ আছে।

—তাহলে তো এখন অঢেল ভাবনার সময়! ভাবো বসে বসে। হাত পা ছড়িয়ে ভাবো।

উঠে শাড়ি সায়া গুছিয়ে শোওয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুমটায় ঢুকে গেল চিত্রলেখা। ফুল ফোর্সে চালিয়ে দিয়েছে শাওয়ার। এখন আর এ ভাড়াবাড়ির বাথরুম নয়, জল ফুরোলে বাড়িওয়ালাকে পাম্প চালাতে বলতে গিয়ে কাঁটা হয়ে থাকতে হবে না। নিজের নিজের, এই ইট কাঠ টাইলস পাইপ কল সব এখন নিজের।

চিত্রলেখার ঠোঁটে মিটি মিটি হাসি। দীপকটা যেন কী! এই ফ্ল্যাটে ঢোকার পর থেকে একটার পর একটা খুঁত বার করে চলেছে। ...এ হেহেহে, পুবে যে কেন একটা ব্যালকনি নেই! ...ওহ্ লফটগুলো কী চাপা, মাথা গলানো যায় না!

...ইশ্, কী চয়েস ছিল ঘোষালের, সব কটা সিস্টার্ন বেসিনের রং ক্যাটকেটে! আশ্চর্য, ফ্ল্যাট পছন্দ করার সময়ে দীপক কিন্তু আগাগোড়া সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সব দেখে নিয়েছে। খুঁটিয়ে, বাজিয়ে। অথচ এখন পদে পদে অন্য সুর। কাল্পনিক সমস্যা তৈরি করে কী যে সুখ পায়!

চিত্রলেখারা ফ্ল্যাটটা কিনেছে তিন মাস, বাস করছে সবে মাস দেড়েক। ফ্ল্যাটটা একবারে নতুন নয়, আবার পুরোনোও নয়। বছর পাঁচেক বয়স, তবে এখনও মোটামুটি আনকোরাই লাগে। কারণও আছে। ফ্ল্যাটের পূর্বতন মালিক হেমন্ত ঘোষাল একটি দিনের তরেও এখানে বাস করেনি। সে থাকে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন, বন্ধুর জোরাজুরিতে ফ্ল্যাটটা কিনেছিল। কিন্তু তার ছেলেমেয়েরা রইস এলাকা ছেড়ে ঢাকুরিয়া স্টেশনের এপারে আসবেই না।

দালালের মুখে খবর পেয়েই চিত্রলেখা-দীপক ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কতদিন ধরে যে তারা একটা নিজস্ব মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছে! যদি দরে বনে তো চেহারা পছন্দ হয় না, যদি রূপ মনে ধরল তো দাম শুনে আঁতকে পিছিয়ে আসে। সে তুলনায় এ ফ্ল্যাটখানা একদম খাপে খাপে। তারা থাকত হাজার স্কোয়ার ফিটের ভাড়াবাড়িতে, এটা এগারোশো পাঁচ। দামটা সাধ্যের একটু বাইরে হলেও ছোঁয়া যায়। এই সাইজের নতুন ফ্ল্যাট আরও দু চার লাখ বেশি দিতে পারলে হয়তো জুটে যেত, কিন্তু সেটা এমন সুন্দর হত কি?

সত্যিই সুন্দর। কর্নার প্লটের বাড়ি। চমৎকার প্ল্যান। তিন তিনখানা ঘর, কোনওটাই খুপরি খুপরি নয়, দুটো অ্যাটাচড্ বাথরুম, একখানা ব্যালকনি, টানা ড্রয়িং ডাইনিং স্পেস, সেটাও বেশ বড়সড়, পছন্দসই রান্নাঘর...। লাল্টু পর্যন্ত দেখে বিমোহিত। মাত্র এগারোশো পাঁচ স্কোয়ার ফিটে কী সুন্দর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফ্ল্যাটটা করেছে যা অ্যাপারেন্টলি অনেক বড় মন হয়।

চিত্রলেখার অবশ্য প্রথম দিকে সামান্য খুঁতখুঁতুনি ছিল,—লিফ্ট নেই, এই বয়সে চারতলা ওঠা-নামা করা...

দীপক তখন বলেছিল,—আফটার ফিফ্টি এক্সারসাইজ ইজ মাস্ট। রোজ সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে ওঠা-নামা করবে, আর্থারাইটিস ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

—একেবারে ওপরতলায় কিন্তু গরমও হবে খুব।

—আর চারদিক যে ফাঁকা, সেটা ভাবছ না? এত আলো বাতাস জীবনে কখনও পেয়েছ? হাওয়ায় উড়বে উড়বে...। ছেলে তো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোচ্ছে, গরমে হাঁসফাস করলে ছেলে মার জন্য এসি বসিয়ে দেবে।

তা কেনার আগে চিত্রলেখা যাই বলুক, মালকিন বনার পর আর কি কিছু উচ্চবাচ্য করেছে? অথচ সেদিনের যুক্তিবাদী দীপক অনবরত কুটুস কুটুস করে চলেছে এখন।

স্নান সেরে বেরিয়ে সোজা খেতে বসে গেল চিত্রলেখা। সরকারি অফিসের চাকরি, একটু দেরি করে বেরোলে ক্ষতি হয় না, তবে আজকাল খুব কড়াকড়ি চলছে। তার ওপর অফিসের অনেকটা দায়িত্বই চিত্রলেখার কাঁধে, সে সময়মতো না পৌঁছলে নীচের লোকেরা আরও জো পেয়ে যায়। মাস গেলে সতেরো আঠারো হাজার টাকা দিচ্ছে সরকার। নেহাত ফেলনা নয়, একটু কষ্ট করে নয় বেরোলই তাড়াতাড়ি। পরিশ্রমকে কি কখনও চিত্রলেখা ভয় পেয়েছে?

রাতদিনের কাজের লোক সুবলা ভাত বেড়ে দিয়েছে। খেতে খেতে চিত্রলেখা ড্রয়িংস্পেসের দিকে তাকাচ্ছিল। এখনও চুল পাকাতে পাকাতে জানালা পর্যবেক্ষণ করছে দীপক।

চিত্রলেখা হেসে ফেলল। খ্যাপা, একেবারে খ্যাপা।

দুই

বাড়ি ফিরতে আজ একটু দেরিই হয়েছিল। গড়িয়াহাট নেমেছিল চিত্রলেখা। ছোটখাটো কেনাকাটা করতে। ঘর সাজানোর টুকিটাকি। শৌখিন ফুলদানি, পোরসিলিনের অ্যাশট্রে, টেরাকোটার দুটো গণেশমূর্তি, এই সব। ফ্ল্যাট তো শুধু কিনলেই হয় না, সাজাতেও হয়।

গত দেড় মাস ধরে ফ্ল্যাটখানাকে মনের মতো করে তুলছে চিত্রলেখা। কোথায় সেই চাঁদনি ঘুরে পর্দা টাঙানোর বাহারি রড কিনে আনল, এজ্‌রা স্ট্রিট চুঁড়ে চুঁড়ে নয়নসুখ ল্যাম্পশেড, দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মানানসই পর্দার কাপড় কিনেছিল নিউমার্কেট থেকে, বালিগঞ্জের নার্সারি থেকে পাতাবাহারের টব...। একদিন নিলামঘর ঘুরে একজোড়া কাচের পুতুলও কিনল, সাহেব মেম। অনেক দিন ধরে ভেঁজে রেখেছিল নিজস্ব একটা কিছু হলে তবেই...। কেনাকাটা ক্রমে ক্রমে প্রায় নেশায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এখন কোনওদিন শূন্য হাতে ফিরলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

ডোরবেল বাজাতেই আজ দরজা খুলেছে দীপক। প্রথম বাক্য,—গরিবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়, বুঝলে!

—কেন, কী হল?

—যাও, তোমার ছেলের ঘরটা দেখে এসো। একটা কাচের পাল্লা গন্‌।

হাতের মোড়ক ফেলে রেখে ঊর্ধ্বশ্বাসে চিত্রলেখা লান্টুর ঘরে।

হ্যাঁ, ঠিকই তো। কাচ ভেঙে খানখান হয়নি বটে, তবে স্পষ্ট চিড় খেয়ে গেছে।

চিত্রলেখা উদ্বিগ্ন মুখে বলল,—কী করে হল?

—আমি কী করে জানব! আমি সারাদিন বাড়ি ছিলাম? ...সুবলাও কিছু বলতে পারল না। ...হয়তো আগেই সূক্ষ্ম চিড় ছিল, আমরা বুঝতে পারিনি।

—এখন কী হবে?

—ফাটা আরও বাড়বে। কোনওদিন ঝাং করে ঝরে পড়বে।

—সর্বনাশ! বিপদ হয়ে যাবে তো!

—আমাদের মাথায় পড়ার চান্স কম। হয়তো রাস্তার কোনও আনফরচুনেট ম্যান...।

—যাহ্, কী ফাজলামি করছ? বলো না এখন কী করা যায়?

—সারাও। দুশো টাকার কাচে দুহাজার টাকা লেবার চার্জ দাও। দীপক ফিক ফিক করে হাসছে,—বাড়িতে তোমার কটা কাচের পাল্লা আছে শুনেছ? ধরো, প্রতি মাসে যদি একটা করে ঝরে...

—এই, ভয় দেখাচ্ছ কেন? চিত্রলেখা বোকা বোকা হাসল,—বলো না কী করা যায়?

—পথে এসো সোনা। পঞ্চান্নর দীপক একান্নর চিত্রলেখার গালে বহুকাল পর একটা টুসকি দিল,—স্বীকার করো আগে, আমার আশঙ্কাটা খুব অমূলক ছিল না?

—মানছি তো।

—গুড। দীপক ছেলের ফাঁকা খাটে শুয়ে পড়ল, ঠ্যাং নাচাচ্ছে, সল্যুশান একটা আছে। এ বিট কস্টলি, কিন্তু পারমানেন্ট।

—কী রকম?

—গ্রিলগুলো পুরো হাওয়া করে দাও।

—সেকি! চোর ঢুকবে না? চিত্রলেখা বিছানার ধারে,—চোরেরা রেনপাইপ দিয়ে ওঠে, আমি জানি।

—আহা, তুমি তো প্ল্যানের হাফটা শুনলে। দীপক উঠে বসেছে,—ভাবছি কী জানো? পাল্লার বাইরে দিয়ে বক্সগ্রিল করে দেব। সেফ্‌টিও রইল, পাল্লাও আমাদের হাতের মুঠোয়। আমি নিজে নতুন কাচ কিনে এনে পুডিং দিয়ে ফ্রেমে সেট করে দেব তখন।

তা অবশ্য পারে দীপক। ঘরোয়া এই ধরনের কাজে তার দারুণ উৎসাহ, ধৈর্যও আছে। হয়তো নিজে নীচ থেকে জীবন শুরু করেছিল বলেই কোনও কাজে সঙ্কোচ নেই। সিস্টার্নের সাইফন ঠিক করছে, ইলেকট্রিকের ফিটিং বদলাচ্ছে, কলে ওয়াশার

লাগাচ্ছে, কিংবা হয়তো বসে গেল বেতের আরামকেদারাটা নিজে হাতে রং করতে...। দীপকের কারখানাটাও মেশিনপত্র তৈরি করার। নিজে মালিক হয়েও এখনও লেবারদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে দীপক।

আইডিয়াটা মন্দ লাগল না চিত্রলেখার। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল,—কিন্তু খরচাপাতি কেমন হবে কিছু এস্টিমেট্ করেছ?

—পনেরো বিশ হাজার তো পড়বেই। তবে আমার চেনা লোক আছে, টাকাটা ধীরেসুস্থে দেওয়া যাবে।

—বলছ?

—বলছি তো। দেখো তখন তোমার ঘরের শোবার ঘর কেমন খুলে যাবে। ইচ্ছে হলে জানালায় টব সাজাতে পারো, লতানে গাছ ঝুলিয়ে দিতে পারো জানালা থেকে, মন করলে গ্রিলে বসে ছোট্ট খুকির মতো বাইরে পা বার করে দোলাতেও পারো...

—উফ্, তুমি না...। চিত্রলেখা কপট ভ্রূভঙ্গি করল,—খেয়াল আছে ছেলের বয়স বাইশ হয়ে গেছে? আর এক বছর হলেই সে আই আই টি-র ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে?

—প্রেমের কি বয়স থাকে ডার্লিং? এখনও যে তোমাকে আমার সেই খুকিটি ভাবতে খুব ইচ্ছে করে...। খপ করে চিত্রলেখার হাতটা ধরল দীপক।

—মরণ।

দরজায় সুবলা। হাতে চায়ের কাপ। জিভ কেটে দাঁড়িয়ে আছে।

তিন

দস্যুর মতো বাড়িতে হানা দিল পাঁচ মিস্ত্রি। হাতে জাম্বো সাইজের ইলেকট্রিক ড্রিলিং মেশিন, ইয়া ইয়া হাতুড়ি ছেনি নেহাই বাটালি...। দুটো দিন ধরে যেন তাণ্ডব চলল গোটা ফ্ল্যাটে। পুরো গ্রিল হাওয়া, জানালায় একের পর এক খাঁচা বসে যাচ্ছে, আগুনের ফুলকি ছিটছে, দমাদম হাতুড়ির আওয়াজে কানে তালা প্রায় লাগে লাগে।

পুরো চার দিন চিত্রলেখার অফিস বন্ধ। ক্যাজুয়াল লিভ। দিনে পাঁচবার করে কারখানা থেকে মোটরবাইক ছুটিয়ে এসে দীপকও কাজের হালচাল দেখে যাচ্ছে। মিস্ত্রিদের কাজের দাপটে দেওয়ালের রং চটে গেল জায়গায় জায়গায়। পুরো কাজ চোকার পর আবার রং মিস্ত্রি ডাকো, সযত্নে রঙের টাচ দাও।

পুরো কাজ শেষ হওয়ার পর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল চিত্রলেখা।

ফ্ল্যাটের বাহার দেখে চিত্রলেখা এখন আরও মুগ্ধ। কারুকাজ করা গরাদ দূরে

সরে গিয়ে অন্দর যেন আরও মোহনীয় হয়ে উঠেছে। চিরটাকাল তারা একতলায় কাটিয়েছে, আকাশ দেখার জন্য বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হত। চারতলায় উঠে আকাশ যেন অনেক কাছে নেমে এসেছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে ওই নীল গগন এখন যেন আরও প্রকাণ্ড দেখায়। ঝড়বৃষ্টির দিনে মনে হয় নীলচে বিদ্যুৎ বুঝি ঘরে ঢুকে পড়ল, ধারা বর্ষণের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ফেরানো যায় না। পুব আকাশ থেকে চাঁদ জ্যোৎস্না বিছোয় চিত্রলেখার শোওয়ার ঘরে, দক্ষিণ আকাশে রাতভর তারা ঝলমল করে।

চিত্রলেখা এখন নীচটাও বেশ পরিষ্কার দেখতে পায়। বক্সগ্রিলের জানালা দিয়ে ঝুঁকলে চারতলা থেকে রাস্তার মানুষগুলোকে কেমন অকিঞ্চিৎকর লাগে। সত্যি, ওপরে ওঠায় একটা আলাদা রোমাঞ্চ আছে। ওই গ্রিল দূরে সরে না গেলে চিত্রলেখা হয়তো বুঝতেই পারত না।

ঘরগুলোও যেন আরও বড় হয়ে গেছে এখন। হয়তো চিত্রলেখার মনের ভ্রম, তবু মনে হয় আলো বাতাসও বেড়ে গেল।

ভাগ্যিস দীপকের মাথায় বুদ্ধিটা এসেছিল। শোভাও বাড়ল, স্পর্শকাতর কাচেরাও এখন দিব্যি নিরাপদ।

লাল্টুর এখন দারুণ ব্যস্ত সময়। সামনের মাসে সেমিস্টার পরীক্ষা, ফাইনাল ইয়ার বলে অসম্ভব পড়ার চাপ, তবু তারই মধ্যে খড়গপুর থেকে ঘুরে গেল দু দিনের জন্য। সেও তারিফ করল বাবার, সঙ্গে সঙ্গে পরামর্শও দিল কিছু, নিজস্ব কায়দায়।

—কী ঘরে সব পাতাবাহারের গাছ রেখেছ মা? এগুলো খুব পাতি জিনিস, লোয়ার মিডলক্লাসদের বাড়িতে থাকে।

—ওমা সেকি! শখ করে আমি আর তোর বাবা এতগুলো টব কিনে আনলাম...

—দরজার বাইরে রাখো। ব্যালকনিতে রাখো। সিঁড়িতে। ল্যান্ডিং-এ।

—ভেতরটা একেবারে ন্যাড়া হয়ে যাবে না? কী ফাইন একটা গ্রিনের এফেক্ট এসেছিল...

—একটু অন্যভাবে ভাবো। গাছ রাখো, কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের। হোয়াই ডোন্ট ইউ ট্রাই ফর ফ্লাওয়ারস্ মা? বক্সগ্রিলে বসিয়ে দাও, ব্যস ডিউটি ফিনিশ। রোদ্দুর তো পাবেই, বর্ষা চলছে, এখন তোমায় রোজ ভৃঙ্গারও উপুড় করতে হবে না।

খাসা বলেছে তো লাল্টু! চিত্রলেখা আর দীপক মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ব্যাপারটাকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা করাই যায়। ফুলগাছে ভরিয়ে দিলে বেশ একটা মালঞ্চ ভাব আসবে না ফ্ল্যাটে?

চার

চিত্রলেখার বাতায়নে এখন কুসুমের সমারোহ।

শোওয়ার ঘরে কামিনী ফুটেছে, ডাইনিং উইন্ডোয় গন্ধরাজ, বসার জায়গাটাতে হাসনুহানা। লাল্টুর ঘরের জানালায় চাঁপা রেখেছে চিত্রলেখা, কুঁড়ি এসে গেছে, ফুল ফুটি ফুটি। ছোটঘরটায়, যেখানে লাল্টু এলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা মারে, কিংবা চিত্রলেখা-দীপক চেনা পরিচিতদের ডেকে আসর জমায়, সেখানে এখন টবের গাছে বকুলফুল। সব কটা গাছই কেমন স্কয়াটে খর্বুরে হয়ে আছে, কিন্তু ফুল ফোটার কোনও খামতি নেই।

যেন দীপক-চিত্রলেখার পুষ্পিত বাসনারা সংহত হয়ে সৌরভ ছড়াচ্ছে গবাক্ষে।

সেদিন রাত্রে ঘুম আসছিল না চিত্রলেখার। সারাদিন আজ বৃষ্টি হয়েছে অঝোরে, একটু আগে মেঘ কাটল। জাল জাল মেঘের ওপারে দেখা দিয়েছে এক অস্পষ্ট চাঁদ, ভাঙা ভাঙা কিরণ এসে পড়েছে ঘরে, সঙ্গে কামিনী ফুলের গন্ধ—মনটা কেমন আকুল হয়ে যাচ্ছিল চিত্রলেখার।

পাশে দীপক ভোঁস ভোঁস নাক ডাকাচ্ছে। এতটুকু নিসর্গ প্রীতি নেই দীপকের, চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত টেরচা চোখেও চাঁদের দিকে তাকায় না। বলে, কাল আরও গোল হবে, তখন দেখা যাবে! এমন মধুর রাতে ওই বেরসিক লোককে ডাকাটাই বৃথা।

একটুক্ষণ চোখ বুজে ফুলের ঘ্রাণ নিল চিত্রলেখা, ভিজে ভিজে জ্যোৎস্না মাখল গায়ে। তারপর ধ্যুৎতেরি বলে উঠে পড়েছে। একা একা ঘুরছে ফ্ল্যাটময়। এমনটা সে করে মাঝে মাঝে, ফ্ল্যাটের বিস্তার ছুঁয়ে ছেনে দেখে। যেন উপলব্ধি করতে চায় এ গৃহ সত্যি, মায়া নয়, হুশ করে উবে যাবে না।

চিত্রলেখা টানা লম্বা ডিভানে গিয়ে বসল। নতুন ডিভান, এ বাড়ির জন্যই বানানো, ভারী নরম, বসলেই শরীর ডুবে যায়। হাত-পা ছড়িয়ে চিত্রলেখা নাক টানছে জোরে জোরে। একি, হাসনুহানার গন্ধ গেল কোথায়? ওমা, জানালাটা তো বন্ধ! বৃষ্টির সময়ে সেই যে টেনে দিয়েছিল দীপক, আর খোলেনি?

উঠে গিয়ে চিত্রলেখা ঠেলল জানালাটা। পাল্লা পুরো যাচ্ছে না, আটকাচ্ছে টবে। একটু বুঝি বড় টবে দেওয়া হয়েছে হাসনুহানাকে, তাই এই বিপত্তি।

সন্তর্পণে পাল্লা ফাঁক করল চিত্রলেখা। হাত গলিয়ে ঠেলে ঠেলে একটু সরাল টবখানা। একটা পাল্লা মুক্ত হয়েছে, টব হেলিয়ে অন্য পাল্লাটা খুলল। ভারী টব সরাতে গিয়ে ব্যথা লেগেছে নড়ায়, কাঁধে হাত রাখল। এভাবে চোট লাগা তো ভাল নয়, কালই ছোট টবে চালান করতে হবে হাসনুহানাকে।

সহসা চিত্রলেখার চোখ জানালার ওপর ভাগে, গ্রিলের প্রান্তে। নীচে রাস্তা, মার্কারি জ্বলছে, আলোর আভা উঠে আসছে উর্ধ্বপানে। সেই দ্যুতিতেই চিত্রলেখা স্পষ্ট দেখতে পেল গ্রিলটা সানশেডের চেয়ে ছোট! প্রায় বিঘৎ খানেক! ওইটুকুর জন্যই কি টবটা আটকাচ্ছে? চিত্রলেখার খটকা লাগল। ছুটে গেছে পাশের জানালায়। হ্যাঁ, এই গ্রিলটাও তো ছোট! তার পাশেরটাও! একে একে সব কটা বক্সগ্রিলই জরিপ করে ফেলল চিত্রলেখা। প্রত্যেকটাই এক মাপের। প্রত্যেকটাই ছোট! ছি ছি, এভাবে ঠকিয়ে গেল গ্রিলমিস্ত্রি?

একা একা গুমরোন চিত্রলেখার ধাতে নেই। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁকাচ্ছে দীপককে,—অ্যাই শুনছ...? শুনছ...?

দীপকের ঘুম যতটা গভীর, ততটাই পলকা। কখনও কানের পাশে ট্রাম্পেট বাজালেও ওঠে না, কখনও ফিসফিস শব্দেই পটাং করে চোখ খুলে যায়।

এখন বুঝি অগভীর নিদ্রাই চলছিল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে দীপক। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল,—কী হয়েছে?

—ওই গ্রিলঅলা...তোমার মন্টু না সন্টু... সে তো একেবারে আমাদের পথে বসিয়ে গেছে!

—কেন? কী করল?

—সব কটা গ্রিল ছোট! সানশেডের চেয়ে অন্তত ছ ইঞ্চি করে কম!

—তো? দীপক যেন বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। হাই তুলে বলল,—জানালা তো খোলা যাচ্ছে!

—ব্যস খুললেই হয়ে গেল " গ্রিলটা সানশেডের শেষ অব্দি গেলে ঘর আরও বড় লাগত না?

এতক্ষণে কথাটা দীপকের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। মুহূর্তে ঘুম হাপিশ। চোখ পিটপিট করল একটু। বিরক্ত স্বরে বলল,—অ্যাদ্দিনে দেখলে? আগে বলতে পারনি?

—আমার দেখার কথা? তুমি তো কাজের সময়ে এসে এসে ওদের ওপর সর্দারি মারছিলে...

—তুমিও তো ছুটি নিয়ে বসেছিলে! করছিলেটা কী? ল্যাজ নাড়ছিলে?

—হ্যাঁ, আমিতো ল্যাজই নাড়ি, গোটা ফ্ল্যাট যেন এমনি এমনি সাজানো হয়ে গেছে! রং করানো, তাক বসানো, ফিটিংস লাগানো, এগুলো তো ভূতে এসে করে দিয়ে গেল! তুমি একটুও নড়ে বসেছিলে?

—আর ফ্ল্যাটের জন্য দৌড়োদৌড়িটা কোন শর্মা করেছিল। অ্যাঁ? সার্চ করানো, উকিলের কাছে ছোটা, ঘোষালের সঙ্গে দরদস্তুর, দলিল বানানো, রেজিস্ট্রি, ব্যাঙ্ক

ম্যানেজার... এ সব কি এমনি এমনিই হয়ে গেছে? দীপক গজগজ করছে,—সব পরিশ্রম বৃথা। কষ্টের ফ্ল্যাটটা তোমার জন্য খুঁতো হয়ে গেল!

—রাত দুপুরে চিল্লিও না। চিত্রলেখা তর্জনী নাচাল,—তোমার জন্য হয়েছে।

—তোমার জন্যে...

—তোমার জন্যে...

বাচ্চাদের মতো কলহ শুরু করেছে একান্ন আর পঞ্চান্ন। চোখ পাকিয়ে, মুখ বিকৃত করে।

হঠাৎই থেমে গেল দীপক। ছন্দপতন ঘটিয়ে হেসে ফেলেছে। হাসছে হাসছে, হো হো হাসতে হাসতে মাথা নাড়াচ্ছে দু দিকে।

চিত্রলেখা অবাক। গরগরে গলায় বলল,—হল কী? এত হাসো কেন?

দীপক অতি কষ্টে হাসি থামাল। তবু যেন বুড়বুড়ি উঠছে হাসির। বলল, —ঢের হয়েছে, আর মাথা খারাপ কোরো না। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।

বিবাদের মাঝে এক পক্ষ আচমকা থেমে গেলে অন্য পক্ষ বড় অসহায় বোধ করে। চিত্রলেখা চোখ সরু করে দীপককে দেখল একটুক্ষণ, তারপর বেজার মুখে টিউবলাইটের ক্যাটকেটে আলোটাকে বুঁজিয়ে দিল। মাথা রেখেছে বালিশে।

মেঘ পুরোপুরি সরে গেছে। মোমজ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ঘর। গ্রিলের আঁকাবাঁকা ছায়া নিয়ে চাঁদ দুলছে বিছানায়।

চিত্রলেখা এপাশ ওপাশ করছিল। এখনও তার চিত্ত শান্ত হয়নি। গ্রিলের জন্য অতগুলো টাকা বিফলে গেল?

তখনই দীপকের গলা শুনতে পেল,—লেখা, এই বাক্স বাক্স গ্রিলের মধ্যে আমাদের ফ্ল্যাটখানাকে কেমন খাঁচা বলে মনে হয় না?

চিত্রলেখার চোখ আড়াআড়ি বাহুতে ঢাকা। সে কথা বুঝলও না, রা'ও কাড়ল না।

—আমরা কী রকম খাঁচার জন্তুর মতো ঝগড়া করছিলাম, তাই না?

চিত্রলেখা উল্টো দিকে ফিরে শুল।

দীপক ক্ষণিক নিঃশব্দ। তারপর কেমন যেন দূরমনস্ক গলায় বলল, —তোমার মনে পড়ে লেখা, আমরা কী ভাবে জীবন শুরু করেছিলাম?

—না পড়ার কী আছে! চিত্রলেখা গুমগুম স্বরে বলল, —আমি কিচ্ছু ভুলি না।

—যখন প্রথম সংসার পাতলাম, তখন আমাদের কী কী জিনিস ছিল? ...একটা কড়া, একটা হাঁড়ি, একটা তক্তপোষ, আর দুজনের দুটো থালা গেলাস!

—আরও বলে যাও। তোষক চাদর বালিশ, একটা সস্তা দামের আলনা...

—সে তো কয়েকটা ভাড়ার জিনিসও ছিল। ফ্যান আলমারি ড্রেসিংটেবিল...। ড্রেসিংটেবিলটা খুব বাহারি ছিল। আলমারি ভাড়া করতে গিয়ে তুমি এমন ভাবে ওটার দিকে তাকিয়ে ছিলে...নইলে আমাদের ওই ঘরে ওই ড্রেসিংটেবিল...!

স্মৃতির সমুদ্র আছাড় খাচ্ছে পাড়ে। ছোট ছোট বাষ্পকণায় রাগটা জুড়িয়ে এল চিত্রলেখার। আনমনে বলে উঠল, —তুমি আমাকে রথের মেলা থেকে একটা আমকাঠের টুল কিনে দিয়েছিলে।

—আমাদের আরও কিছু ছিল তখন। আমার সেতার আর তোমার হারমোনিয়াম।

—হুঁউ।

চিত্রলেখা বুঝি সময়টাকে দেখতে পাচ্ছিল। দীপক যেন তাকে হাত ধরে নিয়ে চলেছে পিছনে। বলল, —কুঁদঘাটের সেই বাড়িটার ভাড়া ছিল ষাট টাকা...

—বাড়ি নয়, বলো ঘর।

—হ্যাঁ, ঘর। টানা ব্যারাকের মতো বারান্দায় দরমার পার্টিশান। বাথরুম ছিল কতটা দূরে, সেই পুকুরপাড়ে...

—বর্ষাকালে তোমায় সাপ জোঁক সামলে সামলে যেতে হত।

চিত্রলেখা চিত হয়ে শুল। স্বর মিহি হয়ে এসেছে, —উপায় কী ছিল? তোমার তখন রোজগার মাস গেলে দেড়শো টাকা, আমি তো তখন চাকরিই পাইনি।...ওই কটা গানের টিউশ্যনি...

—অনেক টিউশ্যনি করতে তুমি।

—হুম। সকাল বিকেল মিলিয়ে কখনও পাঁচখানা, কখনও ছ খানা। পার ছাত্রী কুড়ি টাকা। লাল্টু যখন পেটে, তখনও কত দিন তেঁতুলগোলা জল দিয়ে ভাত খেয়ে থেকেছি।

—সে তোমার তখন টক খাওয়ার সাধ হত...

—শুধু তাই? কম কষ্ট করেছি সে সময়ে?

—কী আর করা! দীপক ছুঁল চিত্রলেখাকে, —আমরা তো কোনওদিন হাত পেতে কারওর কাছ থেকে কিছুই নিইনি। তোমার বাপের বাড়ির থেকেও না, আমার বাড়ির থেকেও না। না খেয়ে থেকেছি, তবু...

—তো কী আছে? আমরা স্ট্রাগল করেছি। একটু একটু করে দাঁড়িয়েছি। একটা একটা করে জিনিস করেছি সংসারের। মনে আছে, ইনস্টলমেন্টে প্রেশার কুকার কিনেছিলাম? ছেলেকেও মানুষ করেছি দাঁতে দাঁত চেপে...

—তার মধ্যে রাত জেগে তোমার পড়াশুনো...পরীক্ষা...চাকরি...

—তখনই তো সংসারটা একটু ভাল করে দাঁড়াল।

—আহা, আমি বুঝি তদ্দিন শুধু সেতার বাজাতাম? দীপক আলগা হাসল, —আমিও তো একটু একটু করে উঠেছি। অন্যের কারখানায় খাটতে খাটতে কাজ শিখলাম, ধাপে ধাপে প্রোমোশান, এই ফ্যাক্টরি ছেড়ে ওই ফ্যাক্টরি... তারপর নিজেরও একটা কারখানা হল...। এ সব কিছুর মূলে কী ছিল লেখা? জেদ। চাওয়া। আকাঙ্ক্ষা। পড়ে পড়ে মার খাব না এই মনোভাব। নয় কি?

—ছিলই তো। আকাঙ্ক্ষা ছিল বলেই তো আজ আমরা এখানে। মাঝে কত স্টেজ গেছে! ষাট টাকার ভাড়াবাড়ি থেকে তিনশোয়, সেখান থেকে সাতশো, তারপর দেড় হাজার, তিন হাজার...

—আর আজ? তুমি একটা আস্ত দশ লাখ টাকার ফ্ল্যাটের মালকিন। আমাদের টিভি ফ্রিজ ফার্নিচার টার্নিচার ধরলে আরও কমসে কম দু লাখ। ছেলে আই আই টি থেকে প্রায় পাস করে গেল, তার দাম তো তুমি লাখেও হিসেব করতে পারবে না।

—ছেলেকে আমি হিসেবে ধরি না। ও তো কদিন বাদেই পর হয়ে যাবে।

—তবে এই ফ্ল্যাটটাকেই বা কেন হিসেবে ধরবে? সেভাবে দেখতে গেলে এটাও তো মূল্যহীন। দীপক ঝপ করে বলল, —এখনও কি আমাদের দু জনকে ওই ষাট টাকার ঘরে কুলিয়ে যায় না?

চিত্রলেখার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখতে চাইছে আলোছায়া মাখা স্বামীকে। দেখতে চাইছে? না বুঝতে চাইছে?

দীপক আবার বলল, —আচ্ছা লেখা, তুমি যখন গানের টিউশ্যনি করে বেড়াতে, আর আমি সাতসকালে দেড়শো টাকা মাইনের কাজ করার জন্য ছুটতাম, তখন আমাদের চাওয়াটা ঠিক কী ছিল? এমন কামিনীর সুবাসমাখা ঘর, এমন সুন্দর পরিবেশে এত বড় ঝাঁচকচকে ফ্ল্যাট, সাকসেসফুল ছেলে, আমরাও মোটেই ব্যর্থ নই... তোমার কি মনে হয় না আমরা আমাদের শুরুর আকাঙ্ক্ষাটাকে অনেক বেশি ছাপিয়ে গেছি?

কথাটা ঠং করে বুকে বাজল চিত্রলেখার। গভীর ভাবে। হৃদয়ের অতলে গিয়ে কোথায় যেন ধ্বনিত হল।

আহতগলায় চিত্রলেখা বলল, —মোটেই না। আমরা আরও বেশি পেতে পারি।

—কতটা বেশি? আরও ছ'ইঞ্চি?

—হতে পারে।

—তার পর? আরও ছ'ইঞ্চি?

—হতেই পারে।

—তার পর...?

চিত্রলেখা চুপ। গাটা হঠাৎ কেমন শিরশির করছে। আশা আকাঙ্ক্ষার কোন প্রান্তসীমার ইঙ্গিত দেয় দীপক?

উড়ো মেঘ এসে আবার কখন ঢেকে দিয়েছে চাঁদকে। গ্রিলের ছায়া বড় হতে হতে গোটা ঘরখানাকে গ্রাস করে নিল। নিচু সিলিং-এ ফ্যান ঘুরছে বনবন, নিথর শুয়ে আছে দম্পতি। খাটের তলায় অবহেলায় পড়ে ধুলোমাখা একটা সেতার, আর একটা হারমোনিয়াম।

রাত বাড়ছিল...।

টান

বাজার হাতে থমকে দাঁড়ালেন সুখময়। তাঁর সযত্নে সাজানো একতলার ড্রয়িংরুমে উদ্দাম লাফালাফি করছে দুই শিশু। জুতো পায়ে দামী সোফায় উঠছে, ঝাঁপ কাটছে নকশাদার গালিচায়। তকতকে মোজাইক মেঝেতে এলোমেলো ছড়ানো গোটা দু-তিন কিটসব্যাগ, প্লাস্টিকের থলি, সস্তাদামের ওয়াটার বটল।

সুখময়ের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল,—তুই কোত্থেকে?

—এই এলাম। সুখময়ের প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না অমল। দাঁত ছড়িয়ে হাসল,—ধরো তোমাদের দেখতে। বুড়োবুড়ি একলাটি পড়ে আছ।

সুখময় একটুও প্রীত হলেন না। বাইরে থেকেই এখানকার কলরব কানে বাজছিল। কলরব নয়, যাকে বলে তাণ্ডব। তাঁর তপোবনের মতো প্রশান্ত গৃহ আর্তনাদ করছে শিশুদের হুড়ুদ্দুমে। তখনও কি ছাই বুঝেছেন, তাঁর অকালকুষ্মাণ্ড ভাগ্নেটিই এসে হাজির হয়েছে সাতসকালে। সেই সিউড়ি থেকে—লটবহর সমেত!

হাতের বাজার রান্নাঘরে নামিয়ে এলেন সুখময়। দুরন্ত শিশু দুটি একটু থমকাল। হাঁ করে দেখছে সুখময়কে। বড়টা বছর পাঁচেকের। ছোটটা বড় জোর তিন।

এক ঝলক ছেলে দুটোকে জরিপ করে সুখময় পাখার নীচে বসলেন,—খবর কি তোদের? মেজদি কেমন আছে? জামাইবাবু?

—মা-বাবারা এই বয়সে যেমন থাকে, তেমনই আছে। গেঁটে বাত। অর্শ। বুক ধড়ফড়। প্রেসার। সুগার। অমল বাবু হয়ে সোফায় বসল,—মামীও তো দেখলাম বেশ ধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

—হঁ। সুখময় গম্ভীর,—ক'দিন ধরে শ্বাসকষ্ট চলছে। কাল একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল।

একটু নয়, কাল রাতে বেশ ভালই বাড়াবাড়ি হয়েছিল অনুরূপার। বরাবরই তোঁর সর্দিকাশির ধাত, বছর আষ্টেক হল একটি বিশ্রী টানও উঠছে—হাঁপানির। প্রথম প্রথম টানটা শুধু ঋতু বদলের সময়ে আসত। এখন আর মাস-ঋতু মানে না, গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত যখন-তখন হানা দেয়।

কালও কষ্ট দিয়েছিল। সন্ধে থেকে অল্পস্বল্প রুটিনমাফিক চাপ ছিল ফুসফুসে। খাওয়া-দাওয়ার পর দুম করে বেড়ে গেল কষ্টটা। দু-চারটে বাঁধা ওষুধ ঘরেই থাকে, তাতেও কমল না। রাত বারোটায় ফোন করতে হল ডাক্তারকে। চেনা ডাক্তার, প্রায়ই দেখে অনুরূপাকে, তবু অত রাতে আসতে রাজী হল না সে। টেলিফোনে ওষুধের নাম আউড়েই খালাস। কাছেই সি এ মার্কেট, সেখানে শঙ্কর মেডিকেল সারারাত খোলা থাকে, রাতদুপুরে দোকানে ছুটলেন সুখময়। ক্যাপসুলটা খেয়েও রাতভর বিছানায় ঠায় বসে রইল অনুরূপা। বালিশ বুকে চেপে হাপরের মত হাঁপাচ্ছেন। গলা কাঁপিয়ে উৎকট শব্দ ছিটকে আসছে। দম বুঝি বেরিয়ে যায়-যায়!

আর সুখময়। একবার তখন বালিশ দিচ্ছেন স্ত্রীর পিঠে, একবার মুখে ফসফস ওষুধ স্প্রে করছেন আর উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে আছেন। কীভাবে যে কেটেছে রাতটা!

সুখময় বললেন,—তোর মামীকে নিয়ে চিন্তায় আছি।

অমল দুলছে বসে বসে,—আমরা এসে তোমাদের অসুবিধে হল তো?

সুখময় বলতে যাচ্ছিলেন, তা হল। বললেন না। তেতো গেলা মুখে হাসলেন,—অসুবিধে আর কি। মামার বাড়ি, এখানে আসবি না তো কোথায় আসবি?

—কারেক্ট। আমি তো মঞ্জুকে সে কথাই বলছিলাম। মঞ্জু মামীকে দেখে একেবারে ঘাবড়ে একসা।

—মঞ্জু, মানে তোর বউ? কোথায় সে?

—মামীর ঘরে। এসে ইস্তক ওপরে সেঁটে আছে। বলেই অমল হাঁক পাড়ল, —মঞ্জু-উ-উ, মঞ্জু-উ-উ, নীচে এসো। মামাকে প্রণাম করে যাও। ডাকতে ডাকতে ঝপ করে গলা নামাল,—আসলে তোমার ভাগ্নেবউ মামীকে দেখে যত না ঘাবড়েছে, তার থেকে বেশি ব্যোমকেছে তোমার এই বাড়ি দেখে। আরে বাবা, মামা আমার লর্ড। সল্টলেকে প্যালেসে থাকে। বুঝলে মামা, মঞ্জু ভাবে আমার সব আত্মীয়ই বুঝি তার শ্বশুর-শাশুড়ির মতো নেই-নেই পার্টি। এবার দ্যাখ নিজের চোখে। এমন ঝিংচ্যাক বাড়ি, এমন চাম্পুস সাজানো-গোছানো। বাপের জন্মে দেখেছিস কোনওদিন? ছিলি তো ন্যাংটো মাস্টারের মেয়ে।

দুই শিশু বাবার বকবক গিলছিল, হঠাৎ বড়টা হাততালি দিয়ে উঠল,—দাঁড়াও, মাকে বলে দেব!

অমল খিকখিক হাসল,—কি বলবি?

—তুমি দাদুকে ন্যাংটো বলেছ!

—বলিস। নেচে নেচে বলিস। যা ভাগ এখান থেকে। পাঁচ বছরেই পেকে বোঁদে হয়ে গেছে। খালি বড়দের কথার মধ্যে কথা। মারব টেনে তিন লাথ।

ধমক খেয়ে ছেলেটা গা মোচড়াচ্ছে।

সুখময় বেশ বিরক্ত হলেন। অমলটা চিরকালই বড় অমার্জিত। জংলি। হ্যা-হ্যা করে হাসে। গাঁক গাঁক চেঁচায়। মুখের মাত্রা নেই। লেখাপড়াতেও অগা। কোনওক্রমে ঘষ্টে ঘষ্টে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে সরস্বতীকে বিদায় দিয়েছে। মেজদির কম জ্বালা গেছে এই ছেলে নিয়ে। এখন কোন এক কোল্ডস্টোরেজে চাকরি করছে। কি কাজ যে করে, ভগবান জানে। শুধু মেজদির চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় রোজগারপাতি তেমন ভাল নয়। তার মধ্যেও কী দুঃসাহস! বাবু বিয়ে করে ফেলেছেন! প্রেমের বিয়ে। বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছ'বছরেই তিন-তিনটে অ্যাণ্ডাবাচ্চা। একটা তো একেবারেই কোলের। সবে পুজোর সময় হয়েছে। মেজদির বিজয়ার চিঠি থেকে জেনেছে সুখময়।

ড্রয়িংরুম থেকে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে নামছে অমলের বউ। আড়ষ্ট পায়ে। কাছে এসে খোঁপায় আঁচল তুলল। টিপ করে প্রণাম সারল একটা।

সুখময় মেয়েটিকে আগে দেখেননি। অমল ন'মাসে ছ'মাসে আসে এ বাড়িতে। একাই আসে, এক-আধ বেলা থেকে চলে যায়। সুখময় নিজে কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যান না। যাওয়া পছন্দও করেন না। বিয়ে অন্নপ্রাশনেও নয়। কোথাওই সম্পর্ক রাখেন না বেশি। মাঝেমধ্যে টুকটাক চিঠিপত্র, ব্যাস।

সম্পর্ক রাখার অর্থ জানেন সুখময়। দায়—অজস্র দায়। এর মেয়ের বিয়েতে দাঁড়াও, ওর ছেলের চাকরি করে দাও। একে খয়রাতি করো, ওকে ধার দাও। কেন রে বাবা? লিলিপুটদের বংশে তালগাছ হওয়াটা কি অপরাধ? তাছাড়া আত্মীয়স্বজন মানেই কূটকচালি, কেচ্ছা-কেলেংকারি। এসব সুখময়ের ঘোরতর অপছন্দ।

তা মঞ্জুকে অবশ্য প্রথম দর্শনে মন্দ লাগল না সুখময়ের। শান্ত চেহারা, বিনীত হাবভাব। রঙ চাপা হলেও আলগা একটা শ্রী আছে। তবে রোগা বড্ড। ডিগডিগে, ক্ষয়াটে। কোলের কন্যাসন্তানটিও খুবই শীর্ণ। অপুষ্টির শিকার।

মঞ্জু নতমুখেই বলল,—আপনাকে মামীমা একবার ওপরে ডাকছেন।

সুখময় গলা ঝাড়লেন,—তোমার মামীমা কি শুয়েছেন একটু, না এখনও বসে?

মঞ্জু একদিকে ঘাড় নাড়ল। উত্তরটা ঠিক ধরতে পারলেন না সুখময়। সিঁড়ি অবধি গিয়েও ঘুরলেন মঞ্জুর দিকে,—তোমার বাচ্চারা কিছু খেয়েছে?

অমলই আগবাড়িয়ে উত্তর দিল,—তুমি ভেবো না মামা, ওরা ঠিক খেয়ে নেবে।

—তোরাও তো এতটা পথ এলি...তোদেরও খিদে পেয়েছে...দ্যাখ না, পুষ্পর জলখাবার তৈরি কত দূর এগোল?

হা হা করে হাসল অমল,—আমাদের পেট হল রাবণের চিতা। সারাদিন জ্বলছে। ও নিয়ে ভাবতে গেলে তোমার ভাঁড়ার ফাঁক হয়ে যাবে। তুমি যাও, মামী কি বলছে দ্যাখো।

মঞ্জুর দিকে চোখ চলে গেল সুখময়ের। স্বামীর রসিকতায় মুখে আঁচল চেপে ফিক ফিক হাসছে।

ঘড়িতে সাড়ে নটা। চৈত্রের সকাল তেতে উঠছে ক্রমশ। এলোমেলো বাতাস তপ্ত। আচম্বিতে ছোট ছোট হাওয়ার ঘূর্ণি বাইরে। দক্ষিণের জানালার ঠিক গায়েই একটা বেঁটে নারকেল গাছ। চোদ্দ বছর বয়সের। গৃহপ্রবেশের দিন গাছটা লাগিয়েছিলেন অনুরূপা। সেই গাছের চওড়া পাতায় শেষ বসন্তের হাওয়া বাজছিল সরসর।

হাওয়া কি অতীতের কথা বলে? হয়ত বলে, হয়ত বলে না, হয়ত নিজের মনেই দোল খায় জানালায়, গাছে, সুখময়ের মনে।

পঁচিশ বছর আগে সুখময় এখানে চার কাঠার প্লটটা কিনেছিলেন। তখন এ অঞ্চলে গাছগাছড়া বিশেষ ছিল না। প্রায় ধূ ধূ। বিশাল বিশাল মেছো ভেড়ি বোজানো হয়ে সবে তখন শহর এদিকে গায়ে-গতরে বাড়ছে। মাটিতে চিকচিক করে বালি। লোকবসতি খুব কম। কলকাতার সঙ্গে সুতোর যোগ রাখে একটা দুটো বাস। এত ফাঁকা চারদিক যে লোকজন সহজে বাড়িঘর বানাতে সাহস পায় না।

সেটা অবশ্য শাপে বরই হয়েছিল। এখনকার হিসেবে জলের দরে জুটে গিয়েছিল জমিটা। তবে সুখময়ও তক্ষুণি বাড়ি করেননি। করলেন অনেক পরে। সাউথ ইস্টার্ণ রেলের জেনারেল ম্যানেজার হয়ে রিটায়ার করার ছ'বছর আগে—রামপুরহাটের জমিবাড়ির নিজের অংশ বেচে দিয়ে। এই উপনগরী তখন অনেক জমজমাট। ছবির মতো সুন্দর সুন্দর বাড়িতে ভরে যাচ্ছে চারদিক। চওড়া চওড়া পথঘাট। সবুজ বুলেভার্ড। গাড়ি-ঘোড়াও চলছে অনেক। তবু এখানকার একটা আলাদা নির্জনতা আছে। এক ধরনের আলাদা শান্তি। নিস্তরঙ্গ সুখ।

সেই সুখের আদলে তৈরি হল সুখময়ের বাড়ি। একতলায় অতিকায় ড্রয়িংরুম—রান্নাঘর। ভাঁড়ার, কাজের লোকেদের থাকার ঘর। বিশাল খাওয়ার জায়গা। ছোট্ট একটা স্টাডিরুম কাম পারিবারিক লাইব্রেরি। ওপরে তিনটে পৃথক পৃথক ব্লক।

প্রতিটি ব্লক এক-একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ান-রুম ফ্ল্যাট—সুখময়দের, বাবিনের, ছোট্টুর, এছাড়া মনভোলানো এক পূব-দক্ষিণ খোলা বারান্দা।

বাড়ির নাম হল স্বপ্নাতীত।

বাড়ি দেখে খুশিতে পাগল হলেন অনুরূপা। দুই ছেলেও। বাবিন তখন আই আই টিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ছোট্টুর ক্লাস নাইন। বিপুল উৎসাহে দুই ভাই ছুটে ছুটে এখান ওখান থেকে ফুলগাছ এনে লাগাচ্ছে। অনুরূপা সামনের লনটার পরিচর্যা করছেন সারাদিন। বাবিন আর ছোট্টুর ঘর পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল। বাবিনের দেওয়ালে ফিল্মস্টার। শুধুই অমিতাভ বচ্চন, বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বিভিন্ন মেজাজে। ছোট্টুর দেওয়াল জুড়ে খেলোয়াড়দের মিছিল—গাভাস্কার, বিশ্বনাথ, ইমরান, কপিলদেব, ম্যাকেনরো, বর্গ, ঝাঁকড়াচুলো মারিও কেম্পেস। তার সঙ্গে বাবা-মার দেওয়ালও পরিপূর্ণ। আশায়। সুখে। উষ্ণতায়। মায়াবী নিশ্চিন্ত বার্ধক্যের অলস স্বপ্নে।

বাবিনের আমেরিকায় এখন মধ্যরাত।

ছোট্টুর লণ্ডনে এখনও ভোর হয়নি।

এই উপনগরী এখন রোদ্দুরে ঝলসাচ্ছে।

—কি ভাবছ জানলায় দাঁড়িয়ে?

সুখময় ফিরলেন। খাটের প্রান্তে এসে আধশোয়া স্ত্রীর কপালে হাত ছোঁয়ালেন,—কিছু না।

—আমাকে ডাকোনি কেন?

—ভাবলাম ঘুমোচ্ছ; ঘুমোও।

—দূর, ঘুম কি আর আসে। অনুরূপা ক্লান্তভাবে চোখ বুজলেন।

—সকালের ক্যাপসুলটা খেয়েছ?

—খেয়েছি।

—ডাক পাঠিয়েছিলে কেন?

—বাজার থেকে কি আনলে? রোজকার সেই চারাপোনা?

—না। বাটা মাছ, কেন?

—কেন কিগো? ভাগ্নে-ভাগ্নেবউ এল, মেয়েটা আমাদের বাড়িতে এই প্রথম, ওদের শুধু বাটা মাছের ঝোল খাওয়াবে? অনুরূপা এখনও হাঁপাচ্ছেন একটু একটু,—বাচ্চাদের জন্য মাংস আনলে হত না?

—বাচ্চারা থোড়াই খাবে। খাবে তো ওই গণ্ডারটা। হাসতে হাসতে বললেন সুখময়,—ও ভার তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও তো। চুপটি করে আজ সারাদিন বিশ্রাম নাও। বিছানা থেকে একদম উঠবে না।

অনুরূপা বালিশে হেলান দিয়ে উঠে বসলেন,—অমলের বউটা কিন্তু বেশ হয়েছে। একটু বোকা ধরনের, কিন্তু বেশ কাজের। কথা শুনে মনে হল, মেজদি-জামাইবাবুর খুব দেখাশুনো করে।

—বোকা না হলে ওই ছেলের প্রেমে পড়ে!

—শুধু প্রেম নয় গো, অমলকে খুব ভয়-ভক্তিও করে।

—বাহ্! আধঘণ্টা কথা বলেই তুমি অনেক কিছু বুঝে ফেলেছ দেখছি। সুখময় বাঁকা হাসলেন,—সদলবলে এখানে হঠাৎ কেন উদয় হল তা কিছু বলল?

—নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞেস করা যায় নাকি?

সুখময় কিছু বললেন না। আলমারি খু'লে কয়েকটা কাগজ বার করলেন। ইলেক্‌ট্রিক বিল, প্রেসক্রিপশন—কিছু টাকাও।

অনুরূপা ঠাট্টার ছলে বললেন,—একদিক দিয়ে ভালই হল। তোমারও ক'দিন নাতি-নাতনি নিয়ে জমিয়ে কাটবে। ও সুখ তো তোমার ভাগ্যে বড় একটা জোটে না।

বাবিন গত বছর এসেছিল। জাম্বো বড় ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল সুখময়ের। দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে খেলব। দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে শোব। দাদুন, আমি তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করব—এক প্লেটে! দাদুন, চলো না আমরা ওয়াকে যাই।

সুখময় ঝট করে মুখ ফেরালেন,—বাচ্চাগুলোর চেহারা দেখেছ? কী চাষাড়ে! শ্যাবি!

—ছি, বাচ্চাদের ওরকম বলতে নেই। ওরাও তো সম্পর্কে নাতি-নাতনি, নয়?

পুষ্প ঘরে এসেছে। হাতের ট্রেতে সুখময়ের জন্য চা-টোস্ট, অনুরূপার হরলিক্স, বিস্কুট কয়েকটা। খাটের লাগোয়া টেবিলে ট্রে নামিয়ে বলল,—মা, আপনি লুচি খাবেন দু'চারটে? এনে দেব?

—ওদের দিয়েছিস?

—দেওয়ার দরকার হয়নি। নিজেরাই তার আগে হামলে পড়ে খেয়ে নিল।

চকিত অতিথি-সমাগমে পুষ্পর মুখও বেশ অপ্রসন্ন। সে এ বাড়ির রাতদিনের কাজের লোক। বহুকাল আছে। সুখময়-অনুরূপার কাছে সে এখন অন্ধের যষ্ঠি। তবু তার বাচনভঙ্গিটা এ মুহূর্তে সুখময়েরও অভব্য লাগল।

গম্ভীর মুখে বললেন,—তুই এখন একবার বাজারে যা। ওদের জন্য দুটো মুর্গি নিয়ে আয় বড় দেখে। আর আন্দাজ মতন দই মিষ্টি। বাচ্চা দুটোকে একটু দুধ দিয়েছিস?

পুষ্পের মুখ আরও ভারী,—বউটা নিজেই নিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। দুই ছেলেকে

বড় বড় দু-গ্লাস। খাবলা খাবলা চিনি মিশিয়ে, এক থালা করে লুচি তরকারি খাওয়ানোর পর।

—দিক না। তুই এত খেপে যাচ্ছিস কেন? অনুরূপা হাসছেন মিটিমিটি—বউ নয়, বৌদি বল। ওরা আমাদের আত্মীয়।

—সে আমি জানি। পুষ্প খরখর করে উঠল,—নীচে গিয়ে দ্যাখো না, দুই ছেলেতে কল খুলে কিরকম বাথরুম ভাসাচ্ছে!

পুষ্প টাকা নিয়ে চলে গেল।

অনুরূপা হরলিক্সে চুমুক দিলেন,—তুমি নিজে বাজার গেলে পারতে। সব কাজ কি কাজের লোকদের দিয়ে হয়!

—আমার এখন সময় নেই। তোমার মাউথ-স্প্রে ফুরিয়ে এসেছে, শঙ্কর মেডিকেলে নেই......দেখি একবার বিডি মার্কেট যেতে হবে। ইলেকট্রিক বিলেরও আজ লাস্ট ডেট। সুখময় বিরস মুখে টোস্টে কামড় বসালেন,—পোস্ট অফিসও যাব। বাড়িতে এয়ারমেল নেই, আনতে হবে।

—তুমি এখনও ছোট্টুকে উত্তর দাওনি! সেই কবে ওর চিঠি এসেছে!

—কবে কোথায়, পরশুই তো এল। তাও আমরা চিঠি দেওয়ার আড়াই মাস পর।

—ওদের নতুন সংসার। নতুন দেশ। নতুন কাজ। তাও আবার যে সে কাজ নয়, অসুখ নিয়ে রিসার্চ। সব সামলে চিঠি লিখতে বসা...সময় তো লাগবেই।

—নতুন কোথায়, দেখতে দেখতে তো আট মাস হয়ে গেল।

—আট মাস আর কি এমন সময়? ওদিকে তোমার বাবিনের যে আট বছর হয়ে গেল। সে কটা চিঠি লেখে বছরে? গুনে গুনে চারটে কি পাঁচটা। তাও বউ লেখে, নিজে তার সঙ্গে নীচে দু'লাইন।

সুখময় চকিতে উদাস। সোঁ সোঁ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে বুকে,—ওদের সবই নতুন। সব সময়ে। শুধু বাবা-মা দুটো ছাড়া।

—ও আবার কি কথা। হরলিক্স শেষ করে অনুরূপা শুচ্ছেন ধীরে ধীরে,—চা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ দরজার দিকে নজর গেল সুখময়ের। অমলের বড় ছেলেটা পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে ঘরে।

অনুরূপাও দেখেছেন। কোমল গলায় ডাকলেন,—আয় দাদু।

ছেলেটা দু'দিকে মাথা দোলালো। এল না।

অনুরূপার স্বর আরও নরম,—তোর চোখ ছলছল করছে কেন রে? মা বকেছে? ওমা এ তো জলও গড়াচ্ছে দেখছি!

দু-হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে নিল ছেলেটা, মুখে স্বর ফুটেছে,—তোমাদের ছাদটা কি বড় গো! আমি আর ভাই চুপি চুপি গিয়ে দেখে এসেছি।

—তাই? আর কি দেখলি? ছাদের ফুলগাছগুলো দেখেছিস?

—হ্যাঁ অ্যা অ্যা, ভাই না একটা ফুল ছিঁড়েছে। লাল ফুল। পর্দা সরিয়ে দু-পা এগোল ছেলেটা,—আমরা কোন্ ঘরে থাকব গো ঠাম্মা? মা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলল। বনু ঘুমিয়ে পড়েছে তো!

—এমা ছি ছি, তুমি কি যে কারো না! অনুরূপা অপ্রস্তুত মুখে স্বামীর দিকে তাকালেন,—যাও ওদের জন্য বাবিনের ঘরটা খুলে দাও। বাবিনের খাট বড় আছে।

বাবিন-ছোট্টুর ঘর তালাবন্ধই থাকে সারা বছর। সপ্তাহে একদিন ঝাড়াঝুড়ি হয়। আগে অনুরূপা নিজের হাতেই করতেন। ধুলো নাকে গেলে কষ্ট বাড়ে বলে নিজে আর ঢোকেন না, পুষ্পই সাফসুতরো করে রাখে যতটা সম্ভব।

সুখময়ের কণ্ঠে শ্লেষ ফুটল,—বাবিনের খাটেও পাঁচজন ধরবে না। ছোট্টুর ঘরও লাগবে।

—লাগলে লাগবে, খুলে দাও। ও তো এখন ভূতের ঘর।

ড্রয়ার থেকে দুপদাপ চাবির গোছা বার করে সুখময় বিছানায় ছুঁড়ে দিলেন। অনুরূপার পল্‌কা আদিখ্যেতা তাঁর মোটেই মনঃপূত নয়। ওফ্, ওই মায়াবী ঘর দুটো এখন তছনছ করবে অমল! গ্রাম্য গন্ধ ছড়িয়ে দেবে চারদিকে!

সুখময় দরজার দিকে এগোলেন,—পুষ্প ফিরুক, ওকে দিয়েই খুলিয়ে নিও। আমি বেরোচ্ছি।

দুপুরে অমলদের আসার প্রকৃত কারণটা জানা গেল। অমলই বলল খাওয়ার সময়ে। অমলের বড় ছেলেটার চোখে কি সব গণ্ডগোল হয়েছে, ছেলেকে বড় ডাক্তার দেখাতে এনেছে কলকাতায়। সারাক্ষণই নাকি চোখ ছলছল করে, জল পড়ে, মাঝে মাঝে যন্ত্রণাও হয়। সিউড়িতে দু-তিনজন ডাক্তারকে দেখিয়েছিল, তাদের এক একজনের এক এক মত। কেউ বলে গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডগোল, কেউ বলে নার্ভের, কেউ বলে কর্নিয়ার। ওখান থেকে এক ডাক্তার চিঠি দিয়ে দিয়েছে, তার সুপারিশেই দেখাবে বড় ডাক্তারকে। ডাক্তারটির নাম সুরেন সরকার। পিজির প্রফেসার। শোনা-শোনা নাম, ছোট্টুর মুখেই সুখময় শুনেছেন বোধহয়।

স্টাডিরুমে এসে সুখময় একটা সিগারেট ধরালেন। খাওয়া-দাওয়ার পর এ ঘরে বসে মৌজ করে একটু সিগারেট খান। আগে দিনে কুড়ি-পঁচিশটা হয়ে যেত। এখন নেশাটা অনেক কমিয়ে এনেছেন। দুপুরে রাতে খাওয়ার পর একটা করে,

আর সারা দিনে বড়জোর দু-তিনটে। এবার ভাবছেন ছেড়েই দেবেন অভ্যাসটা। একটু জোরে হাঁটলেই আজকাল একটা চিনচিনে হাল্কা ব্যথা হয় বুকে, হাঁপিয়েও যান বড় তাড়াতাড়ি। ব্যথার কথাটা অনুরূপাকে বলেননি। মিছিমিছি মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে কি লাভ! একেই তো নিজের জ্বালায় জ্বলে মরছে বেচারা!

দুপুরের বাতাস বাইরে থম মেরে ছিল অনেকক্ষণ, হঠাৎই একটা ঝাপটা দিল যেন। খোলা জানালা দিয়ে কিছু ধুলোবালি উড়ে এল। শুকনো পাতারা ছুটছে রাস্তায়। সুখময় উঠে জানালাটা টেনে দিলেন। পুষ্পকে কতবার করে বলেছেন বেলা বাড়লে সব জানালা বন্ধ করে দিতে, এ সময়ে ধুলো ঢুকে ঘরদোর বড় নোংরা হয়, তা কথাটা যদি খেয়াল থাকে মেয়েটার! আজ অবশ্য খেয়াল না থাকলেও বলার নেই কিছু। সিউড়ি থেকে আসা উটকো ধুলো সামলাতেই যা হিমশিম খাচ্ছে!

অমলটা সত্যিই যাচ্ছেতাই। যেমন নোংরা, তেমন বেআক্কেলে। শিক্ষাদীক্ষা না থাকলে যা হয়! অতটুকু ছেলে চোখ নিয়ে কষ্ট পাচ্ছে, অথচ বাপকে দ্যাখো দিব্যি মাংসের হাড় চুষতে চুষতে ব্যাখ্যান করে চলেছে ডাক্তারদের। ভাষাই বা কী! ওখানকার ডাক্তারটা লেবঞ্চুস। বেঁড়ে পাকামি করছিল। চেম্বারে ঢুকে দিয়েছি ব্যাটাকে আচ্ছা করে কড়কে! বসার ভঙ্গিটাও কী অশালীন! এক-পা চেয়ারে তুলে, এক পা নাচাতে নাচাতে খাওয়া! লোমশ খালি গা! পরনে উৎকট চেক লুঙ্গি! শব্দ করে করে কুলকুচি করা! অসহ্য! অসহ্য!

সুখময় চেপে চেপে সিগারেট নিবিয়ে ওপরে এলেন। আঃ, ঠিক যা ভয় পেয়েছিলেন তাই! অনুরূপার সামনে মোড়া টেনে বসে আগডুম বাগডুম গল্প করে চলেছে অমল। সাধারণ বুদ্ধিটুকুরও এত অভাব? শুনলি মামী সারারাত ঘুমোতে পারেনি—এখন কষ্ট কম, একটু শুয়ে নিতে দে, তা নয়...! অনুরূপাও কেন যে এত লাই দেয় ছেলেটাকে! নির্ঘাত এখন আত্মীয়স্বজনদের ঠিকুজি কুষ্ঠির তালাশ চলছে—কার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না, কার মেয়ে বাপকে লুকিয়ে বিয়ে করার মতলব ভাঁজছে, রামপুরহাটের কোন দেওর কার জমি হাতাল, এসব শুনে অনুরূপার কী যে মোক্ষ লাভ হয়! নিজে তিনি কোনওদিন প্রশ্রয় দেননি অমলকে। এসেছ এসো, দু-চার ঘণ্টা থাকো, খাও দাও, বিদায় নাও। শুধু অমল নয়, সব আত্মীয়ের জন্যই সুখময়ের এক বিধান।

ঘরে না গিয়ে সুখময় সামনের প্যাসেজটার দিকে গেলেন। দু'ধারে বাবিন আর ছোট্টুর ঘর। দুটোই হাট করে খোলা। ছোট্টুর খাটে বিশ্রীভাবে ছড়ানো রয়েছে অমলদের মালপত্র, জামাকাপড়। বাবিনের বিছানায় মঞ্জু কোলের মেয়েটাকে নিয়ে

পাশ ফিরে শুয়ে। বড় ছেলেটি মেঝেয় হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। ছোটটি খাটের প্রান্তে গুটিয়ে গুটিয়ে জড়োসড়ো।

সুখময় সরে এলেন। পুব-দক্ষিণ-খোলা গোল বারান্দা থেকে দুপুর হলেই রোদ সরে যায়। একটা ইজিচেয়ার আর গোটা দু-তিন মোড়া সব সময় ছড়ানো থাকে এখানে। সুখময় ইজিচেয়ারে শরীর ছেড়ে দিলেন। বাবিন আর ছোট্টুর ঘর দুটি তাঁর বড় প্রিয়। নির্জনতার সঙ্গীও বটে। অনুরূপাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝেই ঘর দুটোর তালা খোলেন সুখময়। চেয়ার টেবিল খাট আলমারি বিছানা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেন। পোস্টারগুলো কবেই আর নেই, তবু ফিকে রঙিন দেওয়ালে এখনও অনেক ছবি দেখতে পান তিনি। বাবিন জন্মাল। হাঁটছে। কথা ফুটল মুখে। স্কুলে যাচ্ছে। রাত্তিরবেলা অনুরূপাকে আবার রেখে আসতে হল রেলের হাসপাতালে। ছোট্টু এল। পিঠোপিঠি বড় হচ্ছে দুই ভাই। ছবি আর ছবি। পর পর অজস্র ছবির মিছিলে দেওয়াল পূর্ণ হয়ে যায়। বাবিন আমেরিকা থেকে বিয়ে করতে এল। বউ নিয়ে চলে যাচ্ছে। ছোট্টুর লন্ডনে রিসার্চ করতে যাওয়ার সুযোগ এসে গেছে। নিজের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে সে-ও চলে গেল বাইরে। কখনও এয়ারপোর্টে গিয়ে হাত নাড়ছেন সুখময়। কখনও হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরছেন ছেলেদের, নাতিকে। সব—সব মুহূর্ত এই দুটো ঘরে যেন বন্দী হয়ে আছে।

চাবি খুলে শুধু তাদের দেখা বারবার, প্রাণভরে।

—ঘুমোচ্ছ নাকি?

সুখময় চোখ খুললেন, উত্তর দিলেন না।

অমল মোড়া টেনে বসল। সুখময়কে বিস্মিত করে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। যেন উষ্ণ দুপুরের ছায়া আবিষ্ট করেছে তাকেও। হঠাৎই বলল,—তুমি কেমন বুড়োটে হয়ে গেছে মামা।

সুখময়ের ছোট্ট শ্বাস পড়ল—বয়স তো হচ্ছে!

—বয়স কিসের? এখনও তো সত্তর ছোঁওনি! কত চলছে? আটষট্টি? উনসত্তর?

—সেটাও কি কম হল?

—কম নয়, বেশিও নয়। আমার বড় জ্যাঠাকে দ্যাখো, এইট্টি ওয়ান। এখনও বাচ্চাদের ফুটবলে রেফারিং করতে নামে। এদিকে আমার বাবা ছিয়াত্তরেই কুপোকাত! অলটাইম বিছানায়!

সুখময় অন্যমনস্কভাবে বললেন,—জামাইবাবু বরাবরই রোগাভোগা।

—ওটা বাজে কথা। আসল ব্যাপারটা কি জানো? যাদের ওপর টান খুব বেশি, তাদের কাছ থেকে ল্যাং খেলে শরীর ভেতর থেকে ধসে যায়।

—কে তোর বাবাকে ল্যাং মারল? তুই রয়েছিস, বউমা রয়েছে...

—আমরা কি বাবার ভালবাসার জন নাকি। ভালবাসার ছেলে হল দাদা। বাবার ভাল ছেলে। লেখাপড়ায় ভাল, বাবিন ছোট্টুর মত না হলেও দু-তিনখানা ডিগ্রি আছে। তাকে নিয়ে বাবার অত সাধ-আহ্লাদ, অথচ তিনি তো পুরো কাট্টি করে দিয়েছেন! আমি চিরকালের লাথখোর ছেলে। বাবা আমাকে হারামজাদা না বলে কোনওদিন জল খায়নি। সেই আমার মুখ চব্বিশ ঘণ্টা দেখতে বাবার ভাল লাগে?

মেজদির চিঠিতেই কথাটা জেনেছিলেন সুখময়, তবু প্রশ্ন করলেন,—নির্মল কি পার্টিশান করে নিয়েছে?

—পার্টিশান মানে? পুরো পাঁচিল গেঁথে ফেলেছে। দশ ইঞ্চির দেওয়াল। একেবারে বউ-এর ভেড়া হয়ে গেছে। বাবার একটা হার্ট-অ্যাটাকের মতো হল, রাস্তায় ডেকে বললাম, একবার চোখের দেখাও দেখতে এল না। এলে যদি মাল্লু ছাড়তে হয়! পুজোর সময় মাকে হাতে করে একটা কাপড় পর্যন্ত দেয় না!

সুখময় হাল্কা চালে বললেন,—ভালই তো, তুই বাবা-মাকে দেখছিস, তোর পুণ্যি বাড়ছে।

—পাপ-পুণ্য বুঝি না মামা। আমার মোটা বুদ্ধি বলে, যে বাপ-মা খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছে তারা বুড়ো হলে আমাদেরকেই তাদের দেখতে হবে। এ কোনও দয়া-ফয়ার ব্যাপার নয়, পুরো হিসেবের কড়ি। জুতো-ঝ্যাটা যাই মারুক, খেতে পরতে তো দিয়েছিল! সেই লোনটা শোধ করতে হবে না!

কথাটা সামান্য বিঁধল সুখময়কে। কোথায় যে ঠিক বিঁধল, বুঝতে পারলেন না।

অমল দুম করে প্রশ্ন করে বসল,—বাবিন শুনলাম আর নাকি ফিরছে না! মামী বলছিল, কিসব গ্রিন কার্ড-মার্ড পেয়ে গেছে?

—তা পেয়েছে। তবে ফিরবে না এমন কথা তো বলেনি! বলতে গিয়েও ঠিক ঠিক জোর ফুটল না সুখময়ের গলায়। স্ত্রীর ওপর মনে মনে বিরক্তই হলেন তিনি। অমলকে এত কথা বলার কি দরকার ছিল!

অমলের কৌতূহলের শেষ নেই, সে আবার খোঁচা দিল,—তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মামা, ছোট্টু বিদেশে পড়ে থাকতে পারবে না, ও যা মামীর কোলঘেঁষা।

সুখময় শক্ত হলেন,—ওদের যদি বিদেশে ভাল লাগে, নিশ্চয়ই থাকবে। এ দেশে তেমন স্কোপই বা কোথায় ওদের জন্য?

—তা ঠিক। না ফেরাই উচিত। এত ভাল ছেলে ওরা। অমল বিজ্ঞের মতো রায় দিল,—আমি তো মঞ্জুকে বলি, তুমি শুধু আমাদের ফ্যামিলির দুটো স্যাম্পেল

দেখলে! এক আমি, ডিগবাজি খেয়ে খেয়ে ধপাস পার্টি। আর এক আমার বউ-এর পাশে লেজ নাড়ানো দিগ্‌গজ দাদা, মাদুর পাতা মাস্টার। যদি খাঁটি জুয়েল দেখতে চাও, আমার মামার ছেলেদের দেখো। কী ভদ্র! কী অমায়িক ব্যবহার! কোনও পরীক্ষায় কখনও ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয়নি।

কিছুটা অতিরঞ্জিত হলেও কথাটা খুব মিথ্যে নয়। বাবিন হায়ার সেকেন্ডারিতে থার্ড হয়েছিল, ছোট্টু মেডিকেলের জয়েন্ট এন্ট্রাসে সেকেন্ড। দুই ছেলের পিছনে কম পরিশ্রম কম অর্থব্যয় করেননি সুখময়। তাঁর সব চেষ্টা আজ সার্থক। ছোটবেলা থেকে ছেলেদের নিখুঁতভাবে পথ দেখাতে পেরেছেন বলেই না তিনি আজ এক সফল পিতা। দুই পুত্রবধূও তাঁর শিক্ষিত। মার্জিত। বাবিনের বউ ওখানে একটা স্কুলে চাকরি করছে, ছোট্টুর বউ তো ছোট্টুর মতই ডাক্তার।

সুখে প্রাচুর্যে সাফল্যে সব দিক দিয়েই পরিতৃপ্ত সুখময়, তবু কেন যে বুকটা চিনচিন করে ওঠে হঠাৎ হঠাৎ, এই নির্জন অপরাহ্নবেলায়?

—কি লিখলাম শুনবে না?

অনুরূপা রাতের খাওয়া সারছিলেন। দুটো রুটি, অল্প মুর্গির মাংস। তাঁর জন্য স্টুয়ের মতো করে আলাদা মাংস রেঁধেছে পুষ্প। এমনিতে অনুরূপা পাতলা রান্না ভালইবাসেন, কিন্তু আজ ঠিক গলা দিয়ে নামছিল না তাঁর। একটা চোরা ভয় শিরদাঁড়া ছুঁয়ে যাচ্ছে। আবার যে কখন কালকের মত এসে পড়ে কষ্টটা!

সুখময় অসহিষ্ণুভাবে বললেন,—কি হল শুনবে? পড়ব, না মুখ বন্ধ করে দেব?

অনুরূপা ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন—কি আর শুনব? লিখেছ তো সেই বাঁধা গৎ...আমরা ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ? মাঝে তোমার মায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল...সেই হাঁপের টান। এখন মোটামুটি আছে। তোমরা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না।

সুখময় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হলেন,—আর কিছু লিখি না আমি?

—বলো, আর কি লেখো?

সুখময় তীব্র চোখে স্ত্রী দিরে তাকালেন,—লিখে দেব তোমার জন্য সারারাত জেগে বসে থাকতে হয়? তোমার চোখ মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে?

—আমি কি বলেছি, ওসব লিখতে?

—তাহলে কি লিখব? লিখব, স্নেহের ছোট্টু, তুমি একদা গেটের সামনে যে কৃষ্ণচূড়া গাছটি পুঁতিয়াছিলে তাহাতে ফুল আসিয়াছে। তোমার দাদার লাগানো পলাশ গাছেও। দুটি গাছের ফুলে আমাদের গেটের সম্মুখভাগ লাল হইয়া থাকে।

অনুরূপা খাওয়া বন্ধ করে স্বামীর দিকে তাকালেন,—সত্যি কথা স্বীকার করতে এত ভয় পাও কেন তুমি? যা লিখেছ, এ ছাড়া সত্যিই কি কিছু লেখার আছে? চিঠি লেখা মানে তো এখনও জ্যান্ত আছি সেটা জানানো, আর কি?

সুখময় নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। এয়ারমেলের মুখ জুড়লেন ধীরে ধীরে। ঘরের উজ্জ্বল আলোটাকে বড় নিষ্প্রভ লাগছিল তাঁর। শুধু নিষ্প্রভ নয়, ঝাপসাও।

নিম্নস্বরে বললেন সুখময়,—তুমি বড় নিষ্ঠুর অনু!

—নিষ্ঠুর নয়, যা দেখি যা বুঝি তাই বলছি। তুমি যা সত্যি সত্যি লিখতে চাও, তা তোমার কলমের ডগায় আসবে? আমি চাইলেও আমাকে লিখতে দেবে সে কথা?

—কেন লিখব আমরা? সুখময়ের গলা ফ্যাসফ্যাসে শোনাচ্ছিল।

—লিখো না। যক্ষ হয়ে কুবেরপুরী আগলাও।

একতলা থেকে টিভির শব্দ ভেসে আসছিল। সিনেমার গান হচ্ছে। পুরনো দিনের গান। অমল খুব জোরে চালিয়েছে টিভিটা।

কান পেতে গানটা শোনার চেষ্টা করলেন অনুরূপা। কি গান বোঝা যাচ্ছে না। থালায় হাত ধুতে ধুতে বললেন,—তুমি আজকাল বড় অবুঝ হয়ে যাও। ওইটুকু বাচ্চাকে তখন ওইভাবে ধমকালে! কোনও মানে হয়?

—বেশ করেছি। খবর শোনার সময়ে অত চেঁচাবে কেন? বউটারও বলিহারি। তিন-তিনটের মা হয়েছে, একটাকেও সামলাতে পারে না। সুখময় প্রায় ভেংচে উঠলেন,—কোলের মেয়েটা সোফাতে পেচ্ছাপ করে দিল, মায়ের হিলদোল নেই, একটু কাঁচিয়ে ফেলে দিল শুধু। ছোট ছেলেটা শোকেসের কাচ ভটাং করে টানছে বন্ধ করছে, মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। একদিনেই বাড়ি লণ্ডভণ্ড করে দিল।

—দিক গে, অত পিটপিট কোরো না তো! দুটো দিনের জন্য এসেছে...আর ওই সোফা-শোকেস নিয়ে কি আমরা স্বর্গে যাব? তোমার ওই মর্নিং ওয়াকের মিলিটারি বন্ধু বলে না, এর পর সব বাড়ি সার সার ভূতের বাড়ি হয়ে যাবে। ঠিকই বলে।

সুখময় চশমা খাপে ভরলেন। অনুরূপার কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললেন তিনি,—আর আমি হব যক্ষ, তাই তো? এ পাড়ায় সার সার যক্ষ!

—তাই তো হবে। অনুরূপাও হাসছেন, অনেক বকেছ, এবার আমার ক্যাপসুলটা দাও।

ওষুধের সঙ্গে বেশ খানিকটা জল খেলেন অনুরূপা, তারপর বললেন,—দশটা তো বাজে, তোমরা খেতে বসবে না?

—বসব। তোমার পুষ্পরাণীর টিভি দেখা শেষ হোক। সকালে অমলের বউটাকে সহ্য করতে পারছিল না, এখন তো তার সঙ্গে গলায় গলায় ভাব।

—অমলের বউটা সত্যিই ভাল গো। বড় দুঃখী। অনুরূপা সামান্য ইতস্তত করে বললেন—তোমার মেজদিও নাকি ওর ওপর খুব অত্যাচার করে।

—কেন?

—কেন আবার কি? বিয়েতে তেমন কিছু পায়নি, প্রায় এক বস্ত্রেই চলে এসেছে মেয়েটা, তাই নিয়ে দিবারাত্র নাকি গঞ্জনা দেয়। বলতে বলতে কেঁদে ফেলছিল বেচারা।

—অমলের তো খুব হাঁকডাক, ও কেন প্রোটেস্ট করে না?

—মুরোদ কোথায়? মাইনে তো পায় হাজার টাকা। তোমার জামাইবাবুর পেনশানের টাকা আছে, ফিক্সড ডিপোজিটের ইন্টারেস্ট আছে—তাই দিয়েই চলে সংসারটা।

সুখময় থমকে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন,—তবে যে ছেলেটা বড় মুখ করে বলছিল বাবা-মাকে দেখছি। অন্নের ঋণ শোধ করছি।

—বাজে কথা। মেয়েটা আলাদা থাকতে চায়, তোমার ভাগ্নে নিরুপায়। আলাদা হলে খাবে কি? নেহাত অন্ন জুটবে না বলেই বাবা-মার কাছে পড়ে আছে। বাপ-মার ওপর ভক্তি নয় গো, একে বলে দায়ে পড়ে রায়মশাই। তোমার জামাইবাবু নাকি নাতির চোখের চিকিৎসার জন্যও ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দিয়েছে ছেলেকে।

পুষ্প ঘরে এসে এঁটো থালাবাসন গোছাচ্ছে, যাওয়ার সময় সুখময়কে খেতে ডেকে গেল।

সুখময় খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরলেন। সিগারেট ধরিয়ে গোল বারান্দায় পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। শুয়ে পড়লেন।

সারাদিনের তপ্ত ভাব আর নেই। একটা নরম মিঠে বাতাস জানালা বেয়ে ঘরে ঢুকছে। স্পর্শ করছে ঘরের আসবাবপত্র। মানুষদেরও। নারকেল গাছের ওপরে পিছনের রাস্তার টিউবলাইটটা জ্বলছে নিবছে বার বার।

রাত বাড়ছিল।

মাঝরাত অবধি ঘুম এল না সুখময়ের। প্রতি পলে কাল রাতের বিপন্নতার স্মৃতি কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। পাশের ঘরের কলকাকলি স্তব্ধ হওয়ার পরও চোখের পাতা এক হল না কিছুতেই।

হঠাৎই সুখময় একটা শব্দ শুনলেন। শব্দটা প্রথমে একটু শুরু হয়েই থেমে গেল। তারপর আবার শুরু হল। বাড়ছে। কমছে। থামছে। বাড়ছে।

বেশ খানিকক্ষণ মন দিয়ে শোনার পর শব্দের উৎসটা খুঁজে পেলেন সুখময়। অমল নাক ডাকছে।

রাগতে গিয়েও সুখময়ের রাগ এল না। স্নায়ু কেমন ঝিমিয়ে এল। অন্ধকার বাড়িতে শব্দটা পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। মথের মতো। একটা প্রাণের অস্তিত্ব হয়ে।

অনুরূপার টান উঠল না। সুখময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

টানটা পরদিন উঠল না—পরদিনও না। দু'দিন ধরে গোটা বাড়ি জুড়ে দক্ষযজ্ঞ করল অমলের দলবল—ছড়ালো, লাফালো, নোংরা করল, ছাদের টব প্রায় নির্মূল করে ফেলল শিশুরা। ছেলেকে ডাক্তার দেখাল অমল। তেমন বিপদের কিছু নেই। গ্ল্যাণ্ডেরই গোলমাল। ওষুধ চলবে এখন। এক মাস পরে আবার দেখাতে হবে ছেলেকে। মনের আনন্দে অমল কলকাতা ঘোরালো বউ-বাচ্চাদের। পাতালরেল, দ্বিতীয় হুগলি সেতু—কিছুই বাদ পড়ল না। আজ তার লটবহর নিয়ে ফেরার পালা।

দুপুর দুটোয় বাস। ধর্মতলা থেকে। পথে খাওয়ার জন্য কোঁচড় বেঁধে টিফিন দিয়ে দিলেন অনুরূপা নিজের হাতে তৈরি করে। লুচি তরকারি হালুয়া। একটা ভাল শাড়িও দিলেন মঞ্জুকে। বাচ্চাদের এক সেট করে জামাকাপড়।

মঞ্জু খানিকটা কাঁদল। অমল হাসল হা হা করে। বাচ্চাগুলো খুশি না ব্যথিত বোঝা গেল না।

অমল চলে গেল, ঝাঁ ঝাঁ রোদে।

বাবিন আর ছোট্টুর ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে পুষ্প। সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘর আবার পুরনো চেহারায়।

সুখময় ঘর দুটোতে তালা দিতে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। দুটো খোলা দরজার মাঝখানে, ছায়া ছায়া প্যাসেজ, নিঝুম দাঁড়িয়ে আছেন অনুরূপা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কী নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে বাবিন-ছোট্টুর গরবিনী মাকে। শুধু একা নয়, শূন্য। কাঙাল।

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল সুখময়ের। তাঁর একটা ছেলেও যদি অশিক্ষিত, বেরোজগেরে হত। ওই অমলটার মতো।

অন্তু বাঁচেনি

অন্তু এখন শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে।

এই একটু আগে এক ধূসররঙ মর্গের গাড়ি চেপে এখানে এল অন্তু। না, অন্তু নয়, অন্তুর দেহ। ডেডবডি, লাশ। জল থেকে তোলা। শেষপর্যন্ত অন্তু আত্মহত্যাই করল!

ঘটনাটার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম কাল রাতে। সাড়ে দশটা নাগাদ। অফিসের ইয়ার এন্ডিং বলে ইদানীং রজত দেরি করে ফিরছে, সবে পাজামা পাঞ্জাবি পরে টিভির পর্দায় চোখ রেখেছিল, রাতের খাবার বেড়ে আমি ডাকাডাকি করছিলাম মুনিয়াকে, তখনই মিত্রার ফোন।

কাঁপা কাঁপা স্বর,—দিদি, তোমার ভাই কি ওখানে গেছে?

—কই, না তো! কেন, কী হয়েছে?

—জানোই তো কদিন ধরে সেই ডিপ্রেশানটা চলছিল। সকালে আমি যখন স্কুলে বেরোই, তখনও চুপচাপ শুয়ে, যখন ফিরলাম তখনও। হঠাৎ সন্ধেবেলা পাঞ্জাবি চড়িয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গেল!

—দাদার ওখানে যায়নি? খোঁজ নিয়েছিস?

—নিয়েছি।

—আশপাশে কোথাও নেই? কোনও বন্ধুবান্ধবের বাড়ি?

—এই তো সর্বত্র খুঁজে এলাম। পার্থদের বাড়ি, ঝণ্টুদের বাড়ি...একটুক্ষণ অনন্ত নৈঃশব্দ্য। তারপর আবার স্বর ফুটল মিত্রার, আর কোথায় যেতে পারে বল তো? আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে!

খটকা লেগেছে আমারও। ডিপ্রেশানের রোগটা অন্তুর নতুন কিছু নয়, সেই

স্কুল কলেজে পড়ার সময় থেকে চলছে। হঠাৎই আসে, সাত-দশ দিন থাকে, তারপর নিজে থেকেই চলে যায়। এই সময়টা একটু খেয়ালী আচরণ করে বটে অন্তু। চুপচাপ শুয়ে থাকে, কারুর সঙ্গে কথা বলে না, দিনরাত কড়িকাঠ গুনছে তো গুনছেই, খাবার হয়তো সারাদিন ঢাকা পড়ে রইল, খেলই না, এই রকম। অফিস-টফিস যাওয়ার তো প্রশ্নই নেই। অমন একটা ফুটফুটে ছেলে, কী সুন্দর টকর-টকর কথা বলে, তার দিকে পর্যন্ত ফিরে তাকায় না। কিন্তু তার পক্ষে কাউকে না জানিয়ে এত রাত অবধি বাড়ির বাইরে থাকাটা একটু বিচিত্রই। সত্যি বলতে কী, এ সময়ে নিজের ঘর থেকে এক পা বেরোতেও অন্তুর তীব্র অনীহা।

তবু উৎকণ্ঠা গোপন রেখে বললাম—মিছিমিছি উতলা হচ্ছিস কেন? কোথাও হয়তো আটকে গেছে, এক্ষুনি ফিরবে।...ওর অফিসের বন্ধুবান্ধবদের ফোন করেছিস?

—সব করা হয়ে গেছে গো। কোথাও নেই।

—ঝগড়াঝাঁটি, কথা কাটাকাটি কিছু হয়েছিল?

—না দিদি, বিশ্বাস করো...আমার সঙ্গে সকাল থেকে একটা কথাও হয়নি।

—ঠিক আছে, দেখছি।

চোখ গোল গোল করে ননদ ভাজের বাক্যালাপ শুনছিল রজত। চার্টার্ড এম বি এ করা কোম্পানি এগ্‌জিকিউটিভ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে হিসেব শুরু করে দিয়েছে। বছর আষ্টেকের ছোট শ্যালককে সে ভালওবাসে খুব, স্পষ্টতই বিচলিত দেখাচ্ছিল তাকে।

কপাল কুঁচকে বলল—কেসটা কিন্তু আমার খুব ক্লিয়ার ঠেকছে না।

—হুঁ।

—চলো খেয়ে নিই, মনে হচ্ছে বেরোতে হবে।

রজতের অনুমানই ঠিক, খাওয়া শেষ হতে না-হতে দাদার ফোন এসে গেল। জরুরি তলব, এক্ষুনি চলে আয়।

প্রস্তুত হতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিইনি আমরা। মুনিয়ার শিয়রে শমন, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আর মাত্র পঁচিশ দিন বাকি, ঝটিতি ফ্লাস্ক ভর্তি দুধকফি মেয়ের টেবিলে নামিয়ে ছুটেছি আমি, রজতও ঝটপট গাড়ি বার করেছে গ্যারেজ থেকে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই টালিগঞ্জ, দাদা সেখানে আগেই পৌঁছেছিল, দু-চার জন বন্ধু প্রতিবেশীও জড়ো হয়ে গেছে—সদলবলে শুরু হল আমাদের অভিযান। থানা, একের পর এক হসপিটাল। এর বাড়ি, তার বাড়ি...। গোটা কলকাতা প্রায় চষে ফেললাম, কোত্থাও কোনও খবর নেই। আশ্চর্য, সন্ধে থেকে তেমন কোনও দুর্ঘটনাই নাকি ঘটেনি শহরে!

বাড়ি ফিরলাম রাত দুটোয়। শুনশান পথ, কুকুররাও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্রান্ত, অবসন্ন, তবু যেন একটু নিশ্চিন্ত আমরা। ভয়ঙ্কর কিছু হয়তো ঘটেনি তাহলে! ঘুম এল না তাও, তন্দ্রা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। অদৃশ্য এক চোরকাটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড, হঠাৎ হঠাৎ ধড়াস ধড়াস করে উঠছে বুক। গেল কোথায় অন্তু?

প্রভাত সব সময়ে শুভ নয়। সকালেই থানা দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিল। লেকের জলে ভেসে উঠেছে অন্তু, ভাসছে...

মর্গের গেটে হরিধ্বনি হচ্ছে। একটু আগেও জনা কয়েক মানুষ পাংশু মুখে সামনের লনে বসেছিল, এখন তারা ম্যাটাডোরের মাথায়। খই ছেটাচ্ছে। এক বিধবা মহিলা রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, তাঁর পৃথিবীর দেনা মেটাচ্ছে প্রিয়পরিজন। একটি কিশোর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, মর্গের নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান।

মৃত্যুর এত উচ্চকিত রূপ আমার ভাল লাগে না। মুখ ফিরিয়ে নিলাম। নতুন লাশকাটা বাড়িটার পিছনে অনেকটা ন্যাড়া জমি, রুখা-সুখা মাটিকে ঝলসাচ্ছে ফাল্গুনের চড়া রোদ। নিষ্করুণ তাপ, পুড়ছে পৃথিবী। হাওয়া বইছে থেকে থেকে, ঝাপটার মতো। গরম হাওয়া। এখনকার হিমায়িত শবাগার থেকে তেমন উৎকট গন্ধ আর বেরোয় না, তবু আছে গন্ধটা। চাপা। এত চাপা যে তাকে বাতাসের স্বাভাবিক ঘ্রাণ বলে ভ্রম হয়।

অজান্তেই পেট মোচড় দিয়ে উঠল আমার। বমি এসে গেল।

অস্বস্তিটা বোধহয় মুখে ফুটে উঠেছিল, দৌড়ে এল পিসতুতো ভাই,—শরীর খারাপ লাগছে রুনুদি?

পাতাবিহীন লাল কৃষ্ণচূড়ার নীচে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল রজত। ভাঁড় ফেলে সেও এগিয়ে এল—কী অসুবিধা হচ্ছে?

—মাথা-টাথা ঘুরে গেছে মনে হয়। যা তাপ!

—কেন যে জেদ করে এলে! এসব জায়গায় আসতে আছে!

কেন যে এলাম তা যদি বুঝত রজত! ও বাড়ি এখন কান্নার সমুদ্র, ওখানে কি তিষ্ঠোতে পারে মানুষ। কষ্ট এখানেও হচ্ছে, বুকটা হুহু করছে অবিরাম। তবু একটাই তো সান্ত্বনা, অন্তুর কাছাকাছি আছি। কোন সেই শৈশবে আমাকে পাশে না পেলে ঘুমোতে পারত না অন্তু, আবার এই শেষবেলায়...!

গেটে ট্যাক্সি থামল একটা। দাদা। সঙ্গে অন্তুর দুই বন্ধু। পার্থ তপন। হুড়মুড়িয়ে নেমে এল দাদা, হাতে কী কাগজ, হনহনিয়ে ঢুকে গেল অফিসে। ফাঁকা ঘর, পাশের খুপরিতে দুই নিষ্প্রাণ-চোখো পুলিশ খাটিয়ায় বসে ঝিমোচ্ছে, কাগজখানা দেখিয়ে তাদের কী যেন বলল দাদা, নির্বিকার উত্তর শুনে তার গলা চড়ছে ক্রমশ।

রজত দৌড়ে গেল—কী হল শান্তদা? এত এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন?

—কথা শোন! তিন তিনটে ঘণ্টা থানায় হত্যে দিয়ে থেকে সেকেণ্ড অফিসারকে তেল মেরে মেরে রিপোর্ট তৈরি করিয়ে আনলাম, এখন বলে কিনা আজ পোস্টমর্টেম হবে না!

—কেন?

—ডাক্তার নেই! তিনি নাকি চলে গেছেন!

—সে কী! এখন তো সবে দেড়টা!

—আজ শনিবার। হাফডে। সিড়িঙ্গে চেহারার কন্‌স্টেবল উদাস মন্তব্য ছুঁড়ল,—সোমবার আসুন, ফার্স্ট আওয়ারে হয়ে যাবে।

—মর্গে হাফডে? পার্থ ঝেঁঝে উঠল,—ফাজলামি হচ্ছে?

—চেল্লাবেন না। এখানে শনি রবি হাফডে ফুলডে ফার্স্টআওয়ার লাস্টআওয়ার সব আছে। এটা গরমেণ্ট অফিস।

—তা বলে বডি এসে গেলেও ডাক্তার থাকবে না? হাফডে করে চলে যাবে?

—ছিলেন তো এতক্ষণ। মেয়েছেলেটার কেস করলেন...। আপনারা কখন রিপোর্ট আনবেন তার জন্য উনি বসে থাকবেন নাকি? আর কোনও কাজ নেই? চেম্বারে গেছেন। কোন্‌টা আগে, অ্যাঁ? জ্যান্তবডি, না ডেডবডি?

অন্য পুলিশটা হাই তুলল—এখানে পার বডি তিনশো, চেম্বারে কামাই অনেক বেশি। কী বুঝলেন?

দাদা হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে। রজত পোড় খাওয়া লোক, অফিসের হাজারটা ফ্যাকড়া ঝঞ্ঝাট সামাল দিতে হয় তাকে, হাল ধরতে সেই এগোল।

ঘনিষ্ঠ জনের ভঙ্গিতে বলল,—কিছু কি করা যায় না ভাই? দু দিন ধরে বডিটা পড়ে পড়ে পচবে?

—পচবে কেন? এ তো এখন ঠাণ্ডাঘর।

—কোথায় আছেন ডাক্তার? রজত সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল,—তাঁকে কি কল দেওয়া যায় না?

—বখেড়া আছে। ডাক্তারবাবু এখন কোন চেম্বারে দেখতে হবে। নাগের বাজার, না ঘুঘুড়ি, না গড়িয়া...। সিগারেট ধরিয়েছে পুলিশটা, জোরে জোরে টান দিচ্ছে,—দাঁও বুঝে ডাক্তারবাবু হয়তো মোটা কোপও মেরে দিতে পারেন।

—সে হবেখন। দেখুন না ভাই...রজত পুলিশটার কাঁধে হাত রাখল,—পুষিয়ে দেব।

—লাভ হবে না। এমনিও তো আজ বডি পাচ্ছেন না।

—কেন?

—লাশ হ্যাণ্ডওভার করার সার্টিফিকেট এনেছেন?

—সেটা কী?

—যাচ্চলে, থানায় কিছু বলেনি? লোকাল কাউন্সিলার বা গেজেটেড অফিসার দিয়ে একটা ইয়ে করিয়ে আনতে হবে। মানে আপনি যে লাশের কেউ, আপনাকে যে লাশটা ছাড়া যায়...। গরমেণ্ট রুল।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 'গরমেণ্ট' শব্দটা উচ্চারণ করছে লোকটা। যেন কথাটা ঈশ্বরের কোনও সমার্থক শব্দ! যেন তাঁর নিয়ম অলঙ্ঘনীয়!

হতাশ মুখে ট্যাক্সিতে উঠছি একে একে। হঠাৎই পিছুডাক,—চলে যাচ্ছেন বাবুরা? লাশ যে আপনাদের পড়ে রইল!

চমকে তাকালাম সবাই। শবাগারের অন্দর থেকে বেরিয়ে আসা লোকটা আবার বলল,—লাশের দেখভাল করার দরকার নেই?

এই বুঝি লাশঘরের ডোম? দড়ির মতো পাকানো চেহারা, বয়স পঁয়ত্রিশও হতে পারে, পঁচাত্তরও। চোখ দুটো টকটকে লাল। ওই চোখ দেখলেই যেন মৃত্যুর স্বরূপ চেনা যায়।

লোকটার মুখে ভকভক দিশি মদের গন্ধ,—লাশ কিন্তু আরাম চায় বাবু। দুটো বড় পাত্তি ফেলে যান, বেশি ঠাণ্ডা দিয়ে দেব। পচবে না, গলবে না...সোমবার যখন আসবেন তাজা ফুলটি...

অসহায় মুখে মানিব্যাগ বার করছে দাদা। বুকটা আমার টনটন করে উঠল। করপোরেশান অফিসে ট্রেড লাইসেন্স বার করার সময়ে একটা লোক ঘুষ চেয়েছিল বলে অন্তু তার কলার চেপে ধরেছিল না? আজ ঘুষ দিয়ে শীতল আরাম খুঁজছে অন্তুর লাশ!

মৃত্যুই তো যথেষ্ট শীতল, আর কত শীতলতা চায় অন্তু!

দুই

ব্যালকনিতে বসে উথালপাথাল ভাবছিলাম। সন্ধের পর পরই টালিগঞ্জ থেকে ফিরেছি আমরা। এখন কেমন যেন খারাপ লাগছে। রাতটা কি মিত্রার কাছে থেকে যাওয়া উচিত ছিল? কী করি, মুনিয়াটার সামনে পরীক্ষা, ও বাড়িতে ছোটমামা ছোটমামা করে কেঁদে ভাসছিল, মেয়েটাকে সরিয়ে এনে ঠাণ্ডা না করলে কি চলে! তাছাড়া মিত্রার বাপের বাড়ির লোকজন এসে গেছে, দাদা-বউদিরাও থেকে গেল আজ, ওইটুকু বাড়িতে ক'জন আর গাদাগাদি করব! অন্তুর ছেলেটাও বায়না

করে চলে এল সঙ্গে। শোকের বাড়িতে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল টুবলু, পালাতে চাইছিল...। থাক, একটা রাত নয় এখানেই রইল।

আমাদের ফ্ল্যাটের পুবদিকটা খোলা। কাছাকাছি তেমন উঁচু বাড়ি নেই, সাততলার এই অলিন্দ থেকে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সোনালি সুতোর মতো বাইপাসের আলো, অপসৃয়মাণ গাড়িদের সর্পিল নড়াচড়া, নাগরিক আলোর বিস্তারিত আভাস, থোকা থোকা অন্ধকারও। সবই কেমন আবছা আজ। আবছা, না ঝাপসা? মনে পড়ছিল, ছোটবেলায় বিচিত্র এক খেলার নেশা ছিল অন্তুর। হঠাৎ হঠাৎ লুকিয়ে পড়ত যেখানে সেখানে। এই হয়তো খাটের নীচে ঘাপটি মেরে বসে আছে, এই হয়তো আলমারির পিছনে সেঁধিয়ে গেল, কিংবা বাথরুমের কোণটায়...। মা আমি দাদা খুঁজে খুঁজে হাল্লাক, সন্ধান মিললেই অন্তুর ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি,—কী, কেমন জব্দ করেছিলাম! কাল অন্তুটা সত্যিই জব্দ করল, জলের তলায় রইল সারারাত!

রজত এসেছে ব্যালকনিতে। সদ্য স্নান করেছে রজত, ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ উড়ছে বাতাসে। এতক্ষণ ড্রয়িংরুমে বসে একটার পর একটা টেলিফোন সারছিল। বছরের ব্যস্ততম সময়ে একটা পুরো কাজের দিন বানচাল, তার খেসারত দিচ্ছিল বোধহয়।

চেয়ার টেনে পাশে বসল রজত। সিগারেট ধরিয়ে বলল,—মিত্তালকেও একটা ফোন করে দিলাম, বুঝলে।

জগদীশ মিত্তাল অন্তুদের কোম্পানির মালিক। রজতের ঘনিষ্ঠ পরিচিত।

ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম,—ভাল করেছ।

—যা হাওয়ার তা তো হয়েই গেল। এবার তো পরের ব্যাপারটাও ভাবা দরকার, কি বলো?

মৃত্যু অসহ। মৃত্যু বিহ্বল করে। তবু তার মধ্যেও রজতের মতো মানুষেরা দায়িত্বজ্ঞান হারায় না।

আর একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম,—হুঁ।...কী বললেন মিত্তালসাহেব?

—শুনে হায় হায় করছিল...চাকরিতে ন' সাড়ে ন বছর হয়েছিল অন্তুর, তাই না?

—আর একটু বেশি হবে। সাড়ে দশ মতো।

—ওর তো কনট্রিবিউটারি প্রভিডেণ্ড ফান্ড, সওয়া লাখ মতো পাবে।...কোনও লোনটোন চলছিল কিনা জানো?

—মার অসুখের সময় নিয়েছিল কিছু। হাজার পনেরো।

—সে তো তিন বছর আগে। অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই শোধ হয়ে গেছে। তারপর ধরো, গ্র্যাচুইটিও পাবে হাজার বিশেক। এট্‌সেট্রা এট্‌সেট্রা মিলিয়ে দেড় লাখ

হয়ে যাবে। অর্থাৎ ফিক্সড্ করলে মাসে দেড় হাজার।...মিত্রা স্কুল থেকে কত পায়?

—কী জানি, বলতে পারব না।

—একে প্রাইভেট স্কুল, তায় নার্সারির টিচার। দু হাজারের বেশি কক্ষনও না। রজতকে যেন একটু চিন্তিত দেখাল। পাশের পাতাবাহারের টবে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল আলগোছে। ভুরু কুঁচকে বলল,—মাত্র সাড়ে তিন হাজারে কি চলবে? বাড়ি ভাড়াই তো বারোশো। তারপর টুবলুর লেখাপড়া আছে...

এত কেজো কথা ভাল লাগছিল না আমার। কঠোর বাস্তবের কথা তো ভাবতেই হয়, তা বলে এই মুহূর্তে? যখন আমার ভাইটা শুয়ে আছে লাশকাটা ঘরে?

রজত আবার বলল,—মিত্রার চাকরির জন্য মিত্তালকে বলে দেখব? হিট দা আয়রন হোয়েন ইট ইজ হট। সিম্প্যাথিটা থাকতে থাকতেই যদি...মিত্রার তো কোয়ালিফিকেশনও আছে, অ্যাকাউন্টসে-ফ্যাকাউন্টসে যদি প্রোভাইড করে দিতে পারে...। স্কুলের থেকে ডেফিনিট্‌লি বেটার পে পাবে।

আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে। টিপ টিপ আলো ভাসতে ভাসতে ক্রমে মিলিয়ে গেল। তবু যেন মৃদু একটা ধ্বনি বাজছে এখনও। কানের পর্দায় টোকা মারছে।

ভার গলায় বললাম,—অন্তুটা এরকম একটা কাজ কেন করে বসল বল তো?

রজত থমকে গেল। গ্রিলে চেপে চেপে নেবাল সিগারেট, ছুঁড়ে দিল শূন্যে। একটু চুপ থেকে বলল,—কী করে বলব? আত্মহত্যা করার সময়ে মানুষ পুরোপুরি ইনসেন্ হয়ে যায়, অন্তুও হয়তো...

—কিন্তু তার একটা কারণ তো থাকবে।

—ডিপ্রেশান অফকোর্স।

—এত ডিপ্রেশান তো অন্তুর ছিল না! রুটিন ব্যাপার, একটু মেলানকোলিয়া মতন, কদিন গুম হয়ে থাকা, ব্যস তার জন্য সুইসাইড করবে?

—এভাবে ডেফিনিট্ কিছু বলা যায় না। মানুষের মনের কতটুকু খবর রাখি আমরা? কোথায় কার কীভাবে ঢেউ উঠছে, নামছে...। নিশ্চয়ই ওর মনে কোনও ডিপরুটেট অভিমান ছিল।

—কার ওপর অভিমান?

—সবার ওপর। তুমি, আমি, শান্তদা, তোমার বউদি, তার বউ, এমন কি তোমার মৃত মা-বাবার ওপরও অভিমান থাকা বিচিত্র নয়।

কথাটা ঠং করে বাজল বুকে। অন্তুর অবসাদ রোগটা প্রথম দেখা দেয় ষোলো

বছর বয়সে। বাহাত্তর সাল, নকশাল রাজনীতিতে মেতে উঠেছিল আমাদের পাড়ার কয়েকটা ছেলে, অন্তু মোড়ে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করছিল, দুম করে পুলিশ সব কটাকে তুলে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে বাবা যখন থানা থেকে ছাড়িয়ে আনল, তখন অন্তুর সে কী রাগ! তুমি আমায় মুচলেকা দিয়ে নিয়ে এলে বাবা! বন্ধুদের চোখে আমায় ছোট করে দিলে! বাবা কত বোঝানোর চেষ্টা করল, আমি থানায় মিছে কথা লিখিনি, সত্যি তো তুই রাজনীতি করিস না! কে শোনে কার কথা! আমার বন্ধুরা তো কোনও অন্যায় করেনি, পুলিশ যদি তাদের নিয়ে গিয়ে বিনাবিচারে আটকে রাখে, মারধর করে, আমাকেও নয় তাই করত! তুমি কেন অযথা উপযাচক হয়ে আমাকে...! শেষমেশ বেজায় চটে গিয়েছিল বাবা, খুব বকাবকি করেছিল অন্তুকে। তখনই প্রথম বার...। কী এমন অযৌক্তিক কথা বলেছিল বাবা? বাবা তো অন্তুর ভালই চেয়েছিল।

অন্তু চিরকালই এরকম। অদ্ভুত। খ্যাপাটে অবুঝ। মনে আছে, তখন অন্তু আরও ছোট, দশ-এগারো বছরের, হঠাৎ একদিন কোথ্‌থেকে এক রাস্তার ছেলেকে ধরে নিয়ে এল। কী, না ছেলেটা গরিব, খেতে পায় না, আজ থেকে আমাদের বাড়িতে থাকবে, পড়াশুনো করবে...! মা ঝামেলায় যায়নি, টুক করে মাসির বাড়ি পাচার করে দিয়েছিল ছেলেটাকে, কাজকর্ম করে খাবে। জানতে পেরে অন্তুর কী চোটপাট, তোমার ছেলেকে কেউ যদি এভাবে চালান করে দেয় কেমন লাগবে! ছেলেটা অবশ্য মাসির বাড়িতে এক মাসও টেকেনি, ঘড়িটড়ি কীসব চুরি করে ধাঁ। ওই ছেলেকে বাড়িতে না পুষে মা কি কোনও অন্যায় কাজ করেছিল?

অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলাম,—আমরা তো কেউ কখনও অন্তুর খারাপ চাইনি।

রজত আর একটা সিগারেট ধরাল,—আপনজনের কেই বা খারাপ চায় রুনু? আসলে একজনের চাওয়াকে অন্যজন হয়তো ঠিক গ্রহণ করতে পারে না।

—পারে নাই তো! অন্তু তো কিছুই নিতে পারত না। এম এস সি-তে চান্স না পেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, দাদা অফিস থেকে লোন তুলে ওকে টাকা দিল, অর্ডার সাপ্লায়ের ব্যবসাটা ধরিয়ে দিল, একে ধরে তাকে ধরে পার্টিও জোগাড় করে দিয়েছিল অনেক, ক বছর বিজনেস টিকিয়ে রাখতে পারল, বলো? ব্যবসার ন্যায়নীতি মানব না, কাউকে ঘুষ দেব না, কোথাও কোনও গোজামিল থাকবে না, ওভাবে কি বিজনেস চলে? সবাইকেই একটু-আধটু মানিয়ে নিতে হয়, এটাই নিয়ম। তোমাদের তো এত বড় কোম্পানি, কোটি কোটি টাকার কারবার, তোমাদের কাটমানি দিতে হয় না?

—সবাই কি এক ছাঁচের হয় রুনু?

—হয়তো হয় না। তবে তাদের অভিমানও সাজে না।...দাদা খুব দুঃখ পেয়েছিল সে সময়, আমি জানি।

—দুঃখ জিনিসটা বড় স্বার্থপর রুনু। রজত ঠোঁট সরু করে ধোঁয়া ছাড়ল। কালচে অন্ধকারে দুলছে ধোঁয়া, কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেদিকে একটুক্ষণ তকিয়ে ভারী করল গলা,—ডোণ্ট মাইন্ড, তোমার দাদা যখন তোমার বউদির উসকানিতে আলাদা ডেরা বাঁধল, অন্তু শকড্ হয়নি?

—বউদিকে দোষ দিচ্ছ কেন? দাদাদের ও বাড়িতে আর কুলোচ্ছিল না। ওই টুকু-টুকু আড়াইখানা ঘর, ওদের সংসার বড় হচ্ছে...। তাছাড়া দাদা তো কখনও বাবা-মার দায়িত্ব অস্বীকার করেনি। যতদিন তারা বেঁচেছিল নিয়মিত টাকা দিয়েছে।

—ব্যস, ওতেই অন্তুর দুঃখ উবে যাবে? অন্তু যে একটু অন্য রকম ছিল তা কি অস্বীকার করতে পার? রজত সামান্য দূরমনস্ক,—জানো, আমার অফিসে এলেই অন্তু অদ্ভুত এক প্রশ্ন করত! রজতদা, এই যে আপনি স্যুট-টাই পরে বসে আছেন, আপনার কি মনে হয় না, আপনি একজন ভুল মানুষ ভুল জায়গায় বসে ভুল কাজ করে চলেছেন? আপনার এই মুহূর্তে অন্য কোথাও অন্য মানুষ হয়ে থাকা উচিত ছিল? আমি বলতাম, নাহ্, এরকম মনে হবে কেন? বলত, আমার কিন্তু ভীষণ মনে হয়।

অজান্তেই মুখ হাঁ হয়ে গেল,—বুঝলাম না।

—আমিও বুঝিনি। শুধু বুঝতে পারতাম, চাকরিটা ওকে কষ্ট দিচ্ছে।

চুপ করে গেলাম। চাকরিটাও যে অন্তুর ভাল লাগছে না, আমি জানতাম। দাদা একা একা কতদিন বোঝা টানবে, দাদারা ও বাড়ি ছাড়ার পর আমিই রজতকে ধরে বলে অন্তুর চাকরিটার ব্যবস্থা করেছিলাম। বড় কিছু নয়, মিত্তালদের কারখানায় স্টোরকিপারের চাকরি। কিন্তু ওই যে পণ, চুরি করব না, চুরি করতে দেব না...! ইউনিয়নের লোকরাও অখুশি, অফিসাররাও দুচক্ষে দেখতে পারে না এবং অন্তুরও মনঃকষ্ট। যুক্তিহীন দুঃখবিলাস! কে তোর ওপর বিশ্বভুবনের ভার দিয়েছে? একটু চোখ-কান বুজে থাকতে পারলেই সব ল্যাটা চুকে যায়, তা নয়...! মাঝে মাঝেই অফিস যাচ্ছে না, বাড়িতে গুম হয়ে শুয়ে থাকছে, কোনও মাসেই পুরো মাইনে পায় না...। এক সময় তো মিত্তাল বেশ বিরক্ত হয়েছিল, প্রায় রাত্রেই ফোন করত রজতকে। তখন আমি গিয়ে বুঝিয়েছি, রজত বুঝিয়েছে, বলেছি আমাদের সম্মানটা নষ্ট করিস না। দেখেছি তো, মা তখন কত বাবা বাছা করে ছেলেকে অফিস পাঠাত! অত অনিয়মিত, অত মেজাজ, অত জেদ...বলতে নেই রজতের জন্য চাকরিটা এতদিন টিকে ছিল। ভেবেছিলাম বিয়ে-থা দিলে, ঘাড়ে জোয়াল চাপালে

হয়তো পরিবর্তন আসবে। হল উল্টো, টুবলু হওয়ার পর মিত্রাকেই মরিয়া হয়ে স্কুলের কাজটা জোগাড় করতে হল।

তা এভাবেই তো কেটে যাচ্ছিল, শুধু শুধু মরতে গেল কেন?

নাহ্, আর ভাল্লাগছে না ভাবতে। অন্তুটা সব কেমন গোলমাল করে দিল। সুখী পরিতৃপ্ত জীবনের বদলে কেন যে জলের নীচের অন্ধকার বেশি ভাল লাগল অন্তুর?

টুবলু মুনিয়ার ঘরে কলকল করছে। মুনিয়ার বেডরুম ফ্ল্যাটের ওই প্রান্তে, এখান থেকে অনেকটা দূর, তবু মাঝে মাঝে ছিটকে ছিটকে আসছে শব্দ। এখানে এনে ভালই হয়েছে, মনখারাপ ভাবটা কেটেছে টুবলুর। আহা রে, মাত্র তো পাঁচ বছর বয়স, ওইটুকু বাচ্চা বাবার মৃত্যুর কী বা বোঝে!

উঠে পায়ে পায়ে মুনিয়ার ঘরে গেলাম। দেখছি টুবলুর কাণ্ডকারখানা। মুনিয়ার ঘরে দেওয়ালময় পোস্টার। শচিন সৌরভ লিয়েণ্ডার শাহ্রুখ...। সমস্ত সফল মানুষদের ছবি। আশ্চর্য, সব ছেড়ে টুবলু পড়েছে কোণের পোস্টারটা নিয়ে। চার্লি চ্যাপলিন। মাথায় টুপি, বুরুশ গোঁফ, হাতে লাঠি, পায়ে ছেঁড়া জুতো, দুঃখী দুঃখী মুখে কোনও রকমে সামলাচ্ছে কোমরের প্যাণ্ট। নিঃস্ব জোকারটাকে দেখে উদ্ভট উদ্ভট প্রশ্ন করছে টুবলু, যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছে মুনিয়া। উত্তর থেকে আবার শুরু হচ্ছে টুবলুর প্রশ্ন।

ডাকলাম,—এই টুবলু, কিছু খাবি এখন?

—দুধ খেলাম তো এসে।

—শুধু দুধ খেলে হবে? মুনিয়া ভায়ের গাল টিপে দিল,—চাউ খাবি?

—হ্যাঁঅ্যা।

—মা, আমি বানাব চাউমিন?

—পারবি করতে?

—পারব।

—তোর বাবা খাবে কিনা জিজ্ঞেস কর। তুইও খেয়ে নিস। রাত্তিরে আমি আর কিছু করব না। শুধু সেদ্ধ ভাত।

ড্রয়িংরুমে ফোন বাজছিল। রজত এসে ধরল বুঝি ফোনটা, আমি শুয়ে পড়লাম মুনিয়ার বিছানায়। টুবলুর চুলে হাত বোলাচ্ছি। ছোট্টবেলায় অন্তুটা খুব আদুরে ছিল, চার বছরের বড় দিদির সামনে হঠাৎ হঠাৎ মাথা নামিয়ে দাঁড়াত, এই দিদি, চুলে আরাম করে দে না! এখন আরাম খাচ্ছে তার ছেলে, সে বেমালুম শুয়ে লাশকাটা ঘরে!

দরজায় রজত,—শুনছ?

চমকে উঠলাম,—উঁ?

—এদিকে এসো, কথা আছে।

মন বুঝি কু ডাকল আবার। ধড়মড় করে বাইরে গেছি,—কী হয়েছে?

রজত চাপা স্বরে বলল,—শান্তদা ফোন করছিল। একটা প্রবলেম হয়েছে। ওই যে সার্টিফিকেটটা জোগাড় করার কথা বলল না, ওটা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। ও পাড়ায় কে অনুপমবাবু আছে, রাইটার্সের অফিসার, তার কাছে গেছিল শান্তদা, ভদ্রলোক নানান বাহানা করছে। একবার বলছে সিল অফিসে আছে, একবার বলছে আপনাদের বাড়ির ব্যাপার কিছু জানি না, আনন্যাচারাল ডেথ তো, কোথা থেকে কী হবে...

—আশ্চর্য, দাদা বডি নেবে, দাদাকে চেনে, এইটুকু লিখে দিতে...?

—মানুষ এরকমই। ঝঞ্ঝাটের সামান্যতম সন্দেহ মনে এলেই শামুকের খোলে গুটিয়ে যায়।

—তাহলে কী হবে?

—ব্যবস্থা একটা হচ্ছে। তোমাদের ওই লোকাল কাউন্সিলার আছে না, অজিত রক্ষিত, তার কাছ থেকেই নিতে হবে। সেখানেও নাকি আবার ক্যাচ আছে। পুরপিতা মহাশয়ের কে পার্শ্বচর আছে, স্বপন সামন্ত না কী যেন নাম বলল শান্তদা, তার কাছে নাকি কাউন্সিলারের সই করা প্যাড থাকে। তা সে এখন বাড়ি নেই, কোথায় না কোথায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, কাল সক্কালবেলা তাকে গিয়ে ধরতে হবে। সার্টিফিকেট সেই লিখবে। তার কাছে একা যেতে শান্তদা সাহস পাচ্ছে না, আমাকেও সকাল সকাল পৌঁছে যেতে বলল। সোফায় বসে অভ্যাস মতোই টিভির রিমোট হাতে রেখেছিল রজত, হাত সরিয়ে নিল পরমুহূর্তে। জিজ্ঞাসা করল,—কে স্বপন? তুমি চেনো?

চিনি তো সক্কলকেই। অজিত রক্ষিত এককালে এলাকার কুখ্যাত মস্তান ছিল। তার নামে খুনের মামলাও ছিল বেশ কয়েকটা। রাজনৈতিক দাদাদের স্নেহের জোরেই হোক, কী পেশীর দাপটে, সাক্ষীসাবুদের অভাবে কেস টেকেনি। এখন সে পৈতে গলিয়ে বড়বামুন। আর স্বপন সামন্ত তো নাম্বার ওয়ান ফেরেববাজ। লোক ঠকিয়ে বিশাল সম্পত্তির মালিক, স্মাগলিং-টাগলিংও করে শুনেছি। এমন লোকের সংস্পর্শে আসা তো দূরস্থান, ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না অন্তু, নাম শুনলে থুতু ছেটাত। আজ তাদের ওপরই নির্ভর করছে অন্তুর অন্তিম সৎকার!

চোখ বুজে ফেললাম। লেকের পাড়ে শুয়ে আছে অন্তু, রোগাসোগা শরীর ফুলে ঢোল, শ্যামলারঙ ফ্যাকাসে সাদা, কুঁকড়ে গেছে লম্বা কাঠামো! না, ঠিক

কুঁকড়ে নয়, হাঁটু দুটো ভাঁজ করা, হাত ডানার মতো দু দিকে ছড়ানো! অবিকল উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি!

শেষ মুহূর্তে কি ওড়ার বাসনা হয়েছিল অন্তুর? এত সব হীন প্রক্রিয়া আত্মস্থ করতে হবে তার শরীরকে, এই আশঙ্কায়?

উড়তে চেয়ে জলেই পড়ে গেল। কেন তুই সাঁতার শিখিসনি অন্তু?

তিন

মর্গ থেকে বাড়ি, বাড়ি হয়ে শ্মশান, অন্তু চলে গেছে বহুক্ষণ। না, অন্তুর দেহ। ডেডবডি। শব। এবার তার পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পালা।

আমার শ্মশানে যাওয়া হল না। সাদা চাদরে মোড়া অন্তুকে দেখে হঠাৎ কেমন মাথাট ঘুরে গেল, জোর করে আমায় শুইয়ে রেখে গেল রজত। বাড়ি এখন ভয়ঙ্কর নিঝুম, যেন প্রবল ঝড়বৃষ্টির পর ঝিমিয়ে পড়েছে একেবারে। শব্দহীন হাহাকারহীন অসহ্য গুমোট। নিঃসাড়ে বনবন ঘুরছে পাখা, বাতাস ছাড়াই।

বউদি ঘরে এল,—শরীরটা এখন ভাল লাগছে রুন?

—উঁ? হুঁ।

—চা এনেছি, খেয়ে নাও।

উঠে বসলাম,—কারুর সাড়া পাচ্ছি না কেন? সবাই কি চলে গেল?

—না, আছে অনেকে, চিত্রা বন্দনা, দেবী, পিসিমা, মামিমা...বাইরের ঘরে আছে সব। বউদি চলে যেতে গিয়েও দাঁড়াল,—মিত্রাটা চা'ও মুখে তুলতে চাইছে না, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখবে?

অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম,—ওর বোনদের বলে দ্যাখো না।

—কারুর কথাই শুনছে না।...তোমাকে তো খুব মানে...

সদ্য স্বামীহারা স্ত্রীকে কী ভাষায় সান্ত্বনা দিতে হয় আমি জানি না। তবু গেলাম। ছোটঘরের চৌকিতে বসে আছে মিত্রা, হাঁটুতে মুখ গুজে। এ ঘরে এক সময়ে আমরা তিন ভাইবোন পড়াশুনো করতাম, এখন ঘরটা হাবিজাবিতে বোঝাই। মেলানকোলিয়ার সময়ে এই ঘরটাই অন্তুর আশ্রয় ছিল, তিনটে দিন আগেও।

দরজা ঠেলার মৃদু শব্দে চমকে তাকিয়েছে মিত্রা। মুখের লাবণ্য মরে গেছে, চশমা খোলা চোখের কোলে গাড় কালির পোঁচ।

অন্তুর মৃত্যুর পর এই প্রথম আমি একা মিত্রার মুখোমুখি।

পাশে বসে পিঠে হাত রাখলাম। নিচু গলায় বললাম,—তোকে শক্ত হতে হবে মিত্রা, এখন থেকে তুই টুবলুর মা বাবা দুইই।

মিত্রার চোখে কী যেন খেলে গেল। জলও নয়, জ্বালাও নয়, অন্য কী যেন। পরক্ষণে মণি স্তিমিত।

আবার বললাম,—একা একা বসে থাকিস না। আয়, এ ঘরে আয়। সবার সঙ্গে থাকলে...

কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। মন ভাল হয়ে যাবে বলা কি এখন নির্মম ঠাট্টা নয়?

আচমকা মিত্রার স্বর ফুটল,—একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে দিদি? তোমার ভাই আমার সঙ্গে এই নিষ্ঠুর আচরণ করল কেন?

এ প্রশ্ন তো আমারও। তবু বলে ফেললাম,— থাক না রে, ও কথা কি এখন ভাবার সময়?

—এইটাই তো সময়, পরে আর তার কথা ভাবব কেন? মিত্রা আবার থুতনি রাখল হাঁটুতে,—তুমিই বলো দিদি, সাত বছর হল বিয়ে হয়েছে, সে কী সুখ দিয়েছিল আমায়? কটা শাড়ি কিনে দিয়েছে? কটা গয়না গড়িয়ে দিয়েছে বিয়ের পর? কটা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছে? সামান্য সঙ্গটুকু পর্যন্ত দেয়নি। অফিস থেকে ফিরল, অমনি বেরিয়ে গেল। কোথায় কার থ্যালাসেমিয়া হয়েছে, তার রক্ত জোগাড় করছে! কোথায় কার বাড়িতে হাঁড়ি চড়ছে না, সংসারের খুদকুড়ো থেকে তাদের অন্ন জোগাতে ছুটল! কার কোথায় অসুখ করল, তাকে নিয়ে হসপিটালে ছুটল! হ্যাঁ, তার জন্য বকাবকি করেছি, চেঁচামিচি করেছি, তোমাদের কাছে নালিশ করেছি কতবার...বলো, অন্যায় করেছি? বলো? নিজের ছেলে এ বি সি ডি শিখল কিনা সে হুঁশ নেই, বস্তির ছেলেদের গিয়ে পড়াচ্ছে, তাদের মায়েদের পড়াচ্ছে...! শিক্ষাও তো হয়েছিল। এগারো নম্বর বস্তির লোকেরা এসে শাসিয়ে গেল, তোমার ভায়ের ফুসমন্তর শুনে তাদের বউরা নাকি টেঁটা হয়ে গেছে, বরদের মদ খাওয়া ছাড়াতে চাইছে, ফের যদি ওই বস্তিতে ঢোকে পা খোঁড়া করে দেবে! কবেকার আর কথা? এই ধরো গত সোমবার। তবু বাবুর চৈতন্য হল কই? ফের গেল ওখানে পড়াতে। সেদিন ফেরার পর তোমার ভায়ের আমি শুধু পা জড়িয়ে ধরতে বাকি রেখেছি। বলেছি, এবার ওসব ছাড়ো, অন্যের চিন্তা না করে নিজের সংসারের কথা ভাব। খুব অন্যায্য কথা বলেছিলাম কি দিদি?

বুকটা গুড়গুড় করে উঠল। সেদিন থেকেই কি আবার অন্তর অবসাদটা এসেছিল?

মিত্রা বিড়বিড় করে চলেছে, আমি তো তার কাছে বেশি কিছু চাইনি দিদি। আর পাঁচটা মেয়ে সংসার থেকে যা চায়, তার কণামাত্র বেশি নয়। নিজেদের নিয়ে, নিজেদের গণ্ডির মধ্যে, নিজেদের মতো বাঁচা। পাঁচজনের কী হল না হল,

তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কী দরকার? কত কষ্ট করলাম তোমার ভায়ের জন্যে, কত চেষ্টা করলাম ভালবাসা দিয়ে তার দৃষ্টি ফেরাতে...।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভালবাসা! লেকের পাড়ে শিমুলগাছের নীচে পড়ে আছে অন্তুর লাশ, কাছাকাছি জোড়ায় জোড়ায় প্রেমিক প্রেমিকা ভালবাসার কূজনে মগ্ন, স্বপ্ন দেখছে অনাগত ভবিষ্যতের, আগামী সুখের, অন্তুর মাছে খুবলোনো মুখটার দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না! ওই নিরাসক্ত দৃশ্যের সঙ্গে অন্তুর মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আমার।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে। মিত্রা শুয়ে আছে চোখ ঢেকে। ছোটঘরের ক্রমক্ষীয়মাণ আলোয় আমি বসে আছি নির্বাক।

কান্না পাচ্ছিল।

আমরা প্রত্যেকেই অন্তুর ভাল করতে চেয়েছিলাম। বাবা মা দাদা আমি মিত্রা আত্মীয় বন্ধু সক্কলে। আমাদের মতো করে। আমাদের যুক্তি বুদ্ধির নিক্তিতে মেপে।

তবু অন্তুকে বাঁচানো গেল না।

এটাই হয়তো স্বাভাবিক। জীবজন্তুরা কি আত্মহত্যা করে?

আমি মাধবী

আমি পুণ্যশ্লোক রাজা যযাতির মেয়ে মাধবী। মাতৃপরিচয়? কী হবে জেনে? মা তো শুধুই গর্ভধারণের আধার, তাঁর পরিচয় কোন কাজে লাগে? আমি জন্মেছি অমিতবীর্য রাজা যযাতির ঔরসে, এই আমার একমাত্র পরিচয়। 'কুমারী' মেয়ের এ ছাড়া আর কোনও পরিচয় থাকতে নেই যে।

পরিচয় কেন, আমার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বও আছে কি?

মনে পড়ে এক বসন্তের সকালে, আমি তখন সদ্য যুবতী, রাজপুরীর বাগানে প্রিয় সখীদের সঙ্গে ফুল কুড়োচ্ছি, রাজসভায় ডাক পড়ল আমার। গিয়ে দেখি ভারী গম্ভীর মুখে সিংহাসনে বসে আছেন বাবা, কিছুটা বুঝি বা চিন্তিতও। সামনে ঋষির বেশে এক দিব্যকান্তি যুবক, পাশে তাঁর এক মহাবলশালী পুরুষ। দ্বিতীয় পুরুষটিকে আমি চিনি। ইনি আমার পিতৃসখা গরুড়। নত হয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে। ঋষিকেও।

আমার আগমনে সভায় ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। রাজার ভুরুর কুঞ্চন যেন শিথিল সামান্য। মন্দ্র স্বরে বললেন,—শোনো মাধবী, সখা গরুড় ঋষি গালবকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন। ঋষি গালব আমার কাছ থেকে এমন কিছু চান যা এঁরা দেশে দেশে ঘুরেও পাননি।

আমি বিস্মিত হলাম। এ জন্য আমাকে ডেকে আনার কী দরকার?

বাবা আর আমার দিকে তাকালেনও না। অকম্পিত স্বরে ঋষিকে বললেন,

—মুনিবর, এই মুহূর্তে আপনার প্রার্থনা পূরণ করার সঙ্গতি আমার নেই। কিন্তু বিষ্ণুসখা কিংবা আপনার মতো ব্রহ্মর্ষিকে নিরাশ করা আমার অন্যায় হবে। আপনি এক কাজ করুন, আপনার প্রার্থিত আটশো অশ্বের বদলে আমার কন্যা মাধবীকে

নিয়ে যান। আমার কন্যাটি অতি সুশীলা, রূপবতী। আশা করি একে পেলে আপনার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।

ঘোড়ার বদলে আমি? বাবার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই মাথায় ঢুকছিল না। প্রশ্ন করাও যাবে না কিছু, সে অধিকারও আমার নেই। বিহ্বল চোখ জন্মদাতার মুখ থেকে ঘুরে ঋষি গালবের দিকে পড়ল। আজ থেকে আমি এঁরই অধীনা? ভাবতে অবশ্য মন্দ লাগছে না। ক্ষত্রিয় বীর নয় নাই হল, এমন বিদ্বান সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আমার মতো মেয়েরা তো মনে মনে এমন একজনকেই স্বপ্ন দেখে থাকে।

অন্দরমহলে খানিক কান্নাকাটি হল। দাসীরা কাঁদল, সখীরা কাঁদল, মা কাঁদলেন, বিমাতা কাঁদলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক বস্ত্রে ঋষি গালবের সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ছাড়লাম আমি।

পিতৃসখা গরুড় অন্য পথে চলে গেলেন। নীরবে হাঁটছেন গালব, পিছনে দুরু দুরু বুকে আমি। মনে মনে প্রস্তুত করছি নিজেকে। বিলাস বৈভব সব ভুলে এবার থেকে তপোবনে কাটাতে হবে বাকি জীবন, নিজেকে ওই মানুষটার যোগ্য করে তুলতে হবে। পারব তো? নিশ্চয়ই পারব। আমি গালবের প্রেমে পড়েছি, মেয়েরা কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে পেলে তার জন্য সব করতে পারে।

হাঁটছি তো হাঁটছি। রাজধানী পার হয়ে লোকালয় এল। তারপর ছোট্ট অগভীর বন। বনের শেষে কুলকুল এক নদী। পথশ্রমে ক্লান্ত ঋষি নদীর কিনারে এক শিংশপা গাছের নীচে বসেছেন। একটু দূরত্ব রেখে সসঙ্কোচে আমিও।

পথের নীরবতা বৃক্ষছায়ায় অসহ্য লাগছিল। অথচ নিজে থেকে কথা বলার সাহসও হচ্ছে না। এক সময়ে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম,—ঋষিবর, আমি কি আপনার সেবা করব?

গালব হাসলেন সামান্য। মাথা নেড়ে বললেন,—না। দরকার নেই। একটু পরেই উঠব আমরা।

কী মধুর কণ্ঠস্বর! আমি বিগলিত গলায় বললাম,—আমরা কি নদীর ওপারে যাব?

—হ্যাঁ।

—আপনার আশ্রম কি এখান থেকে বহু দূর?

—হুঁ।

কথা বলছেন গালব, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আমার দিকে নেই, বহতা নদীতে স্থির।

ঈষৎ লাস্য আনলাম গলায়,—আপনি এত গম্ভীর কেন ঋষি? আমাকে কি আপনার পছন্দ নয়?

গালব যেন একটু বিরক্ত হলেন। ক্ষণেক আমাকে দেখেই আবার তাঁর চোখ নদীতে। রুক্ষ স্বরে বললেন,—শোনো যযাতির মেয়ে, এটা রঙ্গরসিকতার সময় নয়। তুমি কি জানো, কী কারণে তোমায় নিয়ে এসেছি?

আরেকটু চপল হলাম, জানি। আটশো ঘোড়ার বদলে আপনি আমায় গ্রহণ করেছেন।

—ভুল। আটশো ঘোড়ার বদলে নয়, আটশো ঘোড়ার জন্য তোমাকে আনা হয়েছে।

—মানে?

—ও, তার মানে রাজা যযাতি তোমায় সব খুলে বলেননি!

পলকের জন্য গালব অন্যমনস্ক। উঠে পড়লেন, পায়ে পায়ে গেলেন নদীর ধারে, আঁজলা ভরে মুখে চোখে জল ছেটালেন। ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে, স্পষ্ট কথা স্পষ্টভাবে শুনে নাও যযাতির মেয়ে। আমি তোমাকে গ্রহণ করার জন্য আনি নি। অন্তত এই মুহূর্তে। আমার জন্য তোমায় একটা কাজ করতে হবে। কঠিন কাজ।

আমার বুক থর থর। অস্ফুটে বললাম,—আজ্ঞা করুন।

—আমার গুরু বিশ্বামিত্র আমার কাছে আটশোটি দুর্লভ ঘোড়া গুরুদক্ষিণা চেয়েছেন। এমন ঘোড়া যাদের গায়ের রঙ ধবধবে সাদা, কিন্তু একটি কান শ্যামবর্ণ। অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে এমন ঘোড়া আছে শুনেছি। তবে খবর পেয়েছি তিনি তা এমনি এমনি দেবেন না। বিনিময়ে হর্যশ্ব এমন এক নারী চান যে তাঁকে রাজচক্রবর্তী পুত্র উপহর দিতে পারে।...আমি এখন তাঁর কাছেই যাব। যদি তিনি তোমাকে পছন্দ করেন, তবে তাঁর হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে আমার ঘোড়া সংগ্রহ করব।

আমি স্তম্ভিত। বাকরুদ্ধ। এ কী বলছেন গালব? মেয়ে হতে পারি কিন্তু মানুষ তো বটে। ইনি আমাকে ভাড়া খাটাতে চান? ছি ছি।

সম্বিত ফিরতে সোজাসুজি তাকালাম, আমার বাবা এসব জানেন?

—অবশ্যই। তিনিই তো আমাকে পরামর্শটা দিলেন।

রাগে দুঃখে অভিমানে চোখে জল এসে গেল। আমার জন্মদাতাই জেনেশুনে...!

কোনওক্রমে বললাম,—তার মানে এখন আমায় অযোধ্যায় জীবন কাটাতে হবে?

—হুঁ। অন্তত যতদিন না তুমি পুত্র প্রসব করো ততদিন।

—তার পর?

গালবের ঠোঁটে বিচিত্র হাসি ফুটল। কোমল স্বরে বললেন,—তার পর আমি তোমাকে ফেরত নিয়ে আসতে পারি।

—সত্যি আনবেন?

—আনতেই হবে। তোমার দায়িত্ব যখন আমার...

আশ্চর্য নারীর মন! কথাটা শুনেই কোথ্‌থেকে যেন আশার দীপ্তি জ্বলে উঠল বুকে। কে এক কুহকিনী কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, কাঙ্খিত পুরুষকে বিপদে সাহায্য করা নারীর ধর্ম। ঘেন্নাপিত্তি ভুলে, চোখ কান বুজে ক'টা দিন কাটিয়ে দে, তারপর তো গালব তোরই।

ধন্য আশা কুহকিনী। ধন্য পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ!

আবার শুরু হল আমাদের যাত্রা। নদী পাহাড় অরণ্য জনপথ পার হয়ে পৌঁছলাম অযোধ্যায়।

রাজা হর্যশ্বের সভায় আমাকে নিয়ে গেলেন গালব। প্রস্তাবটি রাখলেন রাজার কাছে।

হর্যশ্ব আমাকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন। যেমন ভাবে কোনও বিক্রয়যোগ্য পশুকে দেখে কোনও বণিক, অনেকটা তেমনই ভাবে। মুখে হাসি ফুটল,—নাঃ, বলতেই হয় এ মেয়ে ভারী সুলক্ষণা। মনে হচ্ছে আমি যা চাই, এ তা আমায় দিতে পারবে।...কিন্তু আপনার শুল্ক তো আমি পুরোপুরি মেটাতে পারব না মুনিবর। ও রকম ঘোড়া আমার আছে বটে, তবে মাত্র দুশো। এতে কি আপনার চলবে?

এ যে রীতিমত দরাদরি! আমার গা ঘিনঘিন করে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তবু দাঁড়িয়ে আছি। শুধু গালবের মুখ চেয়ে।

গালবের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। আমার কথা ভেবে নয়, অন্য চিন্তায়। একান্তে ডাকলেন আমাকে। অস্থির স্বরে বলে উঠলেন,—এখন আমার কী হবে যযাতির মেয়ে? গুরুদক্ষিণা মেটাতে না পারলে আমি যে পাতকী হব! ইহলোকেও সুখ পাব না, মরার পরেও স্বর্গলাভের কোনও আশা থাকবে না! নাঃ তোমাকে দিয়ে আমার কোনও কাজই হল না। আমার সারা জীবনের শ্রম তপস্যা সব নিষ্ফল হয়ে গেল।

কথাক'টি তীরের মত আমার মর্মমূল ভেদ করল। ক্ষণিকের জন্য পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয়ে বিন্দু বিন্দু মায়া জমছিল। ওই মানুষটির জন্য। হাতের কাছে রমনীরত্ন থাকা সত্ত্বেও কী অসহায়! ইহলোক আর পরলোকের ভাবনায় কী কাতর!

মনোকষ্ট চেপে রেখে বলেই ফেললাম,—এর তো সহজ সমাধান আছে ঋষি। আপনি দুশো ঘোড়ার বদলেই এঁর কাছে আমাকে রেখে যান। ছেলে হতে তো

বছর খানেক সময় লাগবেই, এর মধ্যে আপনি খোঁজ খবর করুন আর কোন্ কোন্ রাজার কাছে এমন ঘোড়া পাওয়া যায়। ভাড়া খাটাই যখন আমার মত মেয়েমানুষের নিয়তি, তখন নয় আরও ক'টা রাজার সঙ্গে শোব। আপনারও প্রাপ্য ঘোড়া মিলে যাবে।

প্রস্তাবটায় শ্লেষ ছিল আমার। ভেবেছিলাম বিদ্রূপের অভিঘাতে আহত হবেন ঋষি, হাঁ হাঁ করে উঠবেন। শুনেছিলাম সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে সঙ্গী নাকি বন্ধু হয়। সে যদি জঙ্গলের পশু হয়, তবুও। ঋষি গালবের সঙ্গে এই ক'দিনে লক্ষ পা হেঁটেছি আমি, এক কণা দুর্বলতাও কি আমার জন্য জমে নি তাঁর মনে? বন্ধুর মনোবেদনা বুঝতে পারবেন না, ঋষি কি এতই প্রজ্ঞাহীন?

নাঃ, গালবের মুখে যন্ত্রণার চিহ্নমাত্র নেই। বরং উদ্ভাসিত হয়েছেন। পরক্ষণেই ম্লান আবার। কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন,—উপায়টা মন্দ বলো নি। তবে এতেও সমস্যা আছে।

—আছে বুঝি?

—নেই? গালবের বিস্ময় যেন বাঁধ মানল না,—তুমি তো রাজবংশের মেয়ে, জান না, রাজারা কুমারী মেয়ে পছন্দ করেন? এক রাজার সঙ্গে বছরভর কাটানোর পর অন্য কোন রাজা তোমায় নেবেন?

ধন্য পুরুষ। ভাড়া খাটার মেয়েছেলেও চাই, টাটকা কুমারীও চাই! একই অঙ্গে!

সামান্য ছলনার আশ্রয় নিলাম এবার। হেসে বললাম,—এই কথা? এ তো কোনও সমস্যাই নয়। অতি শৈশবে এক ব্রহ্মবাদী ঋষিকে আমি সেবায় তুষ্ট করেছিলাম। তিনি আমাকে একটা অদ্ভুত বর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রতিবার সন্তান প্রসবের পর তুমি আবার কুমারী হয়ে যাবে।

—যাহ্, এমন আবার হয় নাকি?

—হয়। আপনাদের মত পুরুষরা বর দিলে সবই হয়। সবই তো আপনাদেরই ইচ্ছানির্ভর। চাওয়া নির্ভর।

মনে মনে বললাম, শত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও আপনি কী অজ্ঞ ঋষি! এত জানেন আর এটুকু বোঝেন না, শরীর তো দূরের কথা, হৃদয়ে একজনের জন্য প্রণয় জাগলেই নারী আর কুমারী থাকে না!

ঋষি গালব আনন্দের আতিশয্যে আমার হাত জড়িয়ে ধরেছেন,—তুমি আমায় বাঁচালে যযাতির মেয়ে। কী বলে যে তোমায় কৃতজ্ঞতা জানাব?

—থাক। শুধু কথা দিন আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়ে গেলে আমাকে আপনি...

—সে আর বলতে। আমি কি বুঝি না এমন ভাবে জীবন কাটাতে মেয়েদের কত কষ্ট হয়!

গালব চলে গেলেন। আমার ঠাঁই হল রাজা হর্যশ্বের অন্তপুরে।

শুরু হল আমার নদীর জীবন। বয়ে চলেছি, বয়েই চলেছি।

দিন যায়। কী ভাবে যে যায় সে শুধু আমিই জানি। একে একে তিন রাজার শয্যাসঙ্গিনী হলাম আমি। হর্যশ্বের পরে কাশীরাজ দিবোদাস, তারপর ভোজরাজ উশীনর। এঁরা প্রত্যেকেই মহৎ, কিন্তু পৃথক ধরনের মানুষ। হর্যশ্বের দানধ্যানের সুনাম আছে, দিবোদাস বীর, উশীনর সত্যের পূজারী। শুধু একটি বিষয়েই তিনজনের ভীষণ মিল। মাত্র দুশোটি ঘোড়ার বিনিময়ে একটি নারীকে ভোগ করতে কারও মনে এতটুকু দ্বিধা নেই। কে জানে, হয়তো এর মধ্যেও ধর্মের কোনও গূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে!

সে যাই হোক, এঁদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে। প্রকৃতির নিয়মে এঁদের প্রত্যেকের গৃহেই আমি গর্ভবতী হয়েছি, তিনজনকেই উপহার দিয়েছি একটি করে পুত্র। হর্যশ্বের ঘরে বসুমনা, দিবোদাসের প্রাসাদে প্রতর্দন, উশীনরের রাজপুরীতে শিবি। প্রতিটি জন্মের সংবাদই যথাসময়ে পৌঁছেছে আমার বাবার কানে। আশ্চর্য, তিনিও দৌহিত্র লাভ করে নাকি মোহিত!

তিন সন্তানকেই দুধ-মা'র কাছে ছেড়ে রেখে এসেছি আমি। প্রথম বার যখন অযোধ্যা থেকে গালব আমায় নিতে এলেন, বসুমনার জন্য আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। অতটুকু দুধের শিশু ফেলে কোন্ প্রাণে যাই! হর্যশ্বকে বললাম, ছেলে এখন আমার কাছে থাক। একটু বড় হলে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। তিনি সম্মত হলেন না। তাঁর ছেলে অন্যের ঘরে প্রতিপালিত হবে? অসম্ভব। পশুপাখির জগতে শিশু মায়ের, মানুষের জগতে নয়।

আমার বুকের দুধ যন্ত্রণার পুঁজ হয়ে জমে গেল। শুকিয়ে মরে গেল। তিন তিন বার।

উশীনরের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গালবকে বললাম,—এখনও তো আপনার দুশো ঘোড়া সংগ্রহ বাকি। এবার কোথায়?

গালবকে সেদিন একটু যেন বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। হতাশ স্বরে বললেন,

—আমার চেষ্টা বোধহয় সফল হল না। সমস্ত শ্রম আমার ব্যর্থ হয়ে গেল।

গালবের শ্রম! হাসি পেল। তবু প্রশ্ন করলম,—কেন? কী হল?

—মহা সমস্যায় পড়ে গেছি। কালই গরুড় আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি এক নতুন সংবাদ দিয়ে গেলেন।...এই যে সব দুর্লভ অশ্ব, এ সবই নাকি আগে মহর্ষি ঋচিকের ছিল। তিনি এদের পেয়েছিলেন বরুণালয়ে। তাঁর কন্যা সত্যবতীর বিয়ের সময়ে মহর্ষি ঋচিক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এরকম এক হাজারটি ঘোড়া

যৌতুক দিয়েছিলেন। মহারাজ গাধি ঘোড়াগুলোকে নিজের কাছে রাখেননি, সবই তিনি ব্রাহ্মণদের দান করে দেন। সেই ব্রাহ্মণরা যখন ঘোড়া নিয়ে ফিরছিলেন তখন হর্যশ্ব দিবোদাস আর উশীনর তাঁদের কাছ থেকে দুশোটি করে ঘোড়া কিনে নিয়েছিলেন। বাকি চারশো পথে চুরি হয়ে যায়। অর্থাৎ এরকম ঘোড়া আর আমার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। গরুড় অবশ্য বলছিলেন তুমি এই ছ'শো ঘোড়াই গুরুদেব বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দিয়ে দাও। তোমার অসুবিধের কথা খুলে বললে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন।

পলকের জন্য অন্তরে যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। উজ্জ্বল মুখে বললাম,

—বিষ্ণুসখা গরুড় যা বলছেন তাই করুন তবে।

—তা কি হয় যযাতির মেয়ে? গুরুদক্ষিণা পুরো না দিলে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় কী করে? বলতে বলতে অপাঙ্গে আমার দিকে তাকালেন,—একটা বুদ্ধি অবশ্য মাথায় এসেছে, জানি না তাতে লাভ হবে কিনা।

—কী? আমার গলা কেঁপে গেল।

—যদি অবশিষ্ট ঘোড়ার বদলে গুরুদেব তোমায় রাখেন...না না, এ বোধহয় হয় না। গুরুদেব হয়তো এতে আহত হতে পারেন। তিনি তো ঘোড়াই চেয়েছেন, স্ত্রীলোকে কি তিনি সন্তুষ্ট হবেন?

তিন রাজর্ষির শয্যা আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছে। মনে মনে বললাম, খুব হবেন। ঋষি হলেও তিনি পুরুষ তো বটে।

গালব আমার হাত ধরলেন,—আরেক বার আমার জন্য কষ্ট করবে যযাতির মেয়ে? এই শেষ বার?

চোখে জল এসে গেল। সামলে নিয়ে বললাম,—চলুন।

—তবে তাই চলো। যদি তিনি করুণাপরবশ হয়ে...

নির্দয় পুরুষ অপরের করুণা চায়! সে করুণার প্রকৃতিই বা কীরকম? না ঘোড়ার বদলে সুন্দরী ভোগ করে অপর জনটি তৃপ্ত হবেন কি হবেন না!

আমার ধারণাই মিলে গেল। এক ঝলক আমাকে দেখামাত্রই ঋষি বিশ্বামিত্রের কামজ্বর এসে গেল। গদগদ গলায় বললেন,—তুই কী আহাম্মক রে গালব! এমন একটা মেয়েছেলে তোর হাতে আছে, অথচ তাকে আগে আমার কাছে আনিস্‌নি! থাকি তো বনে বাদাড়ে, ঘোড়া আমার কী কম্মে লাগবে? নেহাত গুরুদক্ষিণা দেব, গুরুদক্ষিণা দেব বলে বায়না জুড়েছিলি, তাই তোকে পরীক্ষা করার জন্যে...। এহেহেহে, এই কটা বছর মেয়েটাকে পেলে...যাক গে যাক, এখনই বা মন্দ কী!

ব্যস্‌। এবার আর রাজপ্রাসাদ নয়, মুনির তপোবন। এবারও সেই একই পরিণতি।

তিন রাজার মতো আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে একসা করলেন ঋষিবর। ফলত আরেকটি ছেলে। অষ্টক। ছেলে জন্মাতেই ঋষির কামজ্বর উধাও। বুঝি বা পরমব্রহ্মের কথা মনে পড়ে গেল। তুচ্ছ মানবীতে কতদিন আর আটকে থাকতে পারেন সাধুসন্ন্যাসীরা!

আবার গালবের কাছে প্রত্যাবর্তন। এতদিনে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে আমার। মনেরও, শরীরেও। বড় ক্লান্ত বোধ করি, বড় অবসন্ন। নাঃ, গালবকে দেখে হৃদয়ে এখন আর এতটুকু চাঞ্চল্য জাগে না। প্রণয়ের ক্ষুধা মরে গেছে, প্রথম প্রেম এখন দূরের স্মৃতি। তবু মনে একটা ক্ষীণ স্বস্তি, যাক আর ভেসে বেড়াতে হবে না। রাজকন্যা হই আর যাই হই, মেয়েদের যে কোনও আলাদা সত্তা থাকতে নেই এ আমি হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছি। আমাদের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে কী? এখন বাকি জীবনটা গালবের সঙ্গে চোখ কান বুজে কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি।

গালবের পিছু পিছু হাঁটছি আবার। নদী গিরি প্রান্তর অরণ্য লোকালয় পার হয়ে হাঁটছি তো হাঁটছি। এক দুপুরে এক স্রোতস্বিনী পার হলাম আমরা। তিলেক বিশ্রামের জন্য বসেছি এক শিংশপা গাছের নীচে। জায়গাটা ভারী চেনা চেনা। এখানেই প্রথম দিন আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম না? হ্যাঁ তো।

গালবও বুঝি চিনেছেন জায়গাটাকে। ঘুরে ঘুরে দেখছেন চার দিক। নদীকেও। চৈত্রবাতাসে ঘূর্ণি উঠছে ছোট ছোট। কোথ্‌থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠল। ডাকছে, ডেকেই চলেছে।

নির্বাক মানুষটা হঠাৎ সবাক হলেন,—কী ভাবো যযাতির মেয়ে?

ঘাড় নাড়লাম,—কিছু না।

গাম্ভীর্য সরে মৃদু হাসি উঁকি দিল,—ক'টা বছর তোমার ওপর দিয়ে খুব ঝড় বয়ে গেল, তাই না?

অর্থহীন কথা। উত্তর দিলাম না।

—তোমার এই আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না, দেখো। তোমার চার সন্তানেরই নাম ত্রিভুবনে ছড়িয়ে পড়বে। বসুমনা হবে দাতা, প্রতর্দন হবে বীর, শিবি ধার্মিক হবে, আর আমার গুরুর সন্তান অষ্টক হবে যজ্ঞকারী। কী, খুশি?

পলকের জন্য চারটে কচি কচি মুখ বুকে ভেসে উঠেছে। কেমন আছে ছেলেগুলো? কী করছে? মাকে কি খোঁজে তারা? মার জন্য কাঁদে? নাকি ভুলেই গেছে এই অভাগিনী মাকে? বুকফাটা কষ্টের মধ্যেও হাসি পেল সহসা। গালব আশীর্বাদ করছেন আমার ছেলেদের, আমাকে নয়! মেয়েদের এতটুকু গৌরব দিতেও এত কার্পণ্য? হায় রে পুরুষ!

নীরস স্বরে বললাম,—আমার খুশিতে কী দরকার? আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট।

কোকিলের ডাক আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে। গালব কাছে সরে এলেন, একদম পাশটিতে। কাঁধে হাত রেখেছেন, পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন আমাকে। এক সময়ে ওই স্পর্শের জন্য উন্মুখ ছিল হৃদয়, কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনও রোমাঞ্চ অনুভব করলাম না। অথচ ওই দৃষ্টি আমার চেনা। ওই স্পর্শের ভাষাও।

শুকনো গলায় বললাম,—সংযত হোন ঋষি।

—কেন?

—এখানে নয়। এভাবে নয়।

—কেন, এই জায়গাটা কী দোষ করল? গালব সবলে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন আমাকে। কানে কানে ফিসফিস করে বললেন,—এ তো অতি মনোরম স্থান। নদী গাছ প্রকৃতি...তুমি আর আমি...মনে নেই এখানেই একদিন তুমি আমার সেবা করতে চেয়েছিলে? আজ তোমার জীবনে সেই সৌভাগ্য এসেছে। শুভলগ্ন বয়ে যেতে দিও না।

হঠাৎ কেমন গা গুলিয়ে উঠল। এত বিবমিষা আগে কখনও জাগে নি। তিন রাজার সঙ্গে শুয়েও নয়, বিশ্বামিত্রের অঙ্কশায়িনী হয়েও নয়।

রূঢ় ভাবে বললাম,—এত তাড়াহুড়োর কী আছে? আর তো কারও কাছে আমাকে পাঠানোর নেই! চলুন, আপনার আশ্রমে যাই, সেখানে নয় সারা জীবন ধরে আমাকে যত খুশি...

—সারা জীবন ধরে? আমার আশ্রমে? তোমাকে নিয়ে? গালব ছিটকে সরে গেলেন,—তুমি কি জানো না, তোমাকে আশ্রমে আর নিয়ে যাওয়া যায় না? আশ্রম অতি পবিত্র স্থান, অন্যপূর্বা নারীকে নিয়ে সেখানে বাস করাটা অধর্ম। আমি কোনও ভাবেই তোমাকে আমার সহধর্মিণী করতে পারি না।

পলকের জন্য স্তম্ভিত আমি, পলকেই স্থিত আবার।

বাঃ বাঃ, এই তো যোগ্য উত্তর। এরকমটাই তো আশা করা উচিত ছিল।

তবু কেমন জেদ চেপে গেল। বললাম,—আমি অন্যপূর্বা নই। সন্তান প্রসব করা হয়ে গেছে, এখন আমি আবার কুমারী।

—তুমি কুমারী! গালব অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, ওসব গালগল্প তুমি আমাকেও বিশ্বাস করতে বলো?

রাগে হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেল। চিৎকার করে উঠলাম,—যদি জানেনই গালগল্প, একের পর এক পুরুষের কাছে আমায় কুমারী সাজিয়ে পাঠালেন কী বলে? এতে অধর্ম হয় নি?

—তুমি নেহাতই বোকা যযাতির মেয়ে। এও বোঝো না, মহৎ কারণে ছোটখাটো ছলনার আশ্রয় নিলে কোনও পাপ হয় না। গালব আবার আমায় আলিঙ্গন করলেন, বাজে তর্ক কোরো না। এসো আমরা মিলিত হই। চিন্তা নেই, তোমার বাবার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—কক্ষনও না। আপনি ছোঁবেন না আমাকে। সরে যান।

না, এর পর গালব আর আমাকে ছোঁন নি। বোধহয় তাঁর মনে লেগেছিল। বাবার হাতে নামহীন যযাতির মেয়েকে তুলে দিয়ে চিরতরে বিদায় নিলেন ঋষি গালব।

এখানেই আমার কাহিনী শেষ হয়ে যেতে পারত। বাদবাকি জীবন রাজা যযাতির অন্তঃপুরেই, সুখে না হোক, শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারতাম। রাজকন্যাদের তো আর পেটের ভাতের অভাব হয় না।

কিন্তু বিধি বাম। মহাপুণ্যবান রাজা যযাতি দু'বেলা কানের কাছে এসে হুশহাশ নিশ্বাস ফেলেন, ঘরে অবিবাহিতা মেয়ে রয়েছে বলে তাঁর নাকি রাতে ঘুম হয় না! আরও দুঃখ, মেয়েটা পতিহীন থাকলে মরার পরে স্বর্গে তার নাকি ঠাঁই হবে না! অতএব মেয়েকে পাত্রস্থ করতেই হবে। ওদিকে মনে আবার সঙ্কোচও আছে, চারটে বাচ্চা হওয়া মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে অন্য রাজারা হাসাহাসি না করে!

অনেক ভেবেচিন্তে পাঁচ ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন রাজা। শেষ পর্যন্ত নিজেরা নিজেরা একটা উপায়ও বার করে ফেললেন। আমাকে ডেকে হুকুম জারি করা হল, প্রস্তুত হও। তোমার স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করা হয়েছে।

আঁতকে উঠে আপত্তি জানাতে গেলাম, কেউ কর্ণপাত করল না। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগতীর্থে নাকি সভা ডাকা হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে। তা রাজপ্রাসাদ থাকতে ওখানে কেন? না প্রয়াগতীর্থ অতি পুণ্যস্থান, ওখানে স্বয়ম্বরা হলে আমার দোষ কেটে যাবে। বাবা যেটা মুখে বললেন না সেটা হল, দোজবর হোক, তেজবর হোক, একটা বোকাসোকা ভালমানুষ রাজা কপালে জুটে গেলে এবারকার জীবনটা আমার তরে গেল।

আজ সেই শুভদিন। প্রয়াগতীর্থের এক আশ্রমে আনা হয়েছে আমাকে। এখানেই বসছে স্বয়ম্বরা সভা। বাবা নিজে আসেন নি, রাজকাজে ব্যস্ত। হতেও পারে, নাও হতে পারে, সত্যি মিথ্যে আমি জানি না। আয়োজনে অবশ্য কোনও ত্রুটি নেই।

আমার দুই দাদা যদু আর পুরু নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে আশ্রম সাজিয়েছে, রাজকীয় মঞ্চ বানিয়েছে, ফুলে গন্ধে আমোদিত হয়ে আছে দশ দিক। লোকলস্কর সেপাই সান্ত্রী ছুটে বেড়াচ্ছে অবিরাম, আগত রাজাদের আপ্যায়নে যেন কোনও ফাঁক না থাকে।

অবাক কাণ্ড! চার ছেলের মাকে বিয়ে করতে রাজাও কিছু এসেছেন বটে। এমনকি নাগ যক্ষ গন্ধর্বরাও উপস্থিত। এত লোক আমাকে পেতে আগ্রহী? কেন? রাজার মেয়ে বলে? নাকি পুত্রদায়িনী সুলক্ষণা মেয়েমানুষ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছি তাই?

একটু আগে সখীরা আমায় বধূসাজে সাজিয়ে দিল। ঋষিকন্যারা বরমালা গেঁথে ধরিয়ে দিয়েছে হাতে, এবার সভায় গিয়ে পছন্দসই কাউকে পরাতে হবে সে মালা।

কাকে পরাব এই মালা? কোন হর্যশ্ব দিবোদাস উশীনর অথবা বিশ্বামিত্রকে? অথবা কোন গালবকে? এদের একজনকেও না বাছার স্বাধীনতা আজ আমার আছে, কিন্তু তার পর? বাবার কাছে থাকা, সেও তো এক পুরুষের আশ্রয়েই থাকা। বাবা মারা গেলে ভাইদের আশ্রয়, তারাও তো পুরুষ। অপেক্ষা করব ছেলেরা কবে বড় হয়ে মাকে নিয়ে যাবে? হায়, ততদিনে তারাও তো এক একটা আস্ত পুরুষমানুষ হয়ে যাবে!

কোনও পথ নেই? কোনও পথ নেই?

জঙ্গলে চলে যাব? বাঘ ভাল্লুক শিয়াল কুকুরদের জগত কি মানুষের সমাজের চেয়ে হীন কিছু হবে?

ভাবছি আমি। ভাবছি, ভাবছি...

মালা আমার হাতেই শুকিয়ে গেল।

উনসত্তর আর তেষট্টি

হানিমুনে চলেছেন তপোধীর আর করুণা। ট্রেন ছাড়তে এখনও মিনিট দশেক বাকি, শেষ বারের মতো মালগুলো গুনে নিচ্ছেন তপোধীর। সুটকেস এক, প্লাসটিকের থলি দুই, বালতিব্যাগ এক, ঢাউস কিটব্যাগ এক, কাঁধঝোলা ব্যাগ এক, টিফিন ক্যারিয়ার এক, ওয়াটারবটল্ এক। ওহো, ছোট বেডিংটাও তো আছে, ট্রেনের জন্য। মোট তবে হল গিয়ে নয়। সঙ্গের গন্ধমাদনটিকে ধরলে অবশ্য হয় দশ। হাঁটতে চলতে দিশা পায় না, ধপাধপ যেখানে সেখানে বসে পড়ে, কোথাও একবার দাঁড়িয়ে পড়লে নড়ায় কার সাধ্যি, এমন মেয়েমানুষ গন্ধমাদন ছাড়া আর কী! জানালার ধারে কেমন ঘটটি হয়ে বসে পড়েছে দ্যাখো! সাংসারিক নির্দেশ দেওয়া চলছে পুত্রবধূকে!

তপোধীর অধৈর্যভাবে বললেন,—পা'টা একটু তোলো তো। সুটকেসটা ভেতরে ঠেলি।

একগাল জরদা পান মুখে অবহেলা ভরে তাকালেন করুণা,—তাড়া কোরো না তো। সব হবে। রণ্টু সব ঠিক করে দেবে।

—আমার তাড়া আছে। পা সরাও।

—আহ্, চুপ করে একটু বোসো তো। কাজের কথা সেরে নিতে দাও।

কাজের কথা না, গুষ্টির পিণ্ডি। তপোধীর উবু হয়ে বসে পড়লেন। ঠেলে ঠেলে বালতি ব্যাগ ঢোকাচ্ছেন বার্থের নীচে। সাত দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া, তার জন্য মালও কিছু নিয়েছেন বটে করুণা! নিয়েই দায় শেষ। এখন ম্যাও সামলাবে এই বুড়ো চাকর। তপোধীর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এবার টানলেন সুটকেসটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে রণ্টু,—ওটা ওখানে থাক বাবা। মা পা রাখবে।

—তারপর রাতে কেউ নিয়ে নেমে গেলে কী হবে? তোমার মার ঘুম ভাঙবে?

—ব্যস্ত হতে হবে না। চেন দিয়ে বেঁধে দিচ্ছি। চাবিটা শুধু কাছে ঠিক করে রাখো, হারিয়ো না, তা হলেই হবে।

তপোধীর সোজা হলেন অগত্যা। গিন্নির কাছে হেরে যাওয়া মুখে বসেছেন এক কোণে। মরুক গে যাক, যে যা খুশি করুক। এখন তিনি এদের হাতের পুতুল। যেমন ইচ্ছে নাচাচ্ছে। কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে দুখানা টিকিট এনে হাতে ধরিয়ে দিল! তোমাদের দুজনের তো এক সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয় না বাবা, যাও একবার জোড়ে সমুদ্র ঘুরে এসো! আর এই রইল হোটেলের রিজার্ভেশন, সাত দিনে একটু চাঙ্গা হয়ে এসো তো দেখি। প্ল্যানটা অবশ্য রণ্টুর একার নয়, এর পিছনে মেয়ে জামাইয়েরও ষড়যন্ত্র আছে। ভালমানুষ মুখ রণ্টুর বউটিও কম যায় না। আর ওই যে রিণ্টির মেয়ে বাবলি, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চুকুর চুকুর করে কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাচ্ছে, সে বেটিরও সেদিন কী উল্লাস! ইইহ্, কী থ্রিলিং! দাদু দিদা হানিমুনে যাচ্ছে! ভূ-ভারতে কেউ শুনেছে বাবা মার বিবাহবার্ষিকীর দিন এই সব মতলব ভাঁজে ছেলেমেয়েরা! ট্রেনের টিকিট, হোটেলের বুকিং উপহার দিয়ে বাবা মার বিয়ের চল্লিশ বছর পালন করে! ফাজলামি!

কামরার জানলায় অরুণাংশু। জামাই। ছেলেরই সমবয়সী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ক্লাসমেট ছিল, তখনই রিণ্টিকে গেঁথেছে। হাইপাওয়ারের চশমার আড়ালে ছোকরার চোখ হাসছে ফিক ফিক,—বাবা, চা খাবেন?

তপোধীরের তেমন কোনও নেশা নেই, তবু চায়ের নাম শুনলেই জিভ যেন একটু শুলিয়ে ওঠে। বললেন,—লিকার চা হবে?

রণ্টুর বউ ফুট কাটল,—এখানে লিকার চা কোথায় পাবেন বাবা?

—থাক তা হলে। দুধ চা আমার...। তোমার শাশুড়িকে দাও বরং।

—আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিয়েছি। নেশার জিনিস বলে কথা। সন্তর্পণে পিক ফেললেন করুণা,—ট্রেন ছাড়লে একটু কফি খাব।

ধন্যি মেয়েমানুষ! কত যে নেশা! চা কফি পান জরদা মৌরি সুপুরি জোয়ান...। দাঁত মাজার সময়ে আবার গুড়াখু চাই। সুযোগ পেলে বোধহয় বিড়ি সিগারেট নস্যিটাও ধরে ফেলতেন!

সিগন্যাল হয়ে গেছে। বউয়ের ইশারায় রণ্টু নেমে গেল কামরা থেকে। সামনের স্টল থেকে ম্যাগাজিন হাতে দৌড়ে এল রিণ্টি। তপোধীরের হাতে পৌঁছনোর আগে করুণা খপ্ করে নিয়ে নিলেন পত্রিকাটি। এক গাল হাসিতে মুখ ভরে গেল,—ওমা, এ যে দেখি শচিনের ছবি।

তপোধীর সরু চোখে তাকালেন,—তুমি আবার শচিনকে কবে থেকে চিনলে?

—আমি সব্বাইকে চিনি। শচীন আজার মোঙ্গিয়া শ্রীনাথ...তারপর আমাদের ওই ছেলেটা...সৌরভ গো। আহা, কী মিষ্টি মুখখানা।

—এই করেই তো দেশের ক্রিকেটটা ডুবল। যত মুর্খের দল এখন খেলার সমঝদার হয়েছে। তপোধীর ভেংচে উঠলেন,—আহা, কী মিষ্টি মুখখানা! হ্যাহ্।

—অ্যাই, মুর্খ মুর্খ করবে না তো। মেয়েরা কি খেলা বোঝে না? গালি থার্ডম্যান মিডঅন মিডঅফ সব নাম আমি জানি। এই তো সেদিন রাহুল স্লিপে কী সুন্দর একটা ক্যাচ ধরল...

—থাক, নাতি নাতনির মুখের ঝাল খেয়ে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না।

ট্রেন দুলে উঠল। রিণ্টি জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে ছুঁল মাকে,—সাবধানে যেও। দুজনে যেন সারাক্ষণ লড়াই কোরো না।

—আমাকে বলছিস কেন? তোর বাবাকে বলে দে।

—বাবা, তুমি কিন্তু একদম মাথা গরম করবে না।

তপোধীর জবাব দিলেন না। প্ল্যাটফর্ম সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সরে যাচ্ছে কোলাহল। সরে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে পুত্রবধূ জামাই নাতনি। হাত নাড়ছে। রণ্টুর গলা উড়ে এল,—কেসটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেল রে। পুরীর সি-বিচে না দুটো লাশ পড়ে থাকে! স্কন্ধ কাটা!

তপোধীর গুম হয়ে গেলেন। সবই যখন জানা, তখন জোর করে পাঠানোর কী দরকার ছিল? কেন যে টিকিট দুটো কুচিয়ে ফেলেননি তপোধীর!

ট্রেন কারশেড পেরোল, এগোচ্ছে ঘটাং ঘটাং। এখনও শহরের আলো ঘিরে আছে ট্রেনটাকে। তপোধীরের কুপের মাঝবয়সী লোকটি লুঙ্গি তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে এগোল। সামনের তিন যুবক, সম্ভবত সেলসে চাকরি করে, উচ্চৈস্বরে গল্প জুড়েছে। উল্টোদিকের দুই জানালায় দুই ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনী ভাবলেশহীন মুখে বাইরে তাকিয়ে। সব প্যাসেঞ্জার এখনও থিতু হয়নি, অনেকেই ঘুরছে এদিক ওদিক। পাশের কুপে দুটো বাচ্চা কাঁউমাউ করে ঝগড়া করছে। যে দঙ্গলটা একটু আগেও এ জায়গাটা বোঝাই করে রেখেছিল, বোধহয় তাদেরই কেউ। অসহ্য।

করুণা হাতের ম্যাগাজিন তপোধীরের কোলে ফেলে দিলেন। ছোট্ট একটা হাই তুলে বললেন, সকালে কটায় ঠিক আমরা পৌঁছব গো?

তপোধীর বিরক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন,—আমি ট্রেনের টাইম টেবিল নই। বলতে পারব না।

—সে তো জানিই। তুমি হলে গিয়ে খাওয়ার টাইম টেবিল। সাড়ে সাতটায় এই চাই, নটায় এই চাই, সওয়া বারোটায় এই চাই...

—দাও কেন? না দিলেই পারো।

—ওখানে গিয়ে দেব না। তোমার ওই পৌনে চারটের মুসুম্বি, সওয়া পাঁচটার ছানা, ওসব তুমি নিজে জোগাড় করবে।

—ভয় দেখাচ্ছ?

—না, বলে দিচ্ছি। বেড়াতে গিয়ে আমাকে দিয়ে খিদমত খাটাবে, ওটি হবে না।

—তা হলে করবে কী সারা দিন? ভোঁস ভোঁস নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে?

—মোটেই না। ঘুরব, ফিরব, সকাল বিকেল প্রাণ ভরে জগন্নাথদেবকে দর্শন করব। ছেলেমেয়ের দয়ায় সুযোগটা যখন এসেই গেল...

একেই বলে নেমকহারাম। বিয়ের সময়ে ক'টাকাই বা মাইনে ছিল তপোধীরের যে বছর বছর বউকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন! করতেন তো কলেজের মাস্টারি, সাকুল্যে পেতেন দেড়শো টাকা, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যেত। তারপর যখন মাইনে টাইনে বাড়ল, তখন ছেলে মেয়ের পড়াশুনো নিয়ে হিমশিম দশা। তার মধ্যেও কি বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বেরোননি দু-চারবার? এই পুরীতেই তো গিয়েছিলেন। বছর কুড়ি আগে। কপাল খারাপ, পৌঁছেই রিণ্টির ধুম জ্বর। কোথাও বেরনো হল না, সমুদ্রে নামা হল না, শুধু হোটেল আর ডাক্তারখানা। তাও মেয়ের জ্বর কমার পর একদিন সবাইকে নিয়ে কন্ডাক্টেড টুরে বেরিয়েছিলেন তপোধীর। কোনারক, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন। ফেরার দিন সকালে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়াও হয়েছিল করুণার। সে সব কথা কি করুণা ভুলে গেছেন!

তপোধীরের ঈষৎ অভিমান হল। ভার গলায় বললেন,—হ্যাঁ, ছেলেমেয়েই তো তোমার ঘোরাচ্ছে জীবনভর।

—ঘোরাচ্ছেই তো। মেয়েজামাই নিয়ে গেল বলে তবু কেদার-বদরি দর্শন হল। ছেলের কল্যাণে তিরুপতি-কন্যাকুমারিকা।

—তার আগে তো জীবনভর তুমি ঘরেই বন্দি থেকেছ!

—ছিলামই তো। ধম্মের মধ্যে কম্মো, একবার পুরী, একবার দার্জিলিং আর একবার সিমলা। তারপর থেকে তো শুধু ঘাটশিলা আর শিমুলতলা, শিমুলতলা আর ঘাটশিলা।

—তুমি একটি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী। রিটায়ারমেন্টের আগে এই পুরী যাওয়ার জন্য তোমাকে দুবার সেধেছিলাম আমি। টোয়াইস্। মনে পড়ে?

—হবে হয়তো। করুণা অবলীলায় এক টিপ জরদা ছুড়লেন মুখে,—আমার শুধু মনে পড়ে তোমার সঙ্গে একবার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে আমার খুব শিক্ষা হয়েছিল। গরুর মতো হেট হেট করতে করতে মন্দিরে ঢোকালে, আর পাঁচন বাড়ি দিতে দিতে বার করলে।

—সে তো ফেরার ট্রেনের তাড়া ছিল বলে। চটপট বলে উঠলেন তপোধীর।

—ট্রেন কিন্তু ছিল সন্ধেবেলা।

তপোধীর অপ্রতিভ মুখে হাসলেন একটু,—সেই কথা এখনও মনে পুষে রেখেছ!

করুণার গাল ফুলল,—আমার সব মনে থাকে। কিছু ভুলি না।

তপোধীর চুপ মেরে গেলেন। আড়চোখে একবার সহযাত্রীদের দেখলেন, একবার স্ত্রীকে। ওই গোলগাল ফরসা মুখ, পুতুল পুতুল চোখের মহিলাটিকে চল্লিশ বছরেও ঠিক চেনা গেল না। কত দরকারি কথা অনায়াসে ভুলে যায়, অথচ বিশ বছর আগের তুচ্ছ স্মৃতিও যত্ন করে সাজিয়ে রাখে মনে। কেন যে এমন হয়!

শহরতলি পার হয়ে ট্রেনের গতি বেড়েছে। দুদিকে এখন জমজমাট অন্ধকার, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আলোর ফুটকি। মাঝবয়সী লোকটি লুঙ্গি শোভিত উঠে পড়েছে উপরের বার্থে, এখন শোওয়ার তোড়জোড় করছে। দুই সন্ন্যাসিনীও শোওয়ার সিট জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে, মুখোমুখি বসে কথা বলছে। তিন যুবকের একজন তপোধীরের পাশে এসে বসল, হাঁটুতে ব্রিফকেস রেখে তিন সঙ্গী তোড়জোড় করছে তাস খেলার। তপোধীর একটু সরে এলেন করুণার দিকে। শেষ ফাগুনের বাতাস হু হু ঢুকছে জানালা দিয়ে। ঠাণ্ডা হাওয়া, তবে কামড় নেই। ভারী নরম, মিঠে।

কফিওলা এসে গেল। হেঁকে হেঁকে কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছে। তপোধীর গলাতে চাইলেন করুণাকে,—কফি খাবে না?

করুণার চোখ জানালার বাইরে। ঘুরলেন। গুমগুমে স্বরে বললেন,—থাক।

—থাকবে কেন? খাও না। বলেই কফিওলার দিকে অর্ডার ছুড়েছেন তপোধীর,—দুটো কফি দাও দিকি। একটাতে দুধ একটু কম।

—দুধ তো আমাদের মেশানোই থাকে দাদু।

—ঠিক আছে, তবে তাই দাও।

—তুমি এখন কফি খাবে নাকি? করুণার ভুরু কপালে জড়ো,—তোমার না কফি খেলে রাত্তিরে ঘুম হয় না।

—একদিন কিছু হবে না।

—না। এর পর কাল সকাল থেকেই তো বুক জ্বালা অম্বল এসব শুরু হবে।

—সকালের ভাবনা সকালে। কাগজের গ্লাস করুণার দিকে এগিয়ে দিলেন তপোধীর। নিজেরটাও নিলেন। চুমুক দিচ্ছেন। একটু ঝুঁকলেন স্ত্রীর দিকে। যুবকদের কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় বললেন,—একটা রাত নয় নাই ঘুমোলাম।

—হঠাৎ এমন বদ খেয়াল?

—আমাদের তো আর আগে হানিমুন হয়নি। ছেলেমেয়েরা যখন পাঠালই, তখন নয় আজ রাত থেকেই...

—ন্যাকামো। সকালবেলা যদি বলো ঘুম হয়নি বলে পেটে গ্যাস হয়েছে, তখন কিন্তু আমি তোমার ধুধধুড়ি নেড়ে দেব।

কফির গ্লাস বাইরে হাওয়ায় ছুড়ে দিলেন তপোধীর। দুহাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন স্ত্রীকে,—আমার কাঁচকলা হবে। গিয়েই একটা এমন সমুদ্রে স্নান করব, শরীরটা তর হয়ে যাবে।

—সে কী! তুমি সমুদ্রে নামবে নাকি!

—তা হলে আর পুরী যাওয়া কিসের জন্য! আবার গলা নামালেন তপোধীর, —কেন, তুমি নামবে না?

—মরে গেলেও না। করুণাও ফিসফিস করছেন,—জলে নামলে কাপড়চোপড় ঠিক থাকে না...মনে নেই সেবার দিঘায় গিয়ে কী অবস্থা! বাবলি হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিল...

—ও, এই কথা। তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

—কী হবে?

—আমার সব খেয়াল থাকে। তোমার জন্য একটা এক্সট্রা আন্ডারওয়্যার এনেছি।

—আমি আন্ডারওয়্যার পরে সমুদ্রে নামব! বিস্ময়ে কথাগুলো ঠিকরে এল করুণার গলা থেকে,—তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?

তিন যুবক তাস খেলতে খেলতে টেরচা চোখে তাকাচ্ছে। মুখ টিপে হাসছেও যেন। তপোধীরের লোমঅলা বড় বড় কান লাল হয়ে গেল। মিনমিনে, কিন্তু মরিয়া স্বরে বললেন,—অসুবিধের কী আছে। শাড়ি সায়ার নীচে পরবে।

—ছিঃ।

—অতই যদি লজ্জা, তবে কারুর একটা সালোয়ার কামিজ আনলে না কেন?

—চুপ করো তো। পাগলের মতো কথা বোলো না। করুণা কাঁধের ওপর আঁচল গুছিয়ে নিলেন,—তোমাকেও জলে নামতে হবে না।

—কেন?

—প্রেশারের রুগি, সমুদ্রে নামবে কী?

—কালকেই আমি প্রেশার চেক করিয়ে এসেছি। ওষুধও আছে সঙ্গে।

—থাকুক। রণ্টু আমাকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে, বাবা যেন নুনজলে না নামে।

—বললেই হল। রণ্টু কি আমার গার্জেন? তপোধীরের গলায় ঝাঁঝ ফিরে এল।

—দেখাশুনো যখন করে, তখন গার্জেন তো বটে।

—এই করে করে তো ছেলেকে মাথায় তুলেছ। বাপকে আর কেয়ার করে না।

—অমান্যিটা কী করেছে?

—করেনি! ওইটুকু ছেলেকে পই পই করে হস্টেল পাঠাতে বারণ করলাম...। হস্টেলে না পাঠালে কি ছেলে মানুষ হয় না?

—তা ওদের ছেলে, ওরা যা খুশি তাই করেছে। তোমার কী?

—আমার শরীর নিয়েও আমি যা খুশি করব। জলে নামব।

—নেমে দেখো। আমি পরের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাব।

অসহায় ক্ষোভে দাঁত কিড়মিড় করলেন তপোধীর। করুণা সব পারেন। বপুতেই শুধু গন্ধমাদন নয়, তাঁর মতটিও নড়ানো বড় কঠিন কাজ। এক সময়ে, তখন রিন্টি কোলে, রণ্টু বছর চারেকের, খুব ব্রিজ খেলার নেশা হয়েছিল তপোধীরের। কলেজ থেকে চলে যেতেন তাসের আড্ডায়, ফিরতেন সেই সাড়ে দশটা এগারোটায়। করুণা খুব রাগারাগি করতেন, বাপের বাড়ি চলে যাবেন বলে ভয় দেখাতেন। তপোধীর আমল দেননি। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে দেখলেন ঘর শুনশান, ছেলেমেয়ে নিয়ে সত্যি সত্যি কোন্নগর চলে গেছেন করুণা। পাঁচ সাতদিন মাথা ঘামাননি তপোধীর, হাত পুড়িয়ে রেঁধে বেড়ে কলেজ করেছেন। তারপর এক সময়ে টনক নড়ল। কোন্নগরে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আরও বিপত্তি। করুণার এক গোঁ। ছেলেমেয়ের মাথায় হাত রেখে দিব্যি গালতে হবে আর কখনও তাস ছোঁবেন না তপোধীর, তবেই ফিরবেন করুণা। তপোধীরকেই হার মানতে হয়েছিল সেবার। সে নিয়ে অবশ্য এখন আর কোনও খেদ নেই তপোধীরের, তাস ছেড়ে ছেলেমেয়ের পিছনে সময় ব্যয় করা আখেরে ভালই ফল দিয়েছে। দুজনেই কৃতী হয়েছে লেখাপড়ায়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে বন্ধন আরও নিবিড় হয়েছে তপোধীরের। বাপ মাকে যথেষ্ট মান্যিগন্যিই করে ছেলে মেয়ে।

তবে এই মুহূর্তে সে কথা স্মরণে আনতে রাজি নন তপোধীর। গাল ঝুলিয়ে

বসে আছেন। প্রচণ্ড গতিতে একটা ছোট্ট ব্রিজ টপকে গেল ট্রেন। জানালার দিকে তাকালেন না তপোধীর।

করুণা হাঁটু চেপে উঠে দাঁড়ালেন। বাথরুমে যাচ্ছেন। দুই সন্ন্যাসিনীর মাঝে কোথ্থেকে এসে বসেছে এক দাড়িওলা সাধু, ঝালমুড়ি খাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। টিটিকে কাছে আসতে দেখে শুট করে উঠে দাঁড়াল, গেরুয়া সামলে কেটে পড়ছে দরজার দিকে। তিন যুবক ডুবে আছে রামিতে, কাগজে হিসেব লিখছে বার বার।

খেলার পত্রিকাটা উলটোলেন তপোধীর। অসংলগ্নভাবে। দু-চারটে পাতা দেখে রেখে দিলেন ম্যাগাজিনটা।

করুণা ফিরে এসে বললেন,—ম্যাগোঃ, বাথরুম কী নোংরা।

তপোধীর উত্তর দিলেন না।

করুণা মুখ টিপে হাসলেন,—রাগ করো কেন? আমি যা বলি, ভালর জন্যই বলি।

তপোধীরের কথা বলার ইচ্ছে হল না। করুণা এক দৃষ্টে দেখছেন স্বামীকে, —ঠিক আছে বাবা, নেমো সমুদ্রে। বেশিক্ষণ থেকো না।

—আর তুমি? তপোধীরের ঘাড় শক্ত।

—গিয়ে দেখা যাবেখন। করুণার হাসি ছড়িয়ে গেল,—এবার টিফিন কেরিয়ারটা পেড়ে দাও দিকি। নটা বাজে, খাওয়াটা আগে সেরে নাও।

তপোধীরের রাগ নিবে এল। নিঃশব্দে উঠে চার থাকের কৌটোখানা নামালেন।

—মেনু কী?

—তোমার জন্য মালাই চমচম আছে। নরম পাকের সন্দেশও। তোমার মেয়ে এনেছিল।

—বউমা দুপুরে আলুর দম বানাচ্ছিল না! গন্ধ পাচ্ছিলাম!

—আছে গো আছে। তোমার আলুর দমও আছে। দু পিস মাছভাজাও।

—তুমি মাছভাজা ভালোবাসো, ও দুটো তুমিই খাও। আমাকে খালি লুচি আলুর দম দিলেই হবে।

—লুচি কোথায় পাব?

—পাবে মানে! রিন্টি আর বউমা যে তখন লুচি ভাজছিল!

—সে তো ওদের জন্য। আমাদের জন্য ওরা নরম করে রুটি বানিয়ে দিয়েছে।

—লুচি দেয়নি! তপোধীর প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

—অমন করো কেন? তোমার না ভাজাভুজি খাওয়া বারণ। ঠাণ্ডা লুচি খেলে তুমি হজম করতে পারতে? টিফিন কৌটোর ঢাকনা খুললেন করুণা,

—বউমা দিতে চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।

তপোধীর রাগ করতেও ভুলে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন,

—শিরে হইল সর্পাঘাত, তাগা বান্ধি কোথা! বউই যদি শত্রু হয়...। দুধ নেই, কিছু নেই, আমি রুটি চিবোতে পারব না।

—তোমার জন্য সেই আচারটা এনেছি গো। করুণা যেন শিশুকে ভোলাচ্ছেন,—সেই যে গো মিক্সড পিক্‌ল্‌। তুমি ভালবাসো বলে সেলস্‌ গার্লের কাছ থেকে কিনেছিলাম।

ট্রেনের গতি কমছে। খড়গপুর এসে গেল। ভেন্ডাররা জানালায় খাবার হাঁকছে। ছেলে তিনটে তাস বন্ধ করে পুরি তরকারির হুকুম ছুড়ল। ওপারের বার্থের লোকটা তরতরিয়ে নেমে চলে গেল প্ল্যাটফর্মে। দুই সন্ন্যাসিনী উদাসীন স্বরে ডিমওলাকে ডাকছে।

তপোধীরও উঠে জানালায় গেলেন,—অ্যাই আমাকে দুটো বয়েলড এগ দাও তো।

টিফিন কেরিয়ার পাশে রেখে বাবু হয়ে বসেছেন করুণা। ঝুলি থেকে প্লেট বার করেছেন, গ্লাস বার করেছেন, আলুর দম তুলছেন চামচ দিয়ে। অবাক মুখে বললেন,

—তুমি এখন ডিম খাবে?

—খাব। অ্যাই, দুটো ডিমের দাম কত?

—আমি কিন্তু খাব না।

—খেয়ো না। আমি একাই খাব।

—আর সারা রাত বেলুনের মতো ফুলবে! করুণার চোখ থমথমে,—নুন ছাড়া খাবে কিন্তু।

—সব ব্যাপারে হুকুম ফলাবে না। আমি দুটোই খাব। উইথ সল্ট।

কচকচ ডিমসেদ্ধ চিবোচ্ছেন তপোধীর। নুন মাখিয়ে। করুণাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন করুণা, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর।

ট্রেন ছাড়ল। তিন যুবক খাওয়া সেরে মৌজ করে সিগারেট ধরিয়েছে, ধোঁয়া পাক খাচ্ছে কুপে। মাঝবয়সী লোকটা আধ ডজন কলা হাতে পাকা মাদারির মতো টঙে উঠে গেল। ক্রিশ্চান সন্ন্যাসিনীরাও রাতঘুমের নিরাসক্ত তোড়জোড় চালাচ্ছে। বাতাসে ঠাণ্ডা ভাব বেড়েছে সামান্য। এমন কিছু বেশি নয়।

বাথরুম সেরে ধুতি বদলে লুঙ্গি পরে এলেন তপোধীর। করুণা ইতিমধ্যেই

তিন যুবকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছেন, তাদের হাঁড়ির খবর বার করছেন টেনে টেনে।

তপোধীর গিন্নির মেজাজটা পড়ার চেষ্টা করলেন। একটু খোশামোদের সুরে বললেন,—তোমার চাদর বার করে দিই?

করুণা শুনেও শুনলেন না।

তপোধীর আবার বললেন,—সুতির চাদরটা বার করব?

—না।

—বাপস্ কী তেজ গলায়! তপোধীর মুখ হাসি হাসি রাখারই চেষ্টা করলেন,

—জানালাটা বন্ধ করে দাও না।

—কেন?

—কেন আবার কী? তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—জানালা বন্ধ করলে আমার গরম লাগবে।

এরই নাম বাতিক। ইনি আবার অন্যের পিছনে লাগেন! তপোধীর গার্জেনের গলায় বললেন,—রাতের ট্রেনে কারুর গরম লাগে না।

—আমার লাগে।

—শুনলে পাগলেও হাসবে। স্ত্রীকে টপকে ঝুপ করে কাচ নামিয়ে দিলেন তপোধীর। দুটো জানালারই। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন,—একটু গরম লাগুক। কদিন আগেই গলা ব্যথা হয়েছিল, সে খেয়াল আছে?

করুণা বিশেষ পাত্তা দিলেন না, আবার গল্প জুড়েছেন সামনের ছেলেটির সঙ্গে। ভাঁজ করা ধুতি কিটব্যাগরে ওপর রেখে পাশের চেন খুললেন তপোধীর। হাতড়াচ্ছেন,—আমার প্রেশারের বড়িগুলো গেল কোথায়?

—যেখানে রেখেছিলে সেখানেই আছে। করুণার উদাস জবাব।

—সেখানে নেই।

—তা হলে ওখানে রাখোনি।

—বললেই হল! আমি নিজে হাতে কিট ব্যাগে তুলেছি।

—এটা তা হলে কী? কোলের হ্যান্ডব্যাগ থেকে ওষুধের পাতা বার করলেন করুণা।

—লুকিয়ে রেখেছিলে!

—আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার ওষুধ লুকোব! টেবিলে ফেলে এসেছিলে, আমি মনে করে নিয়ে নিয়েছি। বলতে বলতে ছেলে তিনটেকে সালিশি মানছেন করুণা,—দেখেছ তো, কী বেখেয়ালি মানুষ নিয়ে আমার ঘর করা?

তোলো হাঁড়ির মতো মুখ করে ট্যাবলেট গিললেন তপোধীর। ঢকঢক খানিকটা জল খেলেন। বেডিং খুলতে গিয়ে কী যেন মনে পড়ে গেল। হঠাৎই থামলেন,

—তোমার মালিশটা নিয়েছ?

—আমার তোমার মতো ভুলো মন নয়। বালতিব্যাগে আছে।

—বটেই তো, বটেই তো। খোলা কিট ব্যাগের পকেট থেকে একখানা টিউব বার করলেন তপোধীর। করুণার নাকের সামনে নাচাচ্ছেন,—এটা তা হলে কী?

খপ করে ওষুধটা কেড়ে নিলেন করুণা, নিজের হ্যান্ডব্যাগে পুরে ফেললেন, —ও, এটা তোমার কাজ! তাই আমি বেরনোর সময়ে খুঁজে পাচ্ছিলাম না!

—আমার কাজ নয়, তোমারই বেআক্কেলেপনা।

—কেউ যদি সরিয়ে রাখে কী করব?

—সরাইনি, মনে করে সঙ্গে নিয়েছি। বলেই ছেলে তিনটের দিকে ফিরলেন তপোধীর, —দ্যাখো দ্যাখো, কী চিজ নিয়ে ঘর করি আমি।

মজা পেয়ে হাসছে তিন যুবক। হাসতে হাসতেই টপাটপ মাঝের বার্থ নামিয়ে ফেলল, ফুঁ দিয়ে দিয়ে বালিশ ফোলাচ্ছে, পেশাদারি ভঙ্গিতে আয়োজন করছে শোওয়ার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডান কাত ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল তিনজন।

তপোধীর বসে বসে হাই তুলছেন,—এবার তো আমাদেরও শুতে হয়।

—সারা রাত জাগবে বলেছিলে না? করুণার কণ্ঠে উপহাস।

—ঘুম পাচ্ছে যে।

—তবে শোও। দাঁড়াও, বিছানা করে দিই।

—এখানে কেন? আমি মাঝের বার্থে যাচ্ছি।

—উঁহু, ওটা এখন নামাবে না।

—কেন?

—কারণ আমি ঘুমোব না, তাই। ওটা নামালে আমার বসতে অসুবিধে হবে।

তপোধীর কথা বাড়ালেন না। বাধ্য ছেলের মতো নীচের বার্থেই শুয়ে পড়লেন। করুণাকে আলগা ছুঁয়ে।

তপোধীরের মাথার কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছেন করুণা, আনমনা চোখে দেখেছেন পৃথিবীটাকে। বন্ধ কাচের এপার থেকে।

রাত নিঝুম হয়ে এল। কামরায় জেগে আছে নীলচে রাতবাতিরা, জেগে আছেন করুণা। স্বপ্ন স্বপ্ন বাতাস খেলে বেড়াচ্ছে এ কুপে সে কুপে। আঁধার ছিঁড়ে ছুটছে রেলগাড়ি, ঝমঝম ঝমাঝম। থামছে, ছুটছে, থামছে, ছুটছে। পার হচ্ছে নদী, পার হচ্ছে প্রান্তর, পার হচ্ছে একটার পর একটা সেতু।

গভীর রাতে তপোধীরের ঘুম ভেঙে গেল। করুণা ঠেলছেন জোরে জোরে,

—অ্যাই শুনছ?

—উঁ?

—বাপ্, কী ঘুম রে! কামরা যে একেবারে মাত করে দিলে। পাশ ফিরে শোও।

ঘুম চটকে গেল। চোখ বড় করে উঠে বসলেন তপোধীর।

—চিল্লাচ্ছ কেন? হলটা কী?

—সিংহের মতো নাক ডাকাচ্ছ কেন?

—তোমার তাতে কী?

—আমার ঘুম আসছে না। ট্রেনে আমার ঘুম আসবে না।

—শুলেই আসত। বললাম ওপরে উঠে যাচ্ছি।

—না। ওপরে উঠলে তোমাকে আর ঠেলা যাবে না। অভ্যেস তো জানি, না ডাকলে তোমার গর্জন থামে না।

—সঙ্গে একটা পাখা আনলে পারতে। ডাঁটি দিয়ে খোঁচাতে মনের সুখে।

—তাই উচিত ছিল। কী লোকের সঙ্গেই না বেড়াতে বেরিয়েছি। কুম্ভকর্ণ একটা।

করুণার যেন গলা কাঁপল একটু! তপোধীর অপাঙ্গে তাকালেন। হঠাৎ কোথ্থেকে এক ঝলক বাতাস এসে ঝাপটা মারে উনসত্তর বছরের মনটায়। বাতাসটা এত বেশি দূরের, যে চিনেও চিনতে পারলেন না তপোধীর।

এবার একটা নদী পার হচ্ছে রাতের গাড়ি। ধীরে, অতি ধীরে। বৈতরণী নদী। এ নদী পার হলে নাকি এ পারের টান কমে যায়।

তপোধীর চুপটি করে বসে আছেন। করুণাও নীরব। বয়ে যাচ্ছে মৌন মুহূর্ত।

এক সময়ে তপোধীর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন,—ওয়াটার বটলটা দাও তো।

করুণা জানালার কাছে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, নিজে উঠে নাও।

মুহূর্ত মিলিয়ে গেল। তপোধীর অসহিষ্ণু হলেন, নিয়ম মতোই। বললেন—তোমার সামনে ঝুলছে বলেই বলা। থাক, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে নয় মরেই যাব।

—কী কথার ছিরি! হাত বাড়িয়ে জলের বোতল পাড়লেন করুণা,

—সবটা শেষ কোরো না। আমিও খাব।

এর ঢোক খেয়েই প্লাস্টিকের বোতল এগিয়ে দিলেন তপোধীর,

—খাও, নিজে আগে প্রাণ ভরে খাও।

—ইঁইহ, মেজাজে একেবারে চাঁদি ফাটে দেখি।

উত্তরে কিছু একটা বললেন তপোধীর। তার উত্তরে করুণা। তার উত্তরে তপোধীর। চলছে, কলহ চলছে। বিনবিন ঝগড়া বন্ধ কাচ ফুঁড়ে চলে গেল বাইরে। নাচতে নাচতে, দুলতে দুলতে।

রাত এখন বড় মায়াময়। চাঁদের বুড়ি রুপোলি সুতো কেটে চলেছে চরকায়। সেই সুতোয় বোনা মসলিন এখন ভাসছে চরাচরে। রুপোলি সব মেখে ছুটছে অলৌকিক গাছপালা, ছুটছে মাঠ, ছুটছে নদী, ছুটছে বালির চর।

বৃদ্ধ পৃথিবী ছুটছে সমুদ্রের পানে। জ্যোৎস্না মেখে। জ্যোৎস্না হয়ে। সেই জ্যোৎস্নায় একাকার হয়ে গেল কলহরাজি। জ্যোৎস্না চলেছে সমুদ্রের পানে। বড় বাঙ্ময় জ্যোৎস্না।

হানিমুনে চলেছেন উনসত্তর আর তেষট্টি। তপোধীর আর করুণা।

সাত বছর এগারো মাস আট দিন

শব্দগুলো যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেঁথে যাচ্ছে যন্ত্রটার গায়ে। টকটক...টকটক...টকটক...টক। পাশে বসা যুবকটি কী অবলীলায় খেলা করে চলেছে প্রতিটি কথাকে নিয়ে? বাজাচ্ছে, নাচাচ্ছে, আঙুলের মৃদু চাপে দ্রুত তাদের বসিয়ে দিচ্ছে যন্ত্র-অক্ষরগুলোর বুকে।

ভদ্রলোক ভরাট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার। চাবিতে আঙুল রেখেই যুবক মুখ তুলল—পড়ব?

—পড়ো।

টাইপরাইটারের রোলার পাক খেল কয়েকবার। যুবক ঝুঁকল যন্ত্রস্থ কাগজটার দিকে—টু দা কোর্ট অফ দা ডিসট্রিক্ট জাজ, আলিপুর, চব্বিশ পরগণা সাউথ। ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নাম্বার নশো পঁয়ত্রিশ অফ নাইনটিন এইট্টিনাইন।

—হুঁ। ভদ্রলোক রিভলভিং চেয়ার ঘোরালেন। গর্বিত মোরগের মত ঘাড় ফুলে উঠল সামান্য—বুঝলেন, এ বছর এই নশো পঁয়ত্রিশটা কেসের একশ বাইশটা আমিই করলাম। হা হা। বারে আজকাল আমার নামই হয়ে গেছে বিচ্ছেদ উকিল।

নিজের রসিকতায় একাই হাসছেন ভদ্রলোক। চন্দন নকল হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল ঠোঁটে। হাসি ঠিক ফুটল না। সিগারেটে বড় টান দিয়ে মাথা রাখল চেয়ারের পিঠে। ভুল করে একবার তাকিয়েও ফেলল সুদেষ্ণার দিকে। টেবিলের কাচে একভাবে আঙুল বুলিয়ে চলেছে। কোনও টেনশন চাপার চেষ্টা করলে চিরকালই আঙুলগুলোকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না সুদেষ্ণা। ফর্সা চঞ্চল আঙুলগুলোর ওপর থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে নিল চন্দন।

ভদ্রলোক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে জরিপ করছেন দুজনকেই। চন্দনের সঙ্গে চোখাচাখি হতেই

চালশে চশমাখানা এঁটে নিলেন চোখে। যুবকের দিকে ফিরলেন—এবার তাহলে *পিটিশনারদের ডিটেইলস্ টাইপ করে ফেল! ওকে?*

—করে ফেলেছি স্যার। যুবকটির *গলায় চোরা* উৎসাহ *যেন।* উৎসাহ, *না* কৌতূহল? আড়চোখে একবার দেখেও নিল সুদেষ্ণাকে,—এই যে স্যার। পিটিশনার নাম্বার ওয়ান শ্রীচন্দন মুখার্জি, বাবা লেট হরশংকর মুখার্জি, বাই ফেথ হিন্দু, বর্তমান ঠিকানা আটত্রিশ-জে মহারাজা ঠাকুর রোড, পি-এস—যাদবপুর, কলকাতা, সাত লক্ষ একত্রিশ। পিটিশনার নাম্বার টু শ্রীমতী সুদেষ্ণা মুখার্জি, স্বামী শ্রীচন্দন মুখার্জি, বাবা লেট আনন্দমোহন চ্যাটার্জি, বাই ফেথ হিন্দু, বর্তমান ঠিকানা একুশের দুই লেক প্লেস, পি-এস—টালিগঞ্জ, কলকাতা, সাত লক্ষ উনত্রিশ।

—রাইট। ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। আরাম করে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলেন দশাসই চেয়ারটায়। দু আঙুলে ডট পেন ঘোরাতে লাগলেন বনবন—এবার তাহলে হেডিং লিখে ফেল। লেখো অ্যাপ্লিকেশন ফর ডিভোর্স অন মিউচুয়াল কনসেণ্ট আণ্ডার সেকশন তেরোর বি অফ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, উনিশশো ছাপ্পান্ন।...হয়েছে? পরের লাইন—দি হাম্বল পিটিশন অফ পিটিশনার নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড পিটিশনার নাম্বার টু...।

তীব্র শব্দ তুলে যান্ত্রিক গতিতে বাক্যরা পরপর দাঁড়িয়ে পড়ছে স্ট্যাম্প পেপারের গায়ে। টাইপরাইটারের চাবি নয়, যেন বৃদ্ধ বিধাতার শীর্ণ আঙুল বিধিলিপি লিখে চলেছে।

সুদেষ্ণা চোখ বুজে ফেলল। আহ্। কেন এ সময়ে ওই ছবিটাই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। একটা পরিপূর্ণ আলোকময় সন্ধ্যা। চারদিকে উজ্জ্বল মানুষের মুখ, হাসি, কোলাহল আর সানাইয়ের বুক তোলপাড় করা সুর। অমন একটা খুশির ছবিতে কে ওই মেয়েটা রাজেন্দ্রাণী হয়ে বসে? চোখভর্তি লজ্জা। বুক জুড়ে তিরতির সুখ। সে কি এই সুদেষ্ণাই!

পুরুতমশাই বললেন—কন্যাকে পশ্চিমমুখে বসান। জামাইকে পুবমুখে।

বেনারসি আর গয়নায় জরদগব সুদেষ্ণাকে দুই বৌদি চন্দনের মুখোমুখি বসিয়ে দিল।

পুরুতমশাই বাবার দিকে তাকালেন—এবার আপনি কন্যা ও বরের পরস্পরের মুখ অবলোকন করান।

শাঁখ বেজে উঠল। উলুধ্বনিতে কান তোলপাড়। বাবা চন্দনের হাঁটুতে হাত রেখেছেন। সারাদিনের উপোস করা চোখেমুখে একটু শুকনো ভাব। তবু গরদের কাপড়ে কী সৌম্য সেদিন! খালি গায়ে ধবধবে সাদা পৈতে। হাতের কোশে তিল,

কুশ, যব।...ভরদ্বাজ গোত্রস্য স্বর্গীয় হরশংকর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, ভরদ্বাজ গোত্রায় চন্দন দেবশর্ম্মণে...কাশ্যপ গোত্রস্য আনন্দমোহন দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, কাশ্যপ গোত্রাং সুদেষ্ণা দেবীং এনাং—সবস্ত্রাচ্ছাদিতালঙ্কৃতাং কন্যাং...

গাঁটছড়া বাঁধার আগে কে যেন বলে উঠল,—এ হল জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন, বুঝলি।

মিথ্যে। সব ভাঁওতা। ভাবের ঘরে চুরি। মনকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। বন্ধন কোথাওই কোনও দিন তৈরি হয় না। কারুর সঙ্গেই না। যা হয় সবটাই এক ধরনের মায়া মাত্র।

সুদেষ্ণা চোখ খুলল। চন্দন ঠিক কোন দিকে মুখ করে বসে এই মুহূর্তে? সেই বা কোন মুখে? জীবনের মুখ কখন যে কোথায় কিভাবে বদলে যায়। এই ঘরের ভেতরে বসে দিকনির্ণয় করা এখন অসম্ভব। গেট ঠেলে, উঠোন মাড়িয়ে, লম্বা একটা করিডোর পেরিয়ে এ ঘরে এসেছে। এসেছে বললে ভুল হয়। তাকে নিয়ে এসেছে। চন্দনই।

কাল সন্ধেবেলা হঠাৎই চন্দনের ফোন। লেক প্লেসে।

—কাল একবার সময় করতে পারবে? দশটা নাগাদ?

—কেন?

—ল-ইয়ার কাল সকালে বাড়িতে ড্রাফটটা ফাইনাল করে ফেলতে চাইছেন। তুমি এলে সুবিধে হয়।

এক পলকের জন্যও হলেও কেঁপে উঠেছিল সুদেষ্ণা। কেন যে কেঁপেছিল। কি হতে চলেছে, কি হবে, সবই তো জানা। জানা শুধু নয়, পূর্ণ সম্মতিও রয়েছে তার। তবুও...

চন্দন ওপ্রান্ত থেকে বলেছিল,—তুমি যদি বলো তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে পারি।

—জায়গাটা কোথায়?

—ভবানীপুরে। ভারতী সিনেমার পেছনে।

—ঠিক আছে। আমি ভবানীপুর থানার সামনে থাকব। ঠিক দশটায়।

সুদেষ্ণা আলগোছে চোখ বোলাল ঘরের চারদিকে। চতুর্দিকের দেওয়াল জুড়ে কাচের আলমারিতে শুধু মোটা মোটা আইনের বই। একটুও ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ভদ্রলোকের মাথার পেছনদিকে একটা শুধু খোলা জানালা। এমন একটা বদ্ধ ঘরে মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্বাস নেয় কিভাবে। সুদেষ্ণা মুখ ওপরে তুলে ফ্যানের হাওয়া থেকে কিছু বাতাস টেনে নিল বুকে।

—আমার একটা কথা বলার ছিল।

—বলুন। সবিনয়ে ঝুঁকলেন ভদ্রলোক।

—আমার নাম ঠিকানা মেনশন করার সময়ে প্রথমেই মেনশন করলেন আমি কার স্ত্রী। ইজ ইট নেসেসারি? বাবার নামই কি যথেষ্ট নয়?

—না ম্যাডাম, ইট ইজ কাস্টমারি। খুব কায়দা করে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিচ্ছেন ভদ্রলোক—দেখুন, আপনাদের মিউচুয়াল পিটিশনের বেসিসে এখন ছ মাসের জন্য জুডিশিয়াল সেপারেশন পাবেন আপনারা। রাইট? এর মধ্যে আপনাদের ভেতর রিকন্‌সিলিএশনও হয়ে যেতে পারে। রাইট? আই মীন মিটমাট যদি না হয় তবে ছমাস পরে আপনারা জয়েন্টলি কোর্টে যেতে পারেন টু গেট এ ডিক্রি অফ ডিভোর্স। ওকে? ভদ্রলোক এবার চোখ ফেললেন চন্দনের দিকে, টিল দেন মিস্টার মুখার্জিই কিন্তু আপনার লিগাল হাজব্যান্ড। আপনি এটা অস্বীকার করতে পারেন না। নয় কি? বলতে পলতে এক ছিটে বাঁকা হাসিও যেন ফুটল মুখে, আপনি কি বলেন মিস্টার মুখার্জি?

—আমার কিছু বলার নেই। চন্দন এক ঝটকায় ঘুরে বসেছে সঙ্গে সঙ্গে। গলায় স্পষ্ট ঝাঁঝ। বিরক্তি। পোড়া সিগারেটের টুকরো অকারণে বেশি চেপে নেভাচ্ছে অ্যাশট্রেতে, আমার মনে হয় এখন কাজের কথাগুলো শুরু করা উচিত।

—বেশ। ভদ্রলোক ঘুরণ-চেয়ারে পুরো এক পাক ঘুরে নিলেন। বিজ্ঞ মুখে চাপা কৌতুক,—আমি বরং ফাইনাল টাইপিং-এর আগে আরেকবার পয়েন্টগুলো শুনিয়ে দিই, কেমন? কারুর যদি কোনও অবজেকশন থাকে এখনও ক্লিয়ার করে নেওয়া যাবে। রাইট?

ভদ্রলোক 'রাইট' শব্দটা বড় বেশি ব্যবহার করেন। সবসময় 'রং' নিয়ে কারবার করেন বলেই কি? কথাটা এমনি এমনি মনে হল সুদেষ্ণার। শেষ 'রাইটে'র সঙ্গে সঙ্গে পাশের টেবিলের যুবক পিঠ সোজা করে বসেছে। হাত বাড়িয়ে ব্রীফটাকে এগিয়েও দিয়েছে প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে। ভদ্রলোক নতুন করে চশমা এঁটেছেন নাকে।

...পয়েন্ট নম্বর দুই। বিগত উনিশেশো আশি সালের পনেরোই জুলাই পিটিশনার নাম্বার ওয়ান, যিনি তখনও অবিবাহিত ছিলেন, তিনি তখনও অবিবাহিতা পিটিশনার নাম্বার টুকে একুশের দুই লেক প্লেস, থানা টালিগঞ্জ, কলকাতা সাত লক্ষ উনত্রিশ, থেকে হিন্দুমতে বিবাহ করেন।

সুদেষ্ণা কপাল থেকে ঝুরো চুল সরাল। চন্দন তাকিয়ে আছে কাচের গায়ে পড়া নিজেরই আবছা ছায়ার দিকে। ভদ্রলোক দুজনের মুখের ওপরই কয়েক পলক দৃষ্টি ফেলে চোখ রাখলেন কাগজে।

...পয়েণ্ট তিন। সেই বিবাহের পর থেকে দুই পার্টি একত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আটত্রিশ-জে মহারাজ ঠাকুর রোড, থানা যাদবপুর, কলকাতা সাত লক্ষ একত্রিশে বসবাস করে আসছেন। এবং এই ঠিকানায়...

এতবার করে থানা আর পিন কোড আবৃত্তি করছেন কেন ভদ্রলোক? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে প্রমাণ করার জন্য এগুলো কি এতই বেশি জরুরী? কে জানে!

সুদেষ্ণার দুই ভুরু যখন জড়ো পল্‌কা চিন্তায়, ঠিক তখনই চন্দনের প্রতিবাদ শোনা গেল, তিন নম্বর পয়েণ্টে ওটা বোধ হয় ঠিক বলা হল না। বসবাস করে আসছেন সেণ্টেন্সটা ভুল। কারণ ও আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে লাস্ট ইয়ারের জুনে।

—আহা ইম্‌পেশেণ্ট হচ্ছেন কেন? সে পয়েণ্টও আছে। ভদ্রলোক বরাভয়ের হাসি হাসলেন, চার নম্বরটা শুনুন। এই তো!...দুজন পিটিশনারই মানসিক অ্যাডজাস্টমেণ্টের অভাবের দরুন গত চব্বিশে জুন উনিশশো অষ্টআশি সাল থেকে আর একত্রে বসবাস করতে পারেননি। তাঁরা শেষ দাম্পত্য জীবন যাপন করেছিলেন উনিশশো অষ্টআশি সালের তেইশে জুন।

ব্যস, এই টুকুনই! বলতে গিয়েও শব্দ দুটোকে গিলে নিল সুদেষ্ণা। আশি থেকে অষ্টআশির জুন, ঠিক ঠিক হিসেব করলে পুরো সাত বছর এগারো মাস আট দিন। এতখানি লম্বা সময়টাকে কি নিপুণ দক্ষতায় দুটো মাত্র লাইনে বেঁধে ফেলল আইন! যেন এতগুলো বছর ছিল শুধুই একত্রে বসবাস করা, আর কিছুই না। কোনও ঘটনা নেই, অঘটনও নেই কোনও! অথচ এই বছরগুলোর প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা, পল, অনুপল এখনও পর পর ধরা আছে স্মৃতির পর্দায়। ঘটনাময় দীর্ঘ ভিডিও ক্যাসেট যেমন। পর পর দৃশ্যগুলো যেখানে মধুর থেকে বীভৎস, আরও বীভৎস। আরও বীভৎস, অথচ তাদেরও কি সুন্দর একটা ছোট্ট বাক্যে বন্দী করে ফেলা গেল—মানসিক অ্যাডজাস্টমেণ্টের অভাব! সুদেষ্ণা বাঁ হাতে কপাল চেপে ধরল।

উকিল ভদ্রলোক পরিষ্কার উচ্চারণে পাঁচ নম্বর পড়ে চলেছেন—এই বিবাহের ফলস্বরূপ সায়ন্তনী মুখার্জি নামে একটি কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে আঠাশে ডিসেম্বর উনিশেশো একাশি সালে। রাইট?

রাইট! রাইট! দৃশ্যটা আজও অমলিন যে। একটুও রঙ জ্বলেনি কোথাও। সুদেষ্ণা নিজের মনে মাথা নাড়ল। মনে আছে। সব স্পষ্ট মনে আছে। ওই তো নার্সিংহোমের

দরজা ধরে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চন্দন। মুখ জুড়ে আনন্দ, লজ্জা আর নতুন পিতৃত্বের গৌরবমাখা এক অপূর্ব নির্মল হাসি।

—থ্যাংকস সুদেষ্ণা। মেনি থ্যাংকস।

বুকের গভীরে জ্যান্ত পুতুলটার শরীরের ঘ্রাণ নিতে নিতে তখন কেমন যেন লজ্জা পাচ্ছে সুদেষ্ণাও। চোখ ছাপিয়ে থিরথির খুশি,—কিসের ধন্যবাদ?

—থ্যাংকস ফর দা সুইট ডটার।

—তবে তো ধন্যবাদ তোমারও প্রাপ্য। আমার তরফ থেকে। মেয়ে তোমারই।

দৃশ্য বদল হয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। রঙ পাল্টে গেল। চন্দনের স্বর এখন রুক্ষ, কঠিন।

—তুমি আজ মেয়ে ফেলে কিছুতেই কাজে যেতে পারবে না।

—কেন? ঝিমলি তো আজ ভালই আছে। বেশ খেলা করছে।

—তবু তুমি বেরোবে না।

—অসম্ভব। আমাকে আজ একবার যেতেই হবে। তুমি তো জানো আমার কনফার্মেশন হয়নি এখনও।

—চুলোয় যাক তোমর চাকরি। মেয়ে ফেলে...

—আশ্চর্য! বাড়িতে এতগুলো লোক রয়েছে...তোমার মা, তোমার বোন—

—তারা কেউ তোমার মেয়ের আয়া নয়।

—এভাবে বলছ কেন? আমি তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য...বেশ তো, তুমিই তাহলে আজকের দিনটা বাড়িতে থাকো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি...

—চমৎকার! তোমার জন্য আমি অফিস কামাই করব?

—আমার জন্য কেন? নিজের মেয়ের জন্য করবে। ঝিমলি তোমার মেয়ে নয়? একটা দিন তুমি থাকতে পারো না বাড়িতে? মেয়ের কাছে?

ভিডিও টেপে তুফান গতিতে আবার ফাস্ট ফরোয়ার্ড। দৃশ্য ছুটে চলেছে পরিণতির দিকে। এবার ছবিতে উদ্দাম চিৎকার। পরস্পরকে আক্রমণ ভয়ংকর ভাবে। সুদেষ্ণা ফুঁসছে রাগী বেড়ালের মত।

—আমি আর এক সেকেন্ডও তোমাদের বাড়িতে থাকব না। আনকালচারড, অশিক্ষিত ফ্যামিলি একটা। কি ভাবো আমাকে তোমরা? তোমাদের কেনা বাঁদী?

—দ্যাখো, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমার বাড়ির কাউকে তুলে তুমি কোনওরকম...

—বেশ করব বলব। ইতর ছোটলোকের দল সব...

—আর একটা বাজে কথা বললে তোমাকে আমি...

—কি করবে? মারবে?

—ঘাড় ধরে বার করে দেব বাড়ি থেকে।

—তার দরকার নেই। আমি আজই চলে যাচ্ছি। ঝিম—ঝিমলি...

—খবরদার, ঝিমলিকে ডাকবে না।

—ওকে আমি নিয়ে যাব।

প্রচণ্ড শব্দে ঠাস করে গালে চড় পড়ল একটা। ছিটকে গেল সুদেষ্ণা। মুহূর্তে ঘরভর্তি লোকজন। চন্দনের মা, বোন, বাড়ির ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত। কী লজ্জা! কী লজ্জা! সবার গলা ছাপিয়ে তখন সাড়ে ছ'বছরের মেয়েটার কান্না ডুকরে ডুকরে উঠছে—ওমা আমি তোমার সঙ্গে যাব! মা আমি তোমার সঙ্গে যাব!

উকিল ভদ্রলোক গলা ঝাড়লেন ভাল করে—এবার ছ নম্বর। কাস্টডির পয়েণ্ট।

সুদেষ্ণা টান টান হয়ে বসল। চন্দন দাঁতে আঙুল কামড়াচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য গোটা ঘর স্তব্ধ যেন। তারপরই ভদ্রলোকের ভারী গলা...

—যদিও আইনের চোখে পিটিশনার নাম্বার ওয়ানই প্রেফারেনশিয়াল অ্যান্ড ন্যাচারাল গার্জেন অফ দ্য মাইনর ডটার, তবু তার শিশুবয়স অর্থাৎ বর্তমান টেন্ডার এজ-এর কথা বিবেচনা করে পিটিশনার নাম্বার টুকেই তার কাস্টডিয়ান ধরা হবে।

এতদিন ধরে জমে ওঠা দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা যেন এক লহমায় উঠে যাচ্ছে। বুক কাঁপিয়ে গড়িয়ে এল স্বস্তির নিশ্বাস। সুদেষ্ণা বহুকাল পর চুরি করে তাকিয়ে ফেলল চন্দনের দিকে। চন্দন তাহলে শেষ পর্যন্ত...। একমনে একটা না-জ্বালানো সিগারেট টেবিলে ঠুকছে চন্দন। মুখটা কি একটু ম্লান? লোকটার ওপর হঠাৎ মায়া আসছে কেন? মায়া, না কৃতজ্ঞতা?

উকিল ভদ্রলোক অল্পক্ষণ চুপ থেকে আবার পড়ছেন...ছয়-এর বি। যদিও সন্তান পিটিশনার টু-এর কাস্টডিতেই থাকবে তবু পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের তার প্রতি ততটাই অধিকার থাকবে, যতটা থাকবে পিটিশনার নাম্বার টু'র। এবং শর্ত মোতাবেক পিটিশনার নাম্বার টু প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবিবার পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের কাছে কন্যাকে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

না, এটাও তেমন আপত্তিজনক প্রস্তাব নয়। এ শর্ত চন্দন দিতেই পারে। সুদেষ্ণা ঢোঁক গিলল। মেয়ে তার কাছে আছে ঠিকই তবু এখনও তো মাঝে মাঝে তাকে পাঠিয়ে দিতে হয় ও-বাড়িতে। মেয়েটারই যে হঠাৎ হঠাৎ এক এক দিন বাবার জন্য খুব মন কেমন করে!

ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন সুদেষ্ণার দিকে। সুদেষ্ণা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে ফেলল। আর তখনই তৃতীয় সাব পয়েণ্টটা এসে গেল।

—ক্লজ ছ'এর এ-তে যে প্রভিশনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা কার্যকর থাকবে না, যদি বাচ্চা স্ব-ইচ্ছায় এবং স্ব-বুদ্ধিতে পিটিশনার নাম্বার ওয়ানের কাস্টডিতেই থাকতে চায়। সেক্ষেত্রে বাচ্চার কাস্টডি এক নম্বর পিটিশনারের কাছেই ফিরে যাবে। অর্থাৎ তিনিই লিগাল কাস্টডিয়ান হবেন।

কথাটায় কেমন প্যাঁচ আছে যেন। এ কেমন শর্ত! সুদেষ্ণার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল।

—মানেটা ঠিক পরিষ্কার হল না।

—অপরিষ্কারের কি আছে? চকিতে কথা বলে উঠেছে চন্দন। গলার স্বরে ঝাঁঝ না থাকলেও ঝাঁঝের আভাস,—এখানে তো না বোঝার কিছু নেই। ঝিমলি যদি আমার কাছে থাকতে চায়, আমার কাছেই থাকবে।

—ইমপসিবল! সুদেষ্ণা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে—আমি কোন শর্তে ঝিমলির কাস্টডি ছাড়ব না।

—তাহলে তো তোমার সঙ্গে কোনও আপোসই করা যায় না।

—কে করতে বলেছে আপোস? আমি আমার নিজের উকিল কনসাল্ট করব।

দুজনেরই ধ্বনি উঁচুতে উঠছে ক্রমশ। সামনে বসা অন্য দুটো মানুষের উপস্থিতি যেন ধর্তব্যই নয়। সুদেষ্ণার চোয়াল শক্ত হয়েছে—আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি সব পারো। আমার মেয়ের ব্রেনওয়াশ করতে তোমার দুদিনও লাগবে না।

—হোয়াট ডু ইয়ু মীন টু সে?

—যা বলতে চাইছি খুব বুঝতে পারছ। ঝিমলি আমাকে সব কথা বলে। তুমি ওকে ও-বাড়িতে ভি সি আর কিনে দেবে বলেছ। আগে কখনও দাওনি, হঠাৎ সেদিন ওকে টকিং ডল কিনে দিয়েছ। তোমার মা ওকে নানারকম লোভ দেখিয়ে ও-বাড়িতে থেকে যেতে বলেন।

—ওয়েট ওয়েট ওয়েট! বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ শোনার পর উকিল ভদ্রলোক মাথা গলালেন—আপনারা আমার কথা একটু শুনবেন? একটু শান্ত হয়ে বসবেন ম্যাডাম?

সুদেষ্ণা রীতিমত রাগের সঙ্গে বসে পড়ল চেয়ারে।

—গুড! শুনুন তাহলে। আপনি অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন। এত কথার পরও দিব্যি অমায়িক হাসছেন ভদ্রলোক—আমি আইনের বাইরে গিয়েই বলছি, আপনার মেয়ে যদি প্রলুব্ধ হয়েই তার বাবার কাছে গিয়ে থাকতে চায় তাহলে কিন্তু বুঝে

নিতে হবে মেয়ের ওপর আপনার নিজের কোন ইমোশনাল কণ্ট্রোলই নেই। আর মেয়েরও আপনার ওপর টান নেই তেমন।

—মানতে পারলাম না। সুদেষ্ণা সজোরে মাথা ঝাঁকাল—যে কোন শিশুকেই লোভ দেখানো খুব সহজ।

—মানলাম। কিন্তু শিশুরা মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না, এটাও তো সত্যি।

—পারবে না কেন? ওখানে বাবা, ঠাকুমা, পিসি সবাইকে পেয়ে যাবে যে।

—এই, এই তো পয়েন্টে এসে গেলেন। ভদ্রলোক হেসে উঠলেন শব্দ করে,—তাহলে স্বীকার করছেন বাচ্চার জীবনে মা ছাড়াও বাবা ঠাকুমা পিসিদের কিছু ভূমিকা থাকে! রাইট?

না, এদের সঙ্গে তর্ক করে পারা যাবে না। রাগে, কষ্টে চোখে জল এসে যাচ্ছে। নিজের উকিলের কাছে ডেকে এনে আপোসের নামে, ইচ্ছে করে তাকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে চন্দন। এ এক ধরনের চক্রান্ত। কিছুতেই ফাঁদে পা দেবে না সে। গুম হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল সুদেষ্ণা। জিজ্ঞাসু মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক। চন্দন ফস করে ধরিয়ে ফেলল হাতের ধরা সিগারেটটাকে। গলায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ—ওয়েল! ওর যখন নিজের সন্তানের ভালবাসার ওপরই আস্থা নেই, তখন তো আর কথাই চলে না।

—কেন চলবে না? ভদ্রলোক গলা নরম করে মধ্যস্থতায় নামলেন আবার, আপনি এগ্রি করলে ওই ক্লজটা বদলে ফেলা যায়।

—ঠিক আছে। চন্দন ভেবে নিল একটুখানি—তার বদলে অন্য ক্লজ রাখতে হবে।

—বলুন।

—কাস্টডি ওরই থাকুক। বিজনেস ডিল রদবদল করার সময় যেভাবে কথা বলে মানুষ, চন্দনের মুখচোখে অবিকল সেই ভঙ্গি,—মেয়ে উইকে দু দিনের জায়গায় অ্যাটলিস্ট তিনদিন আমার কাছে থাকবে। ওর স্কুলের মাইনে আমি দেব। স্কুলের অফিসিয়াল গার্জেন হিসেবেও আমার নাম থাকবে।

উকিল ভদ্রলোক সুদেষ্ণার দিকে তাকালেন,—এনি অবজেকশন ম্যাডাম?

সুদেষ্ণা নীরব। চন্দনের ব্যঙ্গটুকু তীক্ষ্ণ তীর হয়ে বিঁধে গেছে বুকের ঠিক মাঝখানটাতে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ঝিমলির ভালবাসার ওপরও কি সত্যি তবে আস্থা নেই তার? কারুর ভালবাসার ওপরই কি আছে? একদিন তো মনে হয়েছিল চন্দনের মতো ভাল আর কেউ তাকে বাসে না। আর আজ...

—কি হল ম্যাডাম? কিছু বলুন?

সুদেষ্ণা লম্বা শ্বাস টানল—আমাকে একটু ভাবতে দিন।

—ভাবুন। ততক্ষণে আমি সাত নাম্বারটা শুনিয়ে দিই।

সুদেষ্ণা শুনেও শুনল না। নিজের মনের সঙ্গে অন্য একটা আপোসের মামলা চলাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে সে।

—সাত নম্বর অনুযায়ী, পিটিশনার নাম্বার টু যেহেতু কর্মরতা, সেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় ভরণপোষণের দাবি জানাচ্ছেন না। এবং ভবিষ্যতেও তিনি পিটিশনার নম্বার ওয়ানের কাছ থেকে কোনওরকম অ্যালিমনি দাবি করবেন না।...কি হল, শুনছেন না?

—উঁ? সুদেষ্ণা চমকাল সামান্য।

—আপনি মন দিয়ে শুনছেন না। খোরপোষ প্রসঙ্গে বলছিলাম। এ ব্যাপারে আপনার কোনও দাবি নেই তো?

—নাহ্। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল সুদেষ্ণা। চন্দন তার দিকেই সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। চোখে তীব্র শ্লেষ। সেই শ্লেষ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল সুদেষ্ণার ক্লান্ত চোখেও। স্থির তাকিয়ে আছে দুই পিটিশনার। উকিল ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে পাতা ওল্টাচ্ছেন ড্রাফটের। টাইপিস্ট যুবকটি টাইপ রাইটার আস্তে সরালেও বেশ জোরে আওয়াজটা বেজে উঠল কানে। মাথার ওপর সিলিং ফ্যানটাও আচমকা মুখর। সেই মুখরতার সঙ্গে তাল রেখে উকিল ভদ্রলোকের গলা গমগম করে উঠল।

—লাস্ট পয়েণ্টটাও শুনে নেবেন নাকি?

এর পরও পয়েণ্ট বাকি থাকে!

থাকে। আট নম্বর পয়েণ্ট অনুযায়ী পিটিশনার নাম্বার টু, শুধুমাত্র তাঁর পিতৃগৃহ থেকে পাওনা যাবতীয় ফার্নিচার, গহনা এবং পোশাকাদি ইচ্ছে হলে ফেরত নিয়ে নিতে পারেন। এই সমস্ত জিনিস ডিভোর্সের ডিক্রি পাওয়ার পরই ফেরত নেওয়া যাবে।

পিটিশনার নাম্বার টু দুম করে খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসল একটা।—ডিভোর্সের ডিক্রি ঠিক ছ' মাস পরেই পাওয়া যাবে তো?

—সারটেনলি। যদি সঙ্গে সঙ্গে আপনারা অ্যাপিয়ার করেন কোর্টে। ভদ্রলোক ফাইল বন্ধ করলেন—এই ছ'মাস কিন্তু আপনারা স্বামী-স্ত্রীই থাকছেন। বলতে বলতে অভিজ্ঞ হাসি হাসছেন ভদ্রলোক,—এর মধ্যে কিন্তু মিটমাটও হয়ে যায় অনেক সময়। হয়ত আপনাদেরও...

—ঠিক আছে। পিটিশনার নাম্বার টু কঠিন মুখে উঠে দাঁড়িয়েছে—কথা যেভাবে

হল, ফাইনাল ড্রাফটটা আপনি সেভাবে করে রাখতে পারেন। আমি কাল পরশু এসে...

—এক মিনিট। পিটিশনার নাম্বার ওয়ানও প্রায় একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে—আট নম্বর পয়েন্টটা নিয়ে কিছু বলার আছে। ওই ওর জিনিসপত্র ফেরত নেওয়ার ব্যাপারটা। মানে আমি বলতে চাইছি ওর সব কিছু ও যত তাড়াতাড়ি ফেরত নিয়ে যায়, আমাদের সুবিধে হয়, এই আর কি।

—বেশ। তাই হবে।

সুদেষ্ণা দরজার দিকে এগোল। চন্দনও বেরিয়ে আসছে পেছন পেছন। গেট পেরিয়ে, স্বামী-স্ত্রী নয়, দুই পিটিশনার জ্বলন্ত রোদ মাথায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন।

নিজের নিজের রাস্তা ধরার আগে পরস্পরের চোখে চোখ রেখেছে আরেকবার। হয়ত এই শেষবার। চোখে চোখে ফেরত দেওয়া-নেওয়ার হিসেবটাকে আপ্রাণ শুষে নিতে চাইছে দুজনে। আপোসের শর্তগুলোকে মিলিয়ে নিতে চাইছে।

মিলছে না। কিছুতেই মিলছে না পুরোটা। আগাগোড়া হিসেবটাকে বার বার উল্টেপাল্টে তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে একটা সময়। সাত বছর এগারো মাস আট দিন।

মানুষ যেমন

জনমঅন্ধ ছেলেটা একই জায়গায় বসে থাকে দিনভর। ওই যে ভাঙাচোরা প্ল্যাটফর্মখানা, তার গায়ে ওই যে গরীবমতন স্টেশনচাতাল, তার কোলে ওই যে কংকালসার গোটা তিনেক সিঁড়ি, তারই একেবারে শেষ ধাপিতে কোণাটুকুন জায়গা নিয়ে বসে থাকে হাঁটু মুড়ে। হাড়লিকলিক হ্যাংলাপাঁনা চেহারা, গায়ের রঙ সবজে বরণ, একমাথা রুখাশুখা চুল। জন্মকালে নাম ছিল বারীন না হারীন কি যেন একটা। তা সে নামে এখন নিজের ঠাকুমাও ডাকে না তাকে। নামটা ভারী অপয়া যে। নাম দেওয়ার পরপরই হঠাৎ একদিন আলটপকা জ্বরে মরে গেল ছেলের বাপটা। তারপর ক'টা বছর না যেতে, সেই যখন সবে বুলি ফুটছে তার ঠোঁটে, তখন একদিন দুম করে পালাল তার মা'টাও। দালালপুর হাটের এক কাপড় ব্যাপারীর সঙ্গে। সেই থেকে বুড়ি ঠাকুমাই অন্ধের যষ্টি হয়ে আছে। আর আছে রেবতী বৈরাগী। যার কাছে মনপ্রাণের সব কথা উজাড় করে দেয় বালক। অন্ধকার চোখ অন্ধকারে ভাসিয়ে রোজ একবার সাঁঝবেলায় প্রশ্ন করে,— আজ তার দেখা পেলে গো? ও ঠাকুর?

রেবতী বৈরাগী তখন হয়ত সবে এসে বসেছে তাদের দাওয়ায়। প্রশ্ন শুনে রোজ একবার তার ডানামেলা চোখদুটো দুঃখব্যথায় ঝটফট করে ওঠে। ছেলেটাকে মিথ্যে বলতে প্রাণ চায় না। আবার সত্যি বলতেও হৃদয় কাঁদে। ভাঙা স্বরে উত্তর দেয়,—পেলাম গো বটে।

—কি দেখলে?

—আজ দেখি সে পদ্ম হয়ে ফুটে আছে। হরিণদীঘির জলে।

কোনওদিন বলে,—গাঙের জলে ঢেউ হয়ে দুলছিল আজ। যেই না জোয়ার এল...

—আমার কথা বললে তাকে?

—বলিনি আবার। দেখা হতেই বললাম ছেলে তোমার পথ চেয়ে আছে গো বৌঠান। একবার গিয়ে দেখে এস তাকে। বললে, যাব গো যাব। তাকে ছেড়ে থাকতে আমারও কি মন কাঁদে না!

—বললে এ কথা! অন্ধ ছেলের চোখদুটো টিপটিপ করে ওঠে। ছাইবরণ দুই মণি ওড়াউড়ি করে খাঁচাবন্দী পাখির মতো,—কবে সে আসবে!

—আসবে। আসবে। না এসে যাবে কোথায়। মায়ার ফাঁদে পৃথিবীটাই ধরা পড়ে আছে যে। রেবতী বৈরাগী ছেলেটার মাথায় হাত রেখে কথা ঘোরাতে চায়,—এসো, আজ নতুন গান শেখাই তোমাকে।

ছেলেটার চোখ তবু ছটফট করে মরে। ঘরবিবাগী বৈরাগীরও চোখ জ্বালা করে তাই দেখে। এমন একটা ছেলে ফেলে কি করে যে পালায় মানুষ। ভাবতে ভাবতে ধরাগলায় গান ধরে,

—ও সুখ কোথায় উড়ে যাস্,
নিজের বুকে খোঁজ করে দ্যাখ...

হেঁসেল থেকে ছেলের ঠাকুমা ডাকে,—ও শতদল, শতুরে, ভাত বেড়েছি। খাবি আয়।

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। বারীন নয়, সুরেন নয়, ছেলের এখন নাম হয়েছে শতদল। বৈরাগী ঠাকুরই নতুন করে রেখেছে সে নাম। শতদল থেকে শত, শতু।

তা ছেলেটা শতদলের মতই ফুটে থাকে বটে। সারাটা দিন। অমন একটা ভাঙাফাটা ইটবালির জমিনটাতেও। বসে থাকে একভাবে। কানের কাছে যখন তখন ভ্যানরিক্সা ভেঁপু বাজায়, মানুষজন কিচমিচ করে, হঠাৎ হঠাৎ কান ফাটিয়ে ডাক ছাড়ে আপ ডাউনের ট্রেনগাড়িগুলো। স্টেশনের ভেতর থেকে।

ভাঙা সিঁড়ির একটু তফাতে, এক ফালি মেঠো ভূমিতে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ পিপুল। শাখাপ্রশাখা তার এই যদি ছায়া পাঠাল, তো এই ঝনঝন রোদ। অন্ধ বালক সেই রোদ-ছায়াতেই বসে থাকে একলা মনে। বসে থাকে আর সুরের মনে সুর ভাসায় ধুলো বাতাসে। আহা, কী ভাব সে সব গানে! যেমন তার কলি, তেমনি হৃদয়ের তারছেঁড়া সুর। অংশুপতি কুণ্ডুর মতো ঘোর বিষয়ী মানুষটারও বুক কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। বুকের দোলায় গোটা অঙ্গ দুলতে থাকে। তালপাতার পাখা থেমে যায় হাতের মুঠিতে। দাঁড়িপাল্লার আড়াল থেকে কখনও-বা হাঁক দিয়ে ওঠে,

—আরেকবার ধর দিকিনি সুরটা। ওরে ও শতদল...

অন্ধ ছেলে থমকায় দু'এক পালক। পোঁটলায় বাঁধা পান্তার বাটিখানা হয়ত-বা খুলতে গিয়েও সরিয়ে রাখে পাশে,—কোন্ গানটার কথা বলছে গো জ্যাঠা?

—আরে এই তো গাইলি একটু আগে।

—ও। থমকানো মুখে হাসি ফোটে ধীরে ধীরে। ফুল ফোটার মতো। সরু গলার লম্বা শিরাদুটো নেচে ওঠে সেই সঙ্গে,

—বুকের গাঙে আসছে তুফান,
ও মন নৌকো বাঁধবি চল্...

আহা হা হা। রেবতী বৈরাগী এক একখানা গানও বাঁধে বটে। ও মন নৌকো বাঁধবি চল্। অংশুপতি মাথা দোলায়। ছন্নছাড়া বৈরাগীটা নিজেই যেন এক সুরের আকর। নিজের তালে গান বাঁধে, নিজেই সুর বোনে তাতে। তারপর সে গান যত্ন করে বিছিয়ে দেয় কানা ছেলের কণ্ঠে। অংশুপতির বুকের মাঝখানটা কেমন গুড়গুড় করতে থাকে। কোনওদিন পাল্লায় মাল তুলে বাটখারা দিতে ভুলে যায়, বাটখারা চাপায় তো মালের কথা মনে থাকে না। খদ্দের তাগাদা দেয়,

—কি হল কুণ্ডুর পো, মাল মাপো।

অংশুপতি সম্বিতে ফেরে ঝটপট। খদ্দেরের হাতে মাল দেবার সময় সে তিনবার করে পয়সা গুনে নেয়। ভাবের ঝোঁকেও বিষয়বুদ্ধি হারায় না কখনও। খদ্দেরের শিশি থেকে গড়িয়ে আসা তেলটুকুও কাঁচিয়ে তোলে নিজের তেলের টিনে। বাইরে সাইনবোর্ডে খড়িমাটি দিয়ে লিখে রেখেছে,—আজ নগদ, কাল ধার।

তা এ হেন অংশুপতিকে কাজ ভোলায় আরেকজনও। সে হল গিয়ে রাজকুমারী। উঁহু, রাজার কন্যে নয়, একেবারেই আধবুড়ি, আধপাগলী মেয়েমানুষ একটা। থাকে নাকি সেই গঞ্জের বাজারের পিছনদিকে। দু'হাত সমান এক হোগলার চালার নীচে। একসময় নাকি বাঁধা ঘর ছিল তার মহকুমা শহরে। নিত্যদিন খদ্দের আসত সেখানে। বড় বড় চাঁই সব। দারোগা, মহাজন, আড়তদার। সন্ধে নামলেই ঘরের বাতি জ্বালিয়ে, সেজেগুজে শুধু বসে থাকো রানির মতো, আর রাত পোহালে পয়সা গুনে বাক্সে তোলো। সে সব ভরা বাক্সগুলো কি করে যে শূন্য হয়ে গেল একে একে! রোগেই গেল সে সব! নাকি ভোগে! না রাজকুমারী অতশত ভাবতে পারে না আজকাল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও তার বুড়িয়ে গেছে একেবারে। হ্যাঁ। রোগে একটা তাকে ধরেছিল বটে। কবে যেন ধরেছিল? কত যুগ আগে? কে জানে! তখন থেকেই বুঝি মানুষ আসা বন্ধ হয়েছে তার ঘরে। কোন্ মানুষটাই-বা অমন কালরোগ দিয়ে গেল শরীরে? মাছের বাজারের আড়তদার? নাকি গাঙপারের সেই ফর্সাপানা মহাজন? নাকি গঞ্জের বাজারের সব্‌জিঅলাগুলো? নাকি আর কেউ? রাজকুমারী জানে না সে সব। দুনিয়ার মানুষের মুখ কবে

থেকে সব এক রকম হয়ে গেছে তার কাছে। শুধু একটা মুখ ছাড়া। তাও কেমন ঝাপসামতন। সেই যে, যার নাম ছিল অষ্ট। অষ্ট না বিষ্টু? নাহ্, তার নামটাও আর ঠিক ঠিক মনে নেই রাজকুমারীর। মনে আছে একটা শুধু মুখের আদল। লম্বাপানা। বড় বড় চোখ। মহকুমার গলিটাতে এক বুড়ি মেয়েমানুষের কাছে রেখে দিয়ে মুখটা তাকে বলেছিল,—ভয় নেই রে কুসমি। মাসির কাছে টুকুনখানিক থাক। আমি এই গেছি আর এসছি।

নাম তার মনে নেই, মুখ আবছা, শেষ কথাকটাই শুধু স্পষ্ট আজও আধাপাগল মেয়েমানুষটার কাছে। কথাকটা মনে পড়লেই বুক কেমন হু হু করতে থাকে এতদিন পরেও। গলগলিয়ে কান্না আসে কুসমির। থুড়ি। কুসমি না, রাজকুমারীর। কান্না ক্রমে গান হয়ে যায় গলায়। মেয়েমানুষটা তখন কাঠির মত শরীর দুলিয়ে নিজেকেই যেন ভেংচায়,

—নাগর আমার কাঁচা পিরীত
পাকতে দিল না,
সে আসবে বলে কথা দিয়েও
কেন এল না...

অংশুপতি কুণ্ডু অবশ্য এত বৃত্তান্ত জানে না কিছুই। যেমন জানে না চায়ের দোকানী হারু পাত্র কিম্বা ভ্যানরিক্সাঅলা বংশী বিশুর দল। মেয়েছেলেটাকে নিয়ে বিনিপয়সায় মজা লোটে তারা সকলেই। যখন তখন, যেমন খুশি কোন একটা স্টেশনে নেমে পড়ে রাজকুমারী। নামলেই হল আর কি। এত্তটুকুন হাকুচ কালো ক্ষয়াটে শরীর। খসখসে খড়িওঠা গায়ের চামড়া। মাথার চুল সন্নিসীদের জটার মতো। তাতে আবার পুরোন এক টুকরো লাল ফিতের ফুল। কবেকার এক রঙজ্বলা ডেক্রন শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরে। তোবড়ানো গালে লাল রঙ মাখে। ঠোঁট রাঙায় তেলাকুচোর ফল দিয়ে। কোটরবসা চোখে ধ্যাবড়া করে কাজল টানে। কাজল টানে, নাকি চোখ দুটো অমনিই মসী লেপা! অবশ্য ওইটুকুনি না সাজলে লোকে দু'দণ্ড তাকাবে কেন তার দিকে? না সাজলে নাচ জমবে কিভাবে? না নাচলে পয়সা নেই। পয়সা না পেলে...। ভাবতে গেলেই পেটের নাড়িগুলো ক্ষিধেতে দাপাদাপি করতে থাকে রাজকুমারীর। হুটপাট বেরিয়ে পড়ে ধুলোকাদামাখা ঝুপড়ি থেকে। এরপর এখান থেকে সেখান যায়। এ স্টেশন থেকে ও স্টেশন। পেটে যেদিন দানাপানি পড়ল দুটো, তো সেদিন সেই মুখটাকেই খুঁজে মরে ঘোলাটে চোখে। আজও। এতকাল পরেও। অভ্যেস।

লোকে শুধোয়,—কি দেখিস রে মুখের দিকে আমার? ফ্যালফ্যাল করে? বুড়ো ভেড়ার মতো হলদেটে চোখের মণিদুটো তখন চিকচিক করতে থাকে,

—তোরেই খুঁজি নাগর আমার,
জেবন গেল তোরেই খুঁজে...

বলেই নাচতে শুরু করে। ডানহাতে কাপড়টাকে ঘাগরার মত ফুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে।

তবে তেমনভাবে আর নাচতে পারে কটা দিনই বা! উপোসী পেটে নাচ জমে না যে! নাচতে গেলে হাঁপিয়ে পড়ে। কালোকুলো শরীরটা হাঁপায় তখন হাপরের মত। ক্ষিধেতে চোখ ঝিম্ মেরে আসে।

—এবার একটা ডবলরুটি দাও। দাও নাগো!

অংশুপতি হ্যা হ্যা হাসে তাই দেখে,—দেব। দেব। তার আগে আরেকখানা নাচ দেখা। সেই যে রে সেই নাচটা...

হারু চেঁচায় চায়ের দোকান থেকে,—রুটি কি মাগ্‌না আসে? অ্যাঁ? নাচ হক। চা'ও দেব তাহলে।

বংশী দূর থেকে সিটি বাজায়,—নাচ মেরি জান্, ফটাফট্...

নিত্য অংশুপতিকে চোখ টেপে,—মাগীর সাজের বাহার কেমন দিনকে দিন খুলছে দেখেছ অংশুদা? কপালে আবার কাচপোকা টিপ সেঁটেছে।

—মানায় নি? বলো নাগো। রাজকুমারী কোমরখানা বেঁকাতে গিয়েও পারে না। মাজা খচখচ করে ওঠে। দিনভর কোথার থেকে যে কোথায় হেঁটে মরতে হয়। হাঁটাই সার। আজকালকার মানুষজন বড় সেয়ানা। দুদণ্ড দাঁড়িয়ে নাচ দেখে বটে অনেকেই, তারপর পেছন ঘুরে টিপ্পনী কেটে চলে যায় যে যার মত। হাত উল্টে আধ্‌লাটাও দিতে চায় না ঝট করে।

অংশুপতি কুণ্ডুই শুধু দিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে। নাচ দেখে মনটা খুশি হলেই দরাজ গলায় দোকানের ছোকরাটাকে বলে,

—দে। দিয়ে দে কোয়ার্টার একখানা।

—সঙ্গে তবে ভেলিগুড় দাও টুকুনখানিক। রাজকুমারী আঁকা ভুরু এদিক ওদিক ওড়াবার চেষ্টা করে। ঠিক ঠিক আর ওড়ে না। কেমন ভাঁজ পড়ে। রঙমাখা গাল তুবড়ে মুবড়ে ঢুকে যায় মুখগহ্বরে।

এসব দেখেই অংশুপতির রসেবশে দিন কাটে। কারবারের ফাঁকে ফাঁকে মাপমতো রস টেনে নেয় বুকে। রস নিয়ে খেলা করে। আর মাঝে মাঝে দোকানের ছেলেটাকে ধমকে ওঠে,—ঠিকভাবে মাপ্। ঠিকভাবে মাপ্। আহ্, অতখানি চিনি ফেলে দিলি!

সকাল গড়িয়ে দুপুর আসে। দুপুর গেলে বিকেল। তখনও হয়ত বসে বসে গান গেয়ে চলেছে অন্ধ শতদল। ঠাকুমাবুড়িটা তাকে নিতে আসে তারও পরে।

একেবারে সেই সাঁঝের মুখে। ঘরের মানুষ ঘরে ফেরে যখন। স্টেশন বাতিরা টিপটিপ জ্বলে ওঠে। স্টেশনের ওপারে সন্ধ্যাবাজার বসে। লাইন পারের চোলাইখানায় আসর জমতে শুরু করে।

ঠাকুমাবুড়ি এসে নাতি তোলার আগে পয়সা তোলে। পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, বিশ, পঁচিশ। কোনওদিন পাঁচ ছ টাকা অব্দি পৌঁছে যায়। তবে তা কোনও কোনও দিনই। যেসব দিনে হাট বসে দালালপুরে, বড় বড় ব্যাপারী আসে, সে সব দিনে। বাকি দিন দুই আড়াই তিন মেরে কেটে চার। গুনে গুনে পয়সা তুলে বুড়ি আঁচলে বাঁধে। সেই আঁচলে ঘাম মুছে নেয় নাতির মুখের। সোহাগমাখা গলায় বলে,

—ও দাদু, পান্তাটুকুন সব খেয়েছিলি তো?

জিজ্ঞেস করার কারণও আছে। অংশুপতির মুখে শুনেছে নাতি নাকি প্রায়ই তার পান্তার ভাগ দেয় আধবুড়ি বেবুশ্যেটাকে। মাসি-বোনপো হয়েছে নাকি দুজনে। ঘুরে ফিরে তাই রোজই এক প্রশ্ন করে।

শান্ত নাতি ঘাড় নাড়ে। ডবকা মতন টিফিন বাটিটা হাতড়ে হাতড়ে তুলে নেয় বগলের কাছে। হলুদ ছোপ দাঁতে হাসি ফোটে,

—কাল আমাকে বাদামনাড়ু কিনে দিবি দুটো?

—কেন?

—রাজকুমারী মাসিকে দোব।

—খবরদার। বুড়ি ঝনঝনিয়ে ওঠে,—তোকে না বারণ করিছি তার সঙ্গে কথা বলতে?

নাতি তবু বলে,—মাসি বড় ভাল গায় রে ঠাক্‌মা। হ্যাঁরে।

—গাক গিয়ে। আর মা মাসি পাতাতে হবে নি। অনেক মা মাসি দেখলাম!

ছেলেটা তখন চুপ মেরে যায়। মুখখানা থমথম করে ওঠে।

ঠাকুমাবুড়ি আদর করে কাছে টানে তখন,—চল্, তোকে কাঠি আশ্‌কিম্ কিনে দোব চল্।

কোনওদিন বলে,—তোর জন্য কেমন কুচো চিংড়ির ঝোল রেঁদে রেখেছি দেকবি চল্। আর গরম গরম ভাত।

ঠাকুমার কাঁধে হাত রেখে নাতি উঠে পড়ে একসময়। পা ঘসে ঘসে এগোয় মেঠো পথ ধরে। যত দূর চোখ যায়, দু-ধারে শুধু ধানভূমি আর খোলা আকাশ আর ছড়িয়ে থাকা গাছগাছালি। সে সব পেরিয়ে মাইল দেড়েক হাঁটলে তবে দুধকুমড়ো গাঁ। গাঁয়ের পুব কোণে বুড়ির ছোটখাটো ভিটে। রেবতী বৈরাগীর চালা তার কিছুটা আগে। গাঁয়ের একটু বাইরে। একেবারে ফাঁকা ধানবাদার মধ্যিখানে। যেতে যেতে ঠাকুমা নাতি ক্ষণিক দাঁড়াবে বৈরাগীর দুয়োর ধারে। দাঁড়াবেই।

—ও বোরেগীঠাকুর, ঘরে ফিরেছ নাকি?

বৈরাগী এক ছুটে দালান ধারে এসে দাঁড়াবে সেসময়,

—এসেছি ভাই শতদল। এই তো এলাম।

—কদ্দুর গিয়েছিলে গো আজ?

—সে অনেক দূর। নদী পেরিয়ে, নৌকো বেয়ে সোনাবাঁধ। সেখান থেকে গাঁজির গা, ইচ্ছেপুর...

বুড়ি হিসেবী প্রশ্ন তুলবে,—কত মিলল?

—এই মিলল। প্রাণ পাখিটার পেট ভরাতে যত্টুকুন খুঁদ লাগে আর কি। বুড়ি সাবধানে চারদিক দেখে নেবে তখন। না, ধারে কাছে কেউ তেমন নেই। ভাঙা ঘরের চাল উড়িয়ে উদোম বাতাস ঘুরছে শুধু। সেই বাতাসে স্বর মিলিয়ে প্রায়দিনই ফিসফিস করে উঠবে বুড়ির গলা,—শতু আজ মোটে দু'টাকা রোজগার করেছে গো ঠাকুর। দুমুঠ চাল যদি ধার দাও...

বৈরাগী নির্মল হাসবে তখন। তার চাল বিনা বুড়ির যেন জল ফোটে না। হাসতে হাসতে বলবে,—ঘরে যাও গো মাসি। আমি আসছি।

শতদল এত কথা শুনেও শোনে না যেন। বৈরাগীকে দেখলেই মন তার ডানা ঝাপটাতে শুরু করে দেয়। আজও কি তার মাকে দেখতে পেয়েছে ঠাকুর? কি হয়েছিল আজ মা? সোনাবাঁধের মাছরাঙা? না গাজিপুরের রোদ্দুর? ভাবতে ভাবতে আঁধারনামা আকাশে পাঠিয়ে দেবে জ্যোতিহীন চোখদুটোকে। তারারা তখনও সব ফুটেছে, কি ফোটে নি। ঝিম ঝিম বাতাস দুলছে নিম সজনের ডালে। পৃথিবীর চোখে ঘুম নামছে। সেই তন্দ্রা তন্দ্রা ভাবটুকু ছিঁড়ে তখনই হয়ত হঠাৎ উড়ে যাবে কোন একলা পাখি। ঘরে ফিরতে দেরি হয়ে গেছে যার। পাখিটাকে শতদল দেখতে পাবে না। শুধু শুনবে তার ডানার শব্দ। শব্দটুকু বুকে নিয়ে ঘরে ফিরবে চুপচাপ। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে নিঝুম বসে থাকবে। অপেক্ষা করবে আরেকটা শব্দের। বৈরাগী ঠাকুরের পায়ের শব্দ।

তারও পরে, রাত আরও গভীর হলে, অংশুপতি কুণ্ডু ঘরে ফেরার পথে রোজ একবার শুনতে পাবে দুই গায়কের গলা। গায়ক নয়, দুই ভাবের ভাবুক ভাবের রসে মজে আছে। যেদিন অংশুপতি লাইনের ধার থেকে দুএক পাত্র চড়িয়ে আসে গলায়, সেদিন একবার করে দাঁড়ায় শতদলের ঘরের সামনে। মাতাল গলায় সুর আনতে চেষ্টা করে। পারে না। রাত গড়িয়ে চলে।

দিন তো আসে রোজই। নিয়ম করে। রোজই চলে যায়। তবু তার মধ্যেও

এক একটা দিন কেমন অন্যরকম হয়ে যায়। আচমকাই। আচমকা আশ্চর্য কোনও ঘটনা ঘটে যায় এক একদিন। যেমন আজই হল। কাজ ভুলে অংশুপতি হতবাক চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। কথা ফুটল তারও অনেক পরে,

—তুমি নয়ন বৌঠান না!

—চিনতে পেরেছে তাহলে? নয়নতারা আলগাভাবে ঘোমটা সরাল কপাল থেকে। একমাথা মেটে সিঁদুরে জ্বলজ্বল করছে সিঁথি। টকটকে লাল এতখানি চাকতি টিপ কপালে। প্রথমটা চিনে উঠতে অসুবিধে হয় বইকি। কি ছিল কি হয়েছে এই ক'বছরে। ক' বছর যেন? চার? না ছয়? সেই রোগাভোগা চেহারাই আর নেই নয়নতারার। ভরাট স্বাস্থ্যে টসটস করছে শরীর। গায়ের রঙ ফর্সা আগের থেকে। দেখলেই বোঝা যায় দিব্যি-সচ্ছলতায় আছে। থাকবে নাই-বা কেন? নতুন সোয়ামি দোকান দিয়েছে মহকুমা শহরে। হাটে ঘাটে আর ঘুরে বেড়ায় না। শাড়ি ধুতির সঙ্গে জামাপ্যাণ্টের কাপড়ও নাকি রাখছে আজকাল দোকানে।

এত খবর অংশুপতি পায় গঞ্জের নটবর হাজরার কাছ থেকে। নিজের দোকানের মাল তুলতে গিয়ে। তার কাছেই শোনা নয়নতারা নাকি আরও দুটো ছেলের মা'ও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তারা কেউই কানা খোঁড়া নয়।

কথাটা মনে পড়তেই অংশুপতি আড়চোখে একবার দেখে নিল সিঁড়িতে বসা দুঃখী ছেলেটাকে। দড়িবাঁধা সস্তা দামের একটা প্যাণ্টুলুন মাত্র পরনে। খোলা গায়ে প্রকট বুকের খাঁচা। তেলবিহীন চুল রুক্ষ্ম, কাঙাল। অংশুপতির দুই ভুরু জড়ো হল,

—এতদিন পর এদিকে কি মনে করে?

কেউ যেন শুনতে না পায় এমনভাবে ফিসফিস করল নয়নতারা,

—ওদিক পানে আসো তো বলি।

ভরাবেলায় দোকানে এখন খদ্দের গজগজ। এ যদি চাল চাইছে তো ও চাইছে কেরাসিন তেল। দোকান ছেড়ে ওঠা মুশকিল। অংশুপতি তবু ঝপ করে না বলতে পারল না। কৌতূহল হামা টানছে মাথায়। নিচু স্বরে বলল,—ঠিক আছে! বোসো একটু।

ডাউনে গাড়ি ঢুকছে স্টেশনে। ভোঁ বাজিয়ে ছেড়েও গেল। নয়নতারা সরে দাঁড়াল একধারে। চওড়াপেড়ে তাঁত শাড়িতে আরও ভাল করে ঢেকে নিল মুখ যেন কেউ চিনে না ফেলে। ভিড় একটু কমতে মেঠো পথের দিকে গেল দু'চার পা। কি ভেবে ফিরল আবার। স্থির হয়ে কয়েক পলক দেখল অভাগা ছেলেটাকে। এগোতে গিয়েও এগোল না। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে অস্থির চোখে অংশুপতিকে

দেখল। অংশুপতিও আড়েঠারে দেখে নিচ্ছে মেয়েমানুষটাকে। কি মতলবে এসেছে এখানে? এতদিন পর? ট্রেন থেকে নেমে ছেলের সঙ্গেই কথা বলছিল প্রথমে। কি বলেছে কে জানে! ছেলেটা গান টান থামিয়ে বসে আছে তখন থেকেই। শূন্য চোখে কি যেন ভাবছে। অন্ধ চোখে মনের ভাষাও ছাই ফোটে না।

অংশুপতি ক্রমে অধৈর্য হল। নয়নতারা ফের যাচ্ছে ছেলের দিকে। অংশুপতি এক লাফে নেমে এল দোকান থেকে। একেবারে নয়নতারার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে,

—কি বলতে চাও চটপট বলে ফ্যালো।

আশপাশের লোকজনের কৌতুহলী দৃষ্টি দুজনের দিকে। তবে নয়নতারাকে দেখলেও ঝপ করে চিনতে পারবে না কেউ। দুধকুমড়োর মানুষও এদিকে এখন নেই বিশেষ। তবু নয়নতারা ঘোমটা সরাল না একটুও। কালামুখ দেখাতে বুঝি লজ্জা পাচ্ছে। কাপড়ের ফাঁক দিয়ে মৃদু গলায় বলল,—ছেলেটাকে নিয়ে যেতে এসেছি ঠাকুরপো।

দুধকুমড়োর অংশুপতি চকিতে গোটা গাঁয়ের মাতব্বর হয়ে গেল যেন। কড়া গলায় জেরা শুরু করল,—কেন?

—বারে, নিজের ছেলেকে নিজে নিয়ে যাব...

—না। অংশুপতির গলা কঠিন হল আরও,—কিসের ছেলে তোমার? কে ছেলে? ফেলে পালানোর সময় মনে ছিল না?

নয়নতারা মাথা নামাল।

—দ্যাখো বাপু, এতদিন পর তোমার এখানে আসা ঠিক হয়নি। তোমার শাশুড়ি জানলে পরে...বলেই খেয়াল হল আরে, নয়নতারা তো বিয়ে করেছে ফের। আগের শ্বশুরঘর ত্যাগ করে। বিধবা কপালে সিঁদুর এঁকে...কথাটাকে গপ করে গিলে নিল অংশুপতি,—মানে তোমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই তার বুঝলে। কেউ না দেখুক, আমরা তো দেখেছি অন্ধ ছেলেটাকে কী কষ্টেই না মানুষ করছে বুড়িটা। কত দুঃখে, শোকে-তাপে...

সহসা নয়নতারা কেঁদে উঠল ফোঁচ ফোঁচ করে। কাঁদতে কাঁদতে অংশুপতির পায়ের গোড়ায় পড়ে যায় আর কি!

অংশুপতি সামান্য নরম হল,—ফোঁপানোর কি আছে? যাও না ছেলেকে গিয়ে বলে দ্যাখো...সে যদি নিজে থেকে যেতে চায়...

—তুমি একটু তাকে বলে দাও তবে। নয়নতারা নাক টানল,—বলে দাও যে আমিই তার মা।

—আমি কেন? তুমি তাকে বলো নি?

—বলেছিলাম। ঘোমটা দিয়ে চোখ মুছল নয়নতারা,—কতবার করে বললাম। সে মোটে বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে মা নাকি তার পাখি হয়ে বাসা বেঁধে আছে ইচ্ছেপুরের কোন শিমূল ডালে। বলতে বলতে আবার ঝুঁকেছে,—তোমার পায়ে পড়ি ঠাকুরপো, তুমি বললে সে বিশ্বাস করবে।

অংশুপতি কয়েক পা পিছোল এবার। বিষয়বুদ্ধি চিড়িক চিড়িক করে যেন টোকা দিচ্ছে মাথায়! ভেবে নিতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগল না। বুড়িটার সঙ্গে একটু বেইমানি করা হয়, তা হোক। এ সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আর এমন কিই-বা বেইমানি? মা যদি সত্যি সত্যি ছেলে নিতে আসে, তাহলে তাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই তো ধর্মের কাজ। ছেলেটাও কবে থেকে পথ চেয়ে বসে আছে। তা বলে মা যে অন্যায়টা করেছে তার মাশুল দেবে না? মূল্য ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না দুনিয়ায়। অংশুপতি গলার সঙ্গে বিবেকটাকেও ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিল,

—বলতে পারি ; তার বদলে কিছু টাকা দিতে হবে।

প্রস্তাবটার জন্য আদৌ তৈরী ছিল না নয়নতারা। হুট করে তাই উত্তর করতে পারল না কোন। ঘোমটার জন্য মুখের ভাবও তার বোঝা যাচ্ছে না। অংশুপতি আরও ভাল করে গলা ঝাড়ল,

—ভাবো। ভেবে দ্যাখো। আমি ছাড়া এ চত্বরে আর কেউ চেনে না তোমাকে। তোমার নিজের পেটের ছেলেও না। যারা চেনে তাদের কাছে যদি যেতে চাও, যেতে পারো। দ্যাখো গিয়ে গাঁয়ে, তারা যদি তোমায় পুজোআচ্চা করে ছেলে কোলে তুলে দেয়...

অংশুপতি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঘোমটার দিকে। ঘোমটা? না ফাৎনা? নড়ে না, চড়ে না। অংশুপতির চোখ জ্বলজ্বল করছে আশায়। শেষে ফাৎনা ডুবল,

—কত দিতে হবে?

অংশুপতি ঢোঁক গিলল,—পাঁচশো।

—পাঁআআচ শো? নয়নতারার গলা কেঁপে গেল।

—ঠিক আছে। অন্তত তিনশো দাও...

নয়নতারা মাথা দোলাল। খুব বেশি চিন্তার অবকাশ নেই। আজ সে ছেলে নিয়ে যেতেই এসেছে। এ কটা বছর গুমরে গুমরে মরেছে শুধু। সাহস করে আসতে পারে নি কিছুতেই। শেষে ঘরের মানুষটা ভরসা দিতে...। ডান হাতে ঘোমটা ধরে অংশুপতির দিকে সোজাসুজি তাকাল,—অত তো কাছে নেই।

—কত আছে?

—কত আর। এই পঞ্চাশ মতন।

—মাত্র? তোমার তো এখন রমরমা অবস্থা। অংশুপতি ঠোঁট বেঁকাল,—অত কমে হবে না। ছেলে ফেরত নেবে...পাপ কাজ করাবে আমাকে দিয়ে...

—ঠিক আছে। নয়নতারার মুখ ঘুরল অন্ধ ছেলের দিকে,—দুচার দিন পরে এসে বাকিটা দিয়ে যাব।

—তাহলে তখনই ছেলে নিয়ে যেও। দোকানের সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল অংশুপতি,—মনে রেখো, এখান থেকে ছেলে নিয়ে যেতে হলে ওই তিনশোই শেষ কথা।

নয়নতারা তবুও নিথর দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগল স্টেশনের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। উবু হয়ে বসে খানিক আদর করল ছেলেকে। নিচু গলায় বললও কিছু। তারপর আশপাশের লোকের চোখ বাঁচিয়ে পঞ্চাশ টাকার নোটখানা গুঁজে দিল ছেলের ছেঁড়া কাঁথার নীচে।

সাঁঝবেলাতে নাতিকে নিতে এসে হাউমাউ করে উঠল ঠাকুমাবুড়ি,—ওরে ও অংশুপতি...অংশুপতি রে...দেখে যা কি সব্বোনাশ হয়েছে।

অংশুপতি দোকান থেকে নিতান্ত নিরীহ মুখে নেমে এল,—কি হয়েছে মাসি? চিল্লাচ্ছ কেন?

—চিল্লোব না? এই দ্যাখ্ কি হয়েছে। শতু বলছে তার মা হারামজাদী আজ নাকি এস্ছিল। এই দ্যাখ্, গোটা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে গেছে তাকে।

—তাই নাকি? অংশুপতি আরও অবাক ভাব আনল মুখে—কখন এসেছিল? কই, আমার চোখে তো পড়েনি।

—আমি দেখেছি। আমি। হরু দমকা হাওয়ার মত চিৎকার করে উঠল চা-দোকান থেকে,—তুমিও তো কতক্ষণ গুজ গুজ করলে তার সঙ্গে।

—তুই চুপ কর্ তো। অংশুপতি জোরে ধমকে উঠল,—সে কেন শতুর মা হতে যাবে? তাকে তো আমি চিনি। সে হল ওই দালালপুরের মণ্ডলদের নতুন বউ। ওর দাদা ছিল আমার ন্যাংটোবেলার বন্ধু।

—হ্যাঁ গো মাসি। বংশী সায় দিল,—খুব বড়লোকের বউ বলে মনে হল।

—ওমা গো? বুড়ি কপালে তুলল চোখ,—সেই এত বড় টাকাটা দিয়ে গেল শতুকে! কেন দিল!

—কেন আবার। মায়া জেগেছে বোধহয়। তোমার নাতিকে দেখলে কার না

মায়া জাগবে। নিখুঁত অভিনয়ে দিব্যি বুড়িকে ভুলিয়ে ফেলল অংশুপতি। ধুলো ছিটোল আর পাঁচটা চোখেও। সঙ্গে সঙ্গে মনে আফশোসও আসছে বড়। তার চোখ এড়িয়ে নয়নতারা কখন চালান করল টাকাটা? শতদলের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। এত কথার মাঝেও চুপ করে বসে আছে ছেলেটা। একসময় ঠাকুমার কাঁধ আঁকড়ে উঠে দাঁড়াল। অন্ধ চোখ দুটো কষ্টব্যথায় ছলছল করছে কি? নাতিঠাকুমা গাঁয়ের পথে অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে অংশুপতি মনে মনে বলল,—মাপ করে দে বাপধন। মন খারাপ করে থাকিস্ না। তোর মনের ইচ্ছে আমিই পূরণ করে দেব। সবুর কর্। আর দুটো দিন সবুর কর্।

হ্যাঁ সবুর করা। এ পৃথিবীতে সবুর তো করছে সবাই। শতদল যদি করে তার মায়ের জন্য, অংশুপতি করে টাকার। শতদলের ঠাকুমা যদি পথ চেয়ে থাকে সুখের, তো রেবতী বৈরাগী দিন গুনছে সুন্দরের। অমন যে ন্যালাক্ষ্যাপা আধবুড়ি বেশ্যাটা, সেও দ্যাখো জীবনভর খুঁজে বেড়ালো সেই নাগরটাকে। অষ্ট, না বিষ্টু যার নাম। আসবে বলে কথা দিয়েও যে আর ফেরে নি কোনওদিন। এভাবেই জীবনের জন্যে প্রতীক্ষা ফুরোলে তবেই কি মৃত্যু আসে? নাকি মৃত্যুতেই শেষ হয় প্রতীক্ষা? কে জানে! একেবারে শেষকালে আধপাগলি রাজকুমারী নাকি দেখা পেয়েছিল সে নাগরের। সত্যি কি পেয়েছিল? ঘটনা যাই হক, গল্পটা কিন্তু মুখে মুখে রটে গেছে অনেকদূর পর্যন্ত। এ স্টেশন থেকে সে স্টেশন। এ গাঁ থেকে সে গাঁ।

হরু বলে,—বুঝলে অংশুদা, আমার এক বন্ধু নিজের চোখে দেখেছে। শম্পানগর ইস্টিশনে দাঁড়িয়ে ছিল রাজকুমারী। বোধহয় এদিকপানেই আসছিল।

—নারে, এদিকপানে নয়। বংশী চোখ ঘোরায়,—শহরের দিকেই যাওয়ার মন ছিল। তা হল কি, একটা এই ছোকরামতন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল অন্যপারে, রেলিঙ্-এর ধারে। একটু বুঝি রোগামতন গড়ন, বড় বড় চোখ। ইচ্ছেপুরের দিকে না কোথায় থাকে। তাকেই দেখে মেয়েছেলেটা...

—ছোকরা মত...? অংশুপতি বারবার জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নটা আবারও ছোঁড়ে ছেলেগুলোর দিকে। হিসেবটা মেলাতে পারে না কিছুতেই। ছোকরাই যদি হবে তবে সে আধবুড়িটার নাগর হয় কি করে?

—ওই তো হল কথা। হরু মাথা নাড়ে,—এই না হলে বল্লে পাগলের বেরেন। পাগল বলেই না ছেলের বয়সী ছেলেটাকে জাপটে ধরল অমন করে। সঙ্গে সেকি কান ফাটানো চিৎকার,—পেয়েছি গো। এতদিনে খুঁজে পেয়েছি।

অংশুপতি বলল,—শুনলাম ছেলেটা নাকি ছাড়িয়েও নিয়েছিল নিজেকে?

নিত্য ফোড়ন কাটে,—সে তো খানিক ধস্তাধস্তির পরে গো। প্রথমটা সেও তো ঘাবড়ে মাবড়ে একসা। বলে,—করো কি মাসি? করো কি? রাজকুমারীর রঙ কাদা সবই নাকি তার শরীরে ল্যাবড়ালেবড়ি তখন।

—এ হে হে।

—এহেই বটে। ছেলেটা তো নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাইন টপকে ওপারে চলে গেছে; রাজকুমারীও তাকে তাড়া করতে করতে একেব্বারে রেললাইনের মধ্যিখানে।

—কিসে কাটা পড়ল? আপে? না ডাউনে?

—আপেই বুঝি।

—না, না, ডাউনের গাড়ি ছিল।

অংশুপতি মুখটাকে করুণ করে,—মেয়েমানুষটা বড় মজা দিত গো এসে। রুটিটা গুড়টা চাইত। বলতে বলতে হয়ত-বা কোন খদ্দেরের কাছ থেকে পয়সা নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সন্ধের মুখে এখন রোজই একবার করে শোকসভা বসছে রাজকুমারীর জন্য। অংশুপতির আমকাঠের তক্তাটাতে এসে জড়ো হয় সকলে। টাটকা টাটকা মারা গেলে মানুষ তাকে স্মরণ করবে না দুটো দিন? টাটকাই তো। *সেই যে সেদিন নয়নতারা এল, তার পরের পরের দিনই তো মরল রাজকুমারী। তারপর আর কটা দিনই বা গেছে! শুক্কুরটা বাদ দিলে শনি রবি সোম তিনদিন।* সভা করতে করতে অংশুপতি মাঝে মাঝে ভাঙা সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে বড় শ্বাস ফেলে। কদিন ধরে শতদলটাও আর আসছে না। *সেই যে সেদিন কানে কানে কি বলে গেলে নয়নতারা, তারপর থেকে ছেলের ধুম্ জ্বর। কালকে দালালপুরের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল রেবতী বৈরাগী। বৈরাগীকে এখন একটু আধটু এড়িয়েই চলছে অংশুপতি। যে যাই বলুক, লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারা যায় না।*

পাঁচজনের পাঁচ কথার মাঝেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে অংশুপতি। নয়নতারা পরদিনই সন্ধের সময় এসেছিল আবার। গোপনে। ওই পিপুল গাছতলায়।

[illegible] ঠাকুরপো। বাকিটা সামনে হপ্তায় দেব।

[illegible] নিয়ে অংশুপতি ট্যাঁকে গুঁজেছে সেই টাকা। ছেলের জ্বরের [illegible] ইচ্ছে করেই বলেনি। বললে আবার কি অনর্থ [illegible] ফেলে চলে যেতে একদিন বুক কাঁপেনি [illegible] কেন এমন উতলা হয় মানুষ! মানুষের

অংশুপতি দোকান ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। নিজের মনটাও কদিন ধরে কেমন যেন তালবেতাল দুলতে শুরু করেছে। কিছুতেই বাগে রাখা যাচ্ছে না। কোমর চেপে অংশুপতি আড় ভাঙল শরীরের। দেখাদেখি হারুও উঠে দাঁড়িয়েছে,

—আরে অংশুদা, আজ এত তাড়াতাড়ি ঝাঁপ নামাচ্ছ?

—ভাল্লাগছে না। অংশুপতি হাই তুলল বড় করে,—গা'টা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—বুঝেছি। এখন বুঝি লাইনের ধারে যাবে?

অংশুপতি জবাব দিল না। কাজের ছোঁড়াটাকে দোকান বন্ধ করতে বলে এগোতে থাকল পায়ে পায়ে। গলাটা সত্যিই সুড়সুড় করতে শুরু করেছে। প্রায় তিনদিন হল একদম গলা ভেজানো হয় নি। কেন যে হয়নি!

গভীর রাতে টইটুম্বুর মাতাল অংশুপতির গলা শোনা গেল মেঠো রাস্তায়। চুরচুর হয়ে ঘরে ফিরছে। যেতে যেতে রেবতী বৈরাগীর দুয়োর ধারে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্ত। আধবোজা চোখে তাকাল অন্ধকার কুঁড়েটার দিকে। বৈরাগী ঠাকুরের সঙ্গে দুটো কথা বলার দরকার। টলমল পা আবার এগোল। শতদলদের বেড়ার ধারে পৌঁছেও কি ভেবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। মাটির দাওয়া থেকে বৈরাগী ঠাকুরের গলা ভেসে আসছে। সেই গলার সঙ্গে তাল রেখে সরসর শব্দ তুলছে খেজুর পাতা। অন্ধকার বহে যাচ্ছে স্রোতের মত। একটু ঝুঁকে অংশুপতি উঁকি দিল ভেতরে। তালপাতার চাটাই-এর ওপর শুয়ে আছে অভাগা ছেলেটা। মাথার ধারে রেবতী বৈরাগী। পায়ের কাছে বুড়ি ঠাকুমা। টিমটিম এক ডেমি জ্বলছে তিনজনার মাঝখানে। ক্ষীণ আলোতে তিনজনই কেমন ছায়া ছায়া।

অংশুপতি দুহাতে চোখ ঘসল। নয়নহীন ছেলে জ্বরে বেহুঁশ। এই বেলা কথাটা সেরে ফেলা যায়। গলা খাঁকারি দিল জোরে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকিয়েছে বৈরাগী,—কে? কে ওখানে?

অংশুপতি পা বাড়াতে গিয়ে মাড়িয়ে ফেলল একখানা শুকনো পাতার স্তূপ। মচমচ শব্দ উঠল,—আমি। আমি বটে। অংশুপতি।

—আরে, আরে, ভেতরে এস।

—নাহ্। ঘরে ফিরছি। তুমি এট্টু বাইরে এস দেখি।

বৈরাগী উঠে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। খানিক তফাতে অংশুপতি। মাঝখানে চাকা চাকা আঁধার। অংশুপতির মাতাল হাত সেই অন্ধকার সরানোর চেষ্টা করল প্রাণপণে,

—সেদিন শতুর মা এসছিল আমার কাছে।

—আস্তে। আস্তে বলো। বৈরাগী নিজেই অন্ধকার ভাঙল,—ওরা শুনতে পাবে।

—পাক্ গে। তাতে আমার কি?

—তোমাকে বলতে হবে না। বৈরাগী মাথা দোলাল,—আমি সব খবর রাখি। নয়ন বৌঠানের সঙ্গে আমার পেরায়ই দেখা হয়।

—তাহলে? অংশুপতির গলা চড়ল সামান্য,—তাহলে ছেলেটাকে মিছে কথা বলো কেন? পদ্ম হয়ে ফুটে আছে...পাখি হয়ে গাছে আছে...গাছে দোলে...দোল দোল..

বলতে বলতে টলে প্রায় পড়ে যাচ্ছে, বৈরাগী তাড়াতাড়ি ধরে ফেলেছে তাকে। নরম চোখে হাসছে,

—ছেলেটাকে মেরে ফেলতে চাও অংশুভাই?

—কেন? মরার কি আছে? মায়ের ছেলে মায়ের কাছে যাবে...

—স্বপ্ন চলে গেলে ছেলেটার আর রইল কি? বৈরাগী একদম নিচু গলায় ফিসফিস করে উঠল,—স্বপ্ন নিয়ে যে ক'দিন বাঁচে মানুষ, সে-কদিনই তো সত্যিকারের বেঁচে থাকা গো।

কথাটা গিয়ে কোথায় যেন ধাক্কা মারছে। নেশা ছুটে যাচ্ছে অংশুপতির। বৈরাগীর হাত ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। অন্ধকার ডিঙিয়ে হাঁটছে থপথপ। কথাটা মন্দ বলে নি বৈরাগী। থাক তবে। নয়নতারাও অপেক্ষায় থাক। ছেলের মত। ছেলের স্বপ্নের মত। টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দিলেই হবে।

সাপুইদের পুকুরপাড় অব্দি গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল পাঁড় মাতাল মানুষটা। জলের গায়ে ওটা কার মুখ? রাজকুমারীর না? ভেসে উঠছে। মিলিয়ে যাচ্ছে। কাল কি হবে কে জানে। তবে এখন হঠাৎ গান আসছে অংশুপতির বুকে। আশ্চর্য! ঘাসের ওপর থেবড়ে বসে মানুষটা হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে,

বুকের গাঙে আসছে তুফান...

গাইতে গাইতে হু হু করে জল নেমেছে ঘোরবিষয়ীর ঘোলাটে চোখ বেয়ে। আকাশ থেকে জলের বুকে ঝুঁকে পড়ে রাতের তারাগুলো মন দিয়ে শুনছে সেই গান।

বিকেল ফুরিয়ে যায়

স্কুল থেকে বেরিয়ে মিনিট পনেরো হাঁটার পর, গলির মুখে এসে দুজন দুদিকে। মানসী, মানে মানি, বাঁয়ে। আমি ডান দিকে। ডান দিকে ঘুরে বাঁ দিক, বাঁ দিক্ ধরে সোজা এক ছুটে বাড়ি।

বাড়ি ঢুকতেই কাঁধের ব্যাগ ছিটকে গেল খাটের ওপর। ভিতর বারান্দার চেয়ারে বসে ঝড়ের গতিতে খোলা হয়ে গেল কালো রঙের ব্যালেরিনা জুতো, নীল বর্ডার দেওয়া নাইলনের মোজা। হুড়দ্দুম করে হাত দুটো খুলে ফেলছে নীল-সাদা ইউনিফর্ম। নীল কাপড়ের বেল্ট মুখ থুবড়ে পড়ল চৌকাঠের পিঠে। খোলার চেয়ে তাড়াতাড়ি পরে নিচ্ছি কুলোর কানঅলা বুলগানিন জামা। মা এসে সামনে দাঁড়ানোর আগেই পুটপুট বোতাম লাগিয়ে ফেলেছি।

—কি হচ্ছেটা কি অপু! এইভাবে জামাকাপড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে! এত বড় একটা ধিঙি মেয়ে...ওঠা, ওঠা সব। পাট করে তুলে রাখ্। হিঁইই, দ্যাখো বেল্টটাকে কেমন ছিটকে ফেলে দিয়েছে! কাল স্কুল যাওয়ার আগে কেঁদে দেখিস, মা আমার বেল্ট পাচ্ছি না...

—অঁঅঁঅ! রতনের মা তুলে রাখবে। আমাকে চটপট খেতে দাও। জলদি! কুইক।

—কেন? কি এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ শুনি?

বলার সময় নেই। একটি শব্দও এখন সময়ের অপচয়। হাতের চঞ্চল আঙুলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে খাবার টেবিলের গায়ে। ঢাকা বাটির বুকে নাক ঝুঁকে পড়ল,—এ কি! মাছ রাখোনি? ভাত খাবো কী দিয়ে?

—কে তোমাকে আজ ভাত দিচ্ছে? চিঁড়ে ভেজানো আছে, দই দিয়ে আম

দিয়ে মেখে খেয়ে নে। কী রে, হাত না ধুয়েই বসে পড়লি যে! তোর কি ঘেন্নাপিত্তিও নেই রে? যা, আগে হাত মুখ ধুয়ে আয়। যা বলছি।

ধমক খেয়ে দম বন্ধ করে দৌড় চানের ঘরে। হাতে পায়ে মুখে এলোপাথাড়ি জল ছিটোতে ছিটোতে মায়ের গলা শুনতে পাচ্ছি,—এখনও এত কীসের খেলার নেশা? বড় হয়ে গেছ, এবার ছুটোছুটি লাফালাফি বন্ধ করো। মেয়েরা বড় হয়ে গেলে এভাবে আর ট্যাং ট্যাং করে নেচে বেড়ায় না। লোকে কী বলবে?

ওফ্! আজকাল সারাক্ষণ ওই একটা কথা। বড় হয়েছো। বড় হয়েছো। মা যে কী না! বড় হয়েছি বলে সব সময় ঘরে বন্দি থাকতে হবে নাকি! কই, দাদার বেলায় তো ওকথা বলতে শুনি না! নাকি ছেলেরা বড় হয় না! মেয়েদের বেলাতেই শুধু যত রাজ্যের সীমা টানা। শরীরে ভাঙচুর। নিয়ম করে লজ্জাজনক কষ্ট পাওয়া। ভাল্লাগে না। বিশ্রী। বিশ্রী। এভাবে মেয়েদেরই কেন শুধু দাগ টেনে বড় করে দেওয়া হয়!

খাবার টেবিলে ফিরে আসার পরও মা'র একঘেয়ে সুর কানের কাছে পোঁ-পোঁ,—আগেকার দিনে তেরো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সব ঘরকন্না করত। আর আমার এই ধাড়ি মেয়েটাকে দ্যাখো...

রোজকার সুর এক কানের পর্দা ভেদ করে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চিরতা খাওয়া মুখে চিঁড়ে দই আম গিলছি।

—ইহ্হ, আজ একটু লুচি করতে পারোনি?

—হ্যাঁআ্যা, রোজ রোজ লুচি। কোনও কাজে হাত লাগানোর নামে নেই, শুধু লম্বা লম্বা হুকুম।

আমের আঁটি পিছনের উঠোনে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাঁ হাতে বালতি থেকে আঁজলা করে জল নিয়ে ধুয়ে নিচ্ছি ডান হাত। ভিজে হাতেই দৌড়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পিছনের গলিতে চক দিয়ে দাগ পড়ে গেছে। এখখুনি শুরু হয়ে যাবে আমাদের লম্বি ধাস্সি খেলা। আমি কি আজও শেষে পৌঁছব? কখ্খনো না। মায়ের চিৎকার তাড়া করে চলেছে পিছনে,—একটা কথাও কানে তোলা হয় না, সাপের পাঁচ পা দেখেছ, না? আজ আসুক তোর বাবা। তোমার হবে।

কথাগুলো ফুসমন্তরে ঠিকরে গেল পাড়ার বাতাসে।

প্রায় প্রতি দিন এভাবেই শুরু হত আমার তেরো বছরের বিকেল। পড়াশুনা, স্কুল, আবার পড়াশুনার ফাঁকে এইটুকু এক রত্তি নিঃশ্বাস নেওয়ার সময়। একেবারে নিজের মত করে বুকভর্তি শ্বাস টানা। এর মধ্যেই বড় জোর কোনওদিন অদলবদল হত খাওয়ার মেনুতে অথবা খেলায়। বড় জোর মায়ের গলায় সুর বদলে যেত

মালকোষ থেকে দরবারীতে, কাফী থেকে ইমনে, ঝিঝিট থেকে খাম্বাজে। তবে ব্যাপারটা ছিল মোটামুটি এই রকমই। বিকেল মানেই গাঢ় হলুদ রং। বিকেল মানেই সোনার পিরিচে সূর্যের আলো ঠিকরোচ্ছে। বিকেল মানেই মোড়ের জামরুল গাছের পাতাগুলো হলুদ মেখে কাঁপছে এলোমেলো। এক কোর্ট থেকে আরেক কোর্টে লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছি। লম্বা দাগের শেষ প্রান্তে পৌঁছে ডাক ছাড়ছি, লম্বিইই...। কখনও এক পায়ে নুন নুন নুন অথবা আব্বা আব্বা আব্বা। দু হাতের ডানা মেলে আমাকে আটকাতে চাইছে বিপরীত দলের খেলুড়েরা। মানসী কিংবা রূপা চেঁচাচ্ছে,—এই অপু, ওদিকটায় ফাঁক আছে, চলে আয়। চলে আয়। বড় বুড়িটা তো আবার কোন দিন আমাকে অপু বলে ডাকতও না। অপরাজিতাও নয়। কী যে খালি চি দিয়ে কথা বলার অভ্যাস ছিল বড় বুড়ির! ডাকতে গেলেই চিঅচিপু, নয়ত চিঅচিপচিরাচিজিচিতা। বাপরে, পারতও বটে। অমন একটা লম্বা নামে আমিও দিব্যি সাড়া দিয়েছি। তখন আসলে নাম নয় ডাক নয়, চোখ বুজে শুধু শেষ ঘরে পৌঁছনোর দিকে মন। যেন ওই ঘরটাতে লুকিয়ে আছে আমার প্রাণভোমরা। খেলা নিয়েই আড়ি ভাব, ঝগড়াঝাঁটি, এমনকি বন্ধুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখিও বন্ধ।

তা সত্যি কি আর আমার প্রাণভোমরা লুকিয়ে ছিল লম্বি ধাস্‌সির কোর্টে? কিংবা বুড়িবসন্তী খেলায়? উঁহু, আমার প্রাণভোমরা তো আসলে ছিল আমার বন্ধুদের হৃদয়ের কুঠুরিতে। সেটা মনেপ্রাণে টের পেলাম চোদ্দবছর বয়সে পৌঁছে।

স্কুলে আমরা চারজন খুব বন্ধু সেই সময়। আমি মানসী, দীপিকা আর অর্চনা। মানি থুড়ি মানসী কাছেই থাকে, সে আমার পাড়ারও বন্ধু। দীপিকা অর্চনা দূরে দূরে। দীপিকা ভবানীপুর, অর্চনা রাসবিহারীতে।

তো একদিন হল কি, ক্লাস এইটের হাফইয়ার্লি পরীক্ষার ঠিক আগে হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই পর পর পাঁচ দিন স্কুলে এল না দীপিকা। আমরা ভেবে আকুল। শেষে ঠিক করলাম ওর বাড়িতেই খোঁজ করতে যাব। বিকেলবেলা তিনজনে মিলে ট্রামে তো উঠে পড়লাম, ঠিক ঠিক নামলামও যদুবাজার স্টপে, তারপর? কাছে ঠিকানা নেই। আগে মাত্র একবারই গেছি ওদের বাড়ি, তবু খুঁজে খুঁজে শেষে বার করা গেল। পুরনো দোতলা বাড়ি। বাইরের প্লাস্টার খসা। কালচে শ্যাওলার দাগ প্রাচীন বাড়ির শরীরে। দোতলার ঝুল বারান্দায় নকশা করা কাঠের রেলিং। দরজা জানলাগুলোর মাথায় অর্ধবৃত্তাকারে লাল সবুজ কাচ বসানো।

কাঠের প্রকাণ্ড সদর দরজার এপারে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম তিনজন। ভরা বিকেলেও কেমন যেন থমথম্ করছে চারদিক। কে জানে বাবা; এই বাড়িটাই তো! দেখাই যাক না। সাহস করে মানসী আগে দরজা ঠেলল।

ঠেলতেই সিংহদুয়ার খুলে গিয়ে সামনে এক শ্যাওলাধরা উঠোন, উঠোনের মাঝখানে মানুষসমান এক চৌবাচ্চা, পাশ দিয়ে লোহার রেলিং দেওয়া সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে।

ডাকব কি ডাকব না করেও অর্চনা ডেকে ফেলেছে,—দীপিকাআআ...

গোটা বাড়ি ভুতুড়ে রকমের স্তব্ধ। বার দুয়েক ডাকার পর দোতলায় খুট করে একটা শব্দ। নীচ থেকেই সোজা দেখতে পাচ্ছি কালচে সবুজ দরজা খুলে গেছে। বাদামি লুঙি আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা একজন বেরিয়ে এল। গায়ের রং তার ফ্যাকাসে রকমের ফর্সা, অনেকটা চুনের দেওয়ালের মতো, মাথাজোড়া টাক, চোখের তলায় কালশিটে রঙের কালি।

মানসী কনুই দিয়ে কোমরে খোঁচা দিল,—দীপিকার বাবা।

আগে কোনওদিন দীপিকার বাবাকে দেখিনি। গুটি গুটি পায়ে আমি আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে প্রণাম করে ফেললাম,—আমরা দীপিকার বন্ধু।

দীপিকার বাবা হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল,—তো?

আমরা ভয় পেয়ে গেলাম,—দীপিকা বাড়ি নেই?

—কেন?

—না মানে ও কদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছে না তো...

—আর যাবে না।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি।

এ আবার কি কথা! দীপিকার বাবা কি পাগল নাকি!

অর্চনা সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেলল,—কেন মেসোমশাই?

—কেন আবার কি! পড়তে পাঠাবো না তাই। লেখাপড়া শিখে মেয়েছেলের আর দিগ্‌গজ হয়ে কাজ নেই। তোমরা আর ওর খোঁজ করতে আসবে না।

ভদ্রলোকের কথায় এমন একটা ঝাঁঝ ছিল যার তোড়ে আমরা হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেছি। চলে যাওয়ার জন্য উঠোনও পেরিয়েছি, হঠাৎই দোতলার কোনও ঘর থেকে ছিটকে এসেছে দীপিকা,—অ্যাই অপু, মানি, অর্চনা, তোরা যাস না প্লিজ। দাঁড়া।

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠের হুঙ্কার,—খবরদার খুকু, এক পা'ও বেরোবে না।

—কেন, বেরোব না? নিশ্চয়ই বেরোব। আমি স্কুল যাব। পড়াশুনো করব।

দীপিকার পরনে আধময়লা স্কার্ট ব্লাউজ, চোখমুখ ফোলা ফোলা, চুল দেখে মনে হয় বেশ কদিন চান করেনি। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দীপিকার বাবা দীপিকার হাত চেপে ধরল,—আমি তোমাকে বেরোতে বারণ করেছি খুকু। যাও। ঘরে যাও।

দীপিকা জোর করে হাত ছাড়াতে গেল, অমনি গালে সপাটে এক চড়। আমাদের সামনেই। ঘাড় ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে দীপিকাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ঘরে, দিয়েই দরজায় শিকল,—কী হল? তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন? দীপিকার সঙ্গে দেখা হবে না। যাও।

অর্চনা আর্তনাদ করে উঠল,—আপনি ওকে ওভাবে মারলেন?

দীপিকার বাবা উত্তর দিল-না। একই রকম কড়া চোখে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে।

আমরা বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় এসে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি।

—কেসটা কি বল তো? কেমন যেন মিস্টিরিয়াস না?

—এ আবার কি কথা! পড়তে দেবে না কেন? কেন ঘরে আটকে রাখবে?

—ওর মাকেও তো দেখলাম না! মা কিছু বলছে না বাবাকে?

অর্চনা বলল,—অন্য কোন গণ্ডগোলও হয়ে থাকতে পারে। দীপিকা কারুর সঙ্গে প্রেমটেম করছে নাকি? সেটাই জানতে পেরে...

—দূর, ওর লাভার থাকলে আমরা জানতে পারতাম না!

—তাহলে দ্যাখ, ওর বাবা হয়ত কোন মালদার অশিক্ষিত বনেদি পাত্রটাত্র জোগাড় করে ফেলেছে। ও হয়ত বিয়ে করবে না বলে জেদ ধরেছে তাই...

আমরা তিন জনই মোটামুটি শেষ সম্ভাবনাটার ব্যাপারে একমত হলাম। আবার মনটাও কেমন খুঁতখুত করতে লাগল। এরকমও হয়? একবার মনে হল হতেও তো পারে। এই তো সেদিন বি সেকশনের ভারতী দিন পনেরো ডুব মেরে আচমকা এক মাথা সিঁদুর নিয়ে ভেসে উঠল স্কুলে। কী হাসিখুশি হাবভাব, কথায় কথায় গড়িয়ে পড়ছে বন্ধুদের গায়ে, শাঁখা চুড়িতে ঝমঝম আওয়াজ তুলে অসভ্য, অসভ্য গল্প বলছে নিজের সম্পর্কেই।

সে যাই হোক, ভারতীর কথা ভাবতে একটুও ইচ্ছা করছিল না আমাদের। দীপিকার কথা ভেবেই সুন্দর সোনালি বিকেলটা কেমন পাঁশুটে মেরে গেল। একটা একদম অচেনা যন্ত্রণা আমাদের বিকেলের ফুসফুসটাকে নিংড়ে নিচ্ছে। এক বুক মন খারাপ নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেছি। খুব মন খারাপ আমাদের। পরদিন। তার পরদিন। তার পরদিনও। লম্বি ধাস্সির কোর্ট হঠাৎই কেমন বিস্বাদ। আমি মানসীর বাড়িতে যাই। মানসী আমাদের বাড়িতে। কোনও কোনও দিন অর্চনাও আসে। বারান্দার ধাপিতে, সিঁড়ির কোণায় বয়ে যায় আমাদের পাঁশুটে বিকেল।

সবাইকে চমকে দিয়ে হাফইয়ার্লি পরীক্ষার দিন আচমকা হাজির দীপিকা। সাদা ব্লটিং পেপারের মত মুখ, সেলাই করা ঠোঁট, ঘাড় নিচু করে পরীক্ষা দিয়ে গেল

একের পর এক। আমরা কথা বলতে গেলে ও উদাসীন চোখে শুধু জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে। পরীক্ষা শেষ হল। আমরা তিন জন গোলা পায়রা হয়ে উড়তে উড়তে বাড়ির কাছে হতশ্রী পার্কটায় গিয়ে বসলাম। প্রচুর কথা জমেছে বুকে। প্রচুর। ঠিক তখনই দীপিকা আমাদের খুঁজে বার করেছে পার্কটাতে।

আমরা হতবাক।

দীপিকা আমাদের পাশে বসে অন্যমনস্ক ভাবে ঘাস ছিড়ে দাঁত দিয়ে কাটল একটুক্ষণ। কিছু বুঝি বলতে চায়, পারছে না। একসময়ে দুম করে অর্চনাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওরকম বুকফাটা কান্নায় আমার আর কোনও বন্ধুকে কাঁদতে দেখিনি আগে। কখন যেন অর্চনাও কাঁদতে শুরু করেছে। মানসীও। দেখাদেখি আমিও। কেন কাঁদছি না জেনে অবিরাম কেঁদে চলেছি আমরা। তারই মধ্যে হেঁচকি তুলতে তুলতে দীপিকা বলল,—তোরা শুনলে আমার গায়ে থুতু দিবি কিন্তু তোদের ছাড়া আর কাদেরই বা বলব! আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

আমাদের কান্না ফুরোল।

—কেন রে!

—কী হয়েছে আমাদের খুলে বল।

—তুই মরতে যাবি কেন? আমরা আছি না।

দীপিকার ভারী ভারী চোখ স্থির কয়েক পলকের জন্য,—আমার মা পালিয়ে গেছিল।

'মা পালিয়ে গেছিল' বাক্যটার অর্থ ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না। আমার কাছে তখনও মা হল গিয়ে মা। সামান্য ছুতোনাতায় যে কান ডলবে, চুলের মুঠি ধরবে, বকবক করে নড়িয়ে দেবে কানের পোকা, যতসব অপ্রিয় কুখাদ্য খেতে বাধ্য করবে আমাদের আর সুযোগ পেলেই বাবার কাছে তিনকে সাত করে বলে বকুনি খাওয়ানোর চেষ্টা করবে, পুজোর সময় দুসাইজ বড় জামা কিনে তাই পরতে বাধ্য করবে, ক্বচিৎ কখনও দাদাকে লুকিয়ে ফুচকা আলুকাবলির পয়সা দেবে আমাকে। সেই মা কি কখনও পালাতে পারে! বললাম,—ভ্যাট। কী বলছিস তুই!

—মা কালীর দিব্যি, সত্যিই মা পালিয়েছিল। রবিনকাকার সঙ্গে।

—রবিনকাকাটা কে?

—ও, তোদেরকে তো রবিনকাকার কথা বলিনি। রবিনকাকা বাবার খুব বন্ধু। ভীষণ সুন্দর দেখতে। দারুণ জমিয়ে গল্প বলতে পারে। গুড ফ্রাইডের আগের দিন সন্ধেবেলা মা আর রবিনকাকা কী সব কিনতে বেরিয়েছিল, তারপর আর

ফেরে না, ফেরে না।...বাবা বার বার বাসরাস্তায় যাচ্ছে আর আসছে। মাঝরাতে রবিনকাকার বাড়িতে গিয়েও খুঁজে এল। নীলা কাকিমা মানে রবিনকাকার বউ বাচ্চা কোলে কাঁদতে কাঁদতে সেই রাতে আমাদের বাড়িতে চলে এসেছে। বাবা রাতভর অবিরাম গজরাচ্ছে। সে কী খারাপ খারাপ গালাগাল! আছড়ে আছড়ে সব জিনিসপত্র ভাঙছে আর লাল চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে, কাল থেকে যদি বাড়ির বাইরে পা রাখিস, কেটে আদিগঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। ভোর হতেই কাকিমাকে নিয়ে নালিশ করতে থানায় ছুট। তোরা যেদিন এলি সেদিনই থানা থেকে পুলিশ এসেছিল বাড়িতে, খোঁজখবর করে নাকি জেনেছে মাকে আর রবিনকাকাকে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে দেখা গেছে। তারপরই বাবার আবার নতুন করে আস্ফালন...

শুনতে শুনতে কাঁটা দিচ্ছিল সর্বাঙ্গে। নিজের বাবা মা চোখের সামনে দুলে উঠছে। দুলে দুলে ভেঙে যাচ্ছে, যেভাবে পাথর পড়ে ছায়া ভাঙে শান্ত দীঘির জলে।

—তারপর তো হাফইয়ার্লি পরীক্ষার চার দিন আগে মা নিজে নিজেই এসে উপস্থিত। যেন কিছুই হয়নি। যেন জাস্ট পাশের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরল।...মাকে দেখেই বাবার সে কী মেজাজ! এমন চোটপাট শুরু করল যে মজা দেখতে বাড়িভর্তি লোক জমে গেল। ভাবলেই আমার...বলতে বলতে আবার কেঁদে ফেলেছে দীপিকা।

আমরা ওর মাথায় পিঠে হাত বোলাচ্ছিলাম। ও কেঁপে কেঁপে উঠছিল কান্নার দমকে,—আমি মরে যাব। আমি মরে যাব। আমি মরে যাব।

মানসী নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—আর তোর মা? মা কী বলল?

—মা তো বাবার থেকেও বেশি চেঁচাচ্ছিল। বলল, বেশ করেছি গেছি, আমার যেখানে ইচ্ছে যাব, যখন খুশি ফিরব, তুমি কৈফিয়ত চাওয়ার কে? মদোমাতালের ঘর করি, পুরুষমানুষ হয়ে এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই...

—তোর বাবা মদ খায়?

—খায় না আবার। প্রায়ই তো রাত্তিরে চুর হয়ে ফেরে...

এবার আর নিজের বাবা নয়, এবার চোখের সামনে হারুর বাবার ছবি। হারুর বাবা আমাদের পাড়ার গোকুল পরামানিক, গলির মোড়ের ক্ষুদে সেলুনটার মালিক। সেই গোকুলকাকা যখন রোজ রাত্তিরে সামনের রাস্তা দিয়ে ঢেউ ভেঙে ভেঙে হেঁটে যায়, তখন কাজের শেষে ফুটপাত জুড়ে তাস পেটাতে বসা বদ্রি ঠাকুর, সুরিন্দর ঠাকুররা চেঁচায়,—আরে ও গোকুলদাদা, সামহালকে চলো সামহালকে, আগাড়ি তুমহারা ভঁইসবা...

গোকুলকাকা সঙ্গে সঙ্গে গর্জে ওঠে, ছুটতে থাকে খিস্তির ফোয়ারা,—কোন শালা আমায় ভঁইস্ দেখায় রে? আমি কি কারুর মায়ের ভাতারের পয়সায় মাল খাই? ভঁইস দিয়ে গোকলোর সঙ্গে চালাকি চলবে না হ্যাঁ। বলতে বলতে সোজা হেঁটে নেমে যায় পাশের নর্দমায়, এক হাঁটু পাঁকে। সেখান থেকেও চলে তার গালাগালির পিচকিরি।

আমি আর দাদা তো খড়খড়ি ফাঁক করে হেসে কুটিপাটি। মা দেখলেই টেনে সরিয়ে দেয় আমাদের। বাবা হুঙ্কার ছাড়ে,—এই গোকলো কী হচ্ছেটা কি? এটা ভদ্রলোকের পাড়া। বলেই রেডিওর শব্দ বাড়িয়ে দেয় দুগুণ।

দৃশ্যটা ভাবতেই পেট গুলিয়ে হাসি এল আমার। নিজের মনে ফিক করে হেসেও ফেলেছি। অর্চনা কটমট করে তাকাল আমার দিকে। তারপর দীপিকার কাঁধে হাত রাখল আলতো,—আগে এসব কথা তো বলিসনি কোনও দিন?

দীপিকা হাঁটুতে মুখ গুঁজল,—এ সব কথা কি বলে বেড়ানো যায়? সত্যিই তো বাবা কিছু করে না। দাদু মানে আমার মা'র বাবার রেখে যাওয়া টাকাতেই তো সংসার চলে আমাদের। বাড়িটাও তো দাদুর। বাবা তো ঘরজামাই।

ঘরজামাই শব্দটাও খট্ কর বেজেছে কানে। তখনও জানতাম ঘরজামাই শব্দটা প্রায় একটা গালাগাল। নিজের শব্দকোষে গালাগালির সংখ্যা তখনও বড় অপ্রতুল। শালা শব্দটাকেই কী যে নিষিদ্ধ, গর্হিত মনে হত তখন! ঘরজামাই ঠিক ততটা খারাপ না হলেও...আমাদের বাড়ির ভোজপুরী ধোপা সুর করে গাইত, পহেলা কুত্তা পালতু কুত্তা, দুসরা কুত্তা ঘরজামাই!

আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম,—কেন? তোর বাবার ঘরদোর কিছু নেই?

—থাকবে না কেন? সেখান থেকে ভাইরা তাড়িয়ে দিয়েছে বহু দিন। আমার কাকা জ্যাঠারা কেউ বাবার মুখ দেখে না।

কান্নার সঙ্গে তীব্র বিষ উগরে দিচ্ছিল দীপিকা। বিষ নয়, ঘৃণা। নিজের বাবা মা'র প্রতি ঘৃণা, জীবনের প্রতি ঘৃণা, গোটা বিশ্বসংসারের ওপর ঘৃণা। সঙ্গে একই কথা, বাঁচব না, বাঁচব না। আর আমি তখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম আবার বাবা মার মুখ। বাবা মানে যেমন হওয়া উচিত, অন্তত আমার তখনকার ধারণায়, আবার বাবা তো তেমনই। বাবা মানে একটু গম্ভীর ধরনের এক মানুষ, বেশি কথা বলে না, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাজার যায়, ফিরে এসে মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ে, তারপর চান খাওয়া সেরে মা'র হাতে তৈরি টিফিনটা নিয়ে সারাদিনের মত অফিস চলে যায়, ফেরে সেই রাস্তার আলোগুলো জ্বলে যাওয়ার পর, সন্ধেবেলা নিয়ম করে রেডিওতে খবর শোনে, মাঝে মাঝে আমাদের

অঙ্ক ইংরিজি দেখিয়ে দেয়, কখনও কখনও ঠোঙাভর্তি গরম জিলিপি কিনে আনে মোড়ের দোকান থেকে, কখনও বা বচ্ছরকার আমটা লিচুটা, জামটাম, আর হঠাৎ হঠাৎ পড়া ধরে বকাঝকা করে ভীষণ। এই বাঁধাধরা সংজ্ঞার বাইরেও তবে অন্যরকম বাবা আছে! বাবা মানেই তবে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা নয়! বাড়ি ফিরে সেদিন বার বার সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিলাম নিজের বাবা মা'র দিকে। মুখের ওপর কোনও মুখোশ আছে কি? হয়ত আছে, হয়ত নেই। কে জানে!

ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পরীক্ষায় খুব খারাপ রেজাল্ট করল দীপিকা। সায়েন্স তো পেলই না, প্রোমোশনটাও অন ট্রায়াল। বড়দিনের ছুটির সময়ই খবর পেলাম ওকে অন্য কোথাও যেন পাঠিয়ে দিচ্ছে ওর রবিনকাকা আর মা, সেখানেই হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করবে। এর পর ওর আর কোনও খোঁজখবর পাইনি। দীপিকা ক্রমশ হারিয়ে গেছে আমার বিকেল থেকে। এখন বন্ধু বলতে আমরা দুজন। আমি আর মানসী। অর্চনা মাঝে মাঝে আসে বিকেলবেলায়, তবে মাঝে মাঝেই। ক্লাস নাইনে ওঠার পরই পড়াশুনা নিয়ে ও ভীষণ সিরিয়াস হয়ে উঠেছিল। রোগা সোগা মেয়ে, নানারকম অসুখেও ভুগত মাঝেমধ্যে।

স্কুল থেকে ফিরে আমি আর মানসী হেঁটে বেড়াই এদিক-ওদিক। তখন আর আমরা শিশু নেই, কেঁচো, ব্যাঙের প্রজনন প্রণালী পড়তে রোমাঞ্চ বোধ করি। পুংকেশর গর্ভকেশর মিলন কল্পনা করে পুলকিত হই। লুকিয়ে লুকিয়ে মানসীদের ছাদে বসে লেডি চ্যাটার্লিজ লাভারের অনুবাদ পড়ে শিউরে উঠি, কিছু দাগ দেওয়া পাতা বেছে বেছে পড়তে থাকি বার বার। রবিবার দুপুরে অনুরোধের আসরে শোনা কোনও গানের মোহজড়ানো বিভ্রমে আপ্লুত হই সারা সপ্তাহ। দূরের কোন বাড়িতে গ্রামাফোন রেকর্ডে বাজতে থাকা 'গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু' শুনতে শুনতে বইয়ের অক্ষরগুলো চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মত মিলিয়ে যায়। বিকেলবেলা ঘাসের লন ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অর্থহীন কথায় নিজেরাই হেসে কাচের মত টুকরো টুকরো হয়ে যাই। আর তখনই অনুভব করি ছায়া ছায়া অদৃশ্য অনুসরণকারীদের উপস্থিতি। হঠাৎই কোন সাইকেল অসম্ভব ধীরগতিতে চলতে থাকে পাশে পাশে। পরিচিত গানের কলি স্বরযন্ত্রে ধাক্কা দেয়। দু-একটা চিঠিও পায়ের কাছে হুসহাস উড়ে এসে পড়ে,—ড.র্লিং, তুমি নেই তো পৃথিবী নেই। মা তোমাকে বউ হিসেবে পেলে খুব খুশি হবে। তেকোনা পার্কের সামনে কাল বিকেলে অপেক্ষা করব। চলে এসো। ইতি, তোমার পথ চেয়ে থাকা একজন। কী সাহস! কী সাহস! আমরা বিরক্ত হতে গিয়ে হেসে ফেলি। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেদিন আর দেখা-পাই না সেই অচেনা প্রেমিকের। চিঠি ছুঁড়েই

উধাও বীরপুঙ্গব। আমরা আবার কাঁঠালি চাঁপার গন্ধমাখা সবুজ ঘাস ধরে হাঁটতে থাকি। বিরক্তির সঙ্গে মেশে কৌতূহল, রাগের সঙ্গে অহংকারী পুলক। আমরা টের পাই প্রতিটি বিকেলে এখন নীরবে কুসুমের মতই প্রস্ফুটিত হচ্ছে সে। আমাদের যৌবন।

তা সেই যৌবনের ডাক প্রথম এল মানসীর কাছে। একদিন বিকেলে মানসীকে ডাকতে গেলাম, মানসী নেই। ম্যাজেনাইন ফ্লোরে সদ্য আসা তাদের পেয়িংগেস্টের কাছে কেমিস্ট্রি পড়ছে। দরজা ধাক্কা দিতে বেরিয়ে এসে বলল,—তুই যা, আমি পরে যাচ্ছি। প্রবীরদার কাছে ক'টা কেমিক্যাল ইকুয়েশান বুঝে নিচ্ছি।

নীচে নেমে অপেক্ষা করলাম, মানসী এল না।

পর দিনও একই ঘটনা। মানসী হাসি মুখে বেরিয়ে এল,—কাল বেরোতে পারলাম নারে, আজ ঠিক যাব। ট্রিগনমেট্রির দুটো অঙ্ক করে নিয়েই...

সেদিনও আমার বিকেলটা একা একাই কাটল।

পর দিন আবার একই ঘটনা। মানসী হি হি হাসছে,—মা কালীর দিব্যি, কাল পার্কের দিকে গিয়ে তোকে খুঁজেছিলাম, তুই চলে গেছিলি। আজ একটু অ্যামোনিয়ার প্রপার্টিগুলো বুঝে নিয়েই...

সেদিন দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর খানিকক্ষণ কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ভিতর থেকে মৃদু শব্দ ভেসে আসছে না! শব্দই তো। শব্দগুলোর কোন অর্থ নেই। অন্তত সে অর্থ অ্যামোনিয়ার চ্যাপ্টারে তো নেইই।

নীচে নেমে আর অপেক্ষা করিনি। পরিচিত রাস্তা ধরে কৃষ্ণচূড়ার ফুল মাড়িয়ে একা একাই হেঁটেছি। দুর্বোধ্য অপমানে কান গরম। ক্ষোভে দুঃখে বন্ধুর মিথ্যাচারিতায় ক্লিষ্ট আমি একই পথ চক্কর দিয়ে ফিরছি। ধীরে ধীরে একটা চাপা কষ্ট আচ্ছন্ন করে ফেলছিল আমাকে। কষ্ট, না হিংসে? আমার একমাত্র বন্ধু মানসী প্রেমের সন্ধান পেয়ে গেছে আমার আগেই। ঠিক করলাম ওর সঙ্গে আর কথা বলব না।

কিন্তু মানসী পর দিনই স্কুলে আমার হাত চেপে ধরেছে,—অপু বিশ্বাস কর, তুই কী ভাবছিস জানি না...

—তোর কি ধারণা প্রেমে পড়লে বন্ধু টের পায় না।

মানসী মুহূর্তের জন্য লাল,—প্রবীরদার সঙ্গে তোর পরিচয় নেই নারে? চল, আজ তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

—আমি আলাপ করে কী করব? তোর লাভার, তুই...

—আহ্ অপু, ছেলেমানুষি করিস না। জানিস তোর কথা কত বলেছি প্রবীরদাকে! তোকে আজ নিয়ে যাবই।

আমি তখন অনেক উপন্যাস পড়ে ফেলেছি। জানি প্রেমের সিনে তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে কাবাবমে হাড্ডি। তাছাড়া আমি কেন ওদের মধ্যে...?

মানসী কানের কাছে মুখ নিয়ে এল,—ভাবতে পারবি না প্রবীরদা কী ভীষণ রোমাণ্টিক। সেদিন আমার হাত ধরতে...দ্যাখ্ দ্যাখ্ ভাবতেই আমার কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে...

আমার তখন হিংসে ভেসে গেছে কৌতূহলে,—কী কথা হয় রে তোদের দুজনের?

—কত কথা। মানসী গা মুচড়োল,—এই আমি কী ভালবাসি, ও কী ভালবাসে, আমার মা বাবা কেমন, ওর দেশে কে কে আছে, এই এম-এসসি করে ও কী করবে, বিয়েতে কারুর বাড়িতে আপত্তি হবে কি না...

—তোরা বিয়ের কথাও ভেবে ফেলেছিস?

—ভাবব না? তাড়াতাড়ি বিয়ে না করে ফেললে ওর যদি অন্য কারুর দিকে মন ঘুরে যায়?

—যাহ্, প্রকৃত ভালবাসা থাকলে লক্ষ বছর অপেক্ষা করা যায়। প্রাজ্ঞ প্রেমিকার মত বললাম,—তুই লায়লামজনু পড়িসনি? হীর্‌রনঝা?

—তুই ঠিকই বলেছিস রে। প্রবীরদাও তাই বলে। বলে দরকার হলে দশ বছর অপেক্ষা করব। বলে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করবে তো? মা কালীর দিব্যি, আমার অত ধৈর্য নেই রে।

মানসীর কথার ভঙ্গিতে হেসে গড়িয়ে পড়ছিলাম আমি। কোনও রকমে বললাম,—বালিকা, রহু ধৈর্যং, রহু ধৈর্যং...

এক দিন বিকেলে অর্চনার বাড়ি থেকে একটা বই নিয়ে ফিরে দেখি মানসী আমাদের বাড়িতে বসে দিব্যি তেঁতুলের আচার খাচ্ছে। আমাকে দেখে চোখে আঙুলে ঠোঁটে এক রহস্যময় ইঙ্গিত করে বলে উঠল,—কিরে, কাল যাচ্ছিস তো?

—কোথায়!

—কেন তুই কাল স্কুল থেকে যাচ্ছিস না বেনহার দেখতে? স্কুলে টাকা জমা করিসনি?

ভীষণ চমকেছি। মানসীর কথা মার কানেও গেছে। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করল,—তুই তো বলিসনি বাড়িতে এসে!

মানসীর রহস্যময় ইঙ্গিত ততক্ষণে বুঝে গেছি, বললাম—সে তো কাল টাকা দিলেও হবে। আমি ভেবেছিলাম আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করে...

দাদা ভিতরের বারান্দায় বসে জলখাবার খাচ্ছিল। সদ্য তখন ফার্স্ট ইয়ারে

পড়ছে। বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বলল,—যা যা দেখে আয়, যা একটা চ্যারিয়ট রেস আছে না!

রাস্তায় এসে মানসীকে বললাম,—ব্যাপার কিরে? গুল মারলি কেন?

মানসী আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরল,—মা কালীর দিব্যি, প্রবীরদা এমন করে তোর সঙ্গে আলাপ করতে চাইল...

—ইস, চাইলেই হল? আমি আলাপ করলে তো...

—প্লিজ অপু, ও তিনটে টিকিট কেটে ফেলেছে। জংলীর। শাম্মী কাপুর আর সায়রাবানু।

—স্কুল থেকে বেরোবি কী করে?

—আমি কাল স্কুল যাচ্ছি না। তুই টিফিনের সময় পেট ব্যথাট্যাথা কিছু বলে...

মিথ্যা কথা বলতে কি যে বুক টিপটিপ করেছিল স্কুলে। হলে পৌঁছেও মনে হয় জনঅরণ্যের প্রতিটি মানুষ যেন আমার ভীষণ পরিচিত, সকলেই যেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আমারই দিকে, যেন এখখুনি বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসবে মা বাবাকে। অল্পবয়সী যে কোনও ছেলে দেখলেই মনে হয় দাদার বন্ধু না! হল অন্ধকার হতে তবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। এতো আর বাবা মার সঙ্গে শ্রীশ্রীমা, পথের পাঁচালি, লালুভুলু কি কাবুলিওয়ালা দেখা নয়, এ হল সবথেকে প্রাণের বন্ধু আর তার প্রেমিকের সঙ্গে বসে প্রায় নিষিদ্ধ এক হিন্দি সিনেমা দেখা, যার এক বর্ণ ভাষাও আমার বোধগম্য নয়। চোখের সামনে শুধু এক উদ্দাম দস্যু পুরুষ ইয়াহু চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে পদ্মের পাপড়ির মতো কোমল আর রূপসী এক প্রেমিকার ওপর। বরফের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমারই যেন গায়ে জ্বর এসে গেল। প্রতি পলে পাশে বসা প্রেমিকযুগলের ফিসফিসানিও কানে আসছে, অন্ধকারেও টের পাচ্ছি মানসীর শরীরকে বেড় দিয়ে আছে প্রবীরদার বলিষ্ঠ হাত।

শো-এর আগেই আলাপ হয়েছিল প্রবীরদার সঙ্গে, হাফটাইমে দু একটা টুকটাক কথা, পর্দায় যখন বুনো প্রেম শেষ হল তখন আর ভয় সংকোচ নেই, মুখে আমার কথার খই ফুটছে—তারপর মশাই, এই যে আমাকে পাপের ভাগী করলেন, তার শাস্তিটা পাবে কে? প্রেমিক প্রেমিকার মাঝে ঈশ্বরও থাকতে ভয় পান, আমি তো নেহাতই এক ফচকে শয়তান।

কী করে যে বলছিলাম ওসব কথা! তা যাই হক, হল থেকে বেরিয়েই আমি আর মানসী আলাদা, প্রবীরদা আলাদা। বাসে উঠে প্রবীরদা দূরের সিটে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক মুখ এক অচেনা তরুণ।

পাড়ায় এসে উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল মানসী,—এই অপু, বল্ না, বল্ না, কেমন লাগল প্রবীরদাকে?

গম্ভীর বিচারকের মুখ করে রায় দিলাম,—মন্দ নয়। বেশ উইটি। তোর টেস্ট আছে।

মানসী বিশাল লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল,—যাক, আমার যা ভাবনা হচ্ছিল।

সময়ের মনে সময় এগোয়। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত ফুরিয়ে শীত এসেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষা চলাকালীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় পাড়ার জুনিয়ার মেয়েদের খেলা দেখছি, সেদিনই অঙ্ক পরীক্ষা ছিল, ট্রিগনমেট্রিটা ভাল হয়নি, সেজন্য মনটাও বেশ খারাপ, পর দিন বায়োলজি পরীক্ষার জন্য পড়তে বসায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছি না, এমন সময় মানসী এল। তার মুখচোখও কেমন আনমনা, আমারই পাশে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে অথচ কোনও কিছুই যেন দেখছে না। গত ক'মাস ধরে ওর যেন কিরকম ছাড়া ছাড়া ভাব। প্রায়ই বিকেলে কোথাও না কোথাও অভিসারে নিপাত্তা হয়ে যায়, পুজোর ক'দিন একটি সন্ধেতেও ওর টিকি দেখা যায়নি। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—খুব সাহস বেড়েছে দেখছি, মাসিমা যদি জানতে পারে?

—তুই কি ভাবছিস মা কিছুই আন্দাজ করে না? প্রবীরদাকে মারও খুব পছন্দ। হবে না'ই বা কেন বল্? ব্রাইট স্টুডেন্ট, অত সুন্দর চেহারা, ভাল ফ্যামিলি, দেশে কত জমিজমা বাড়িঘর...

—তাই তোর এত সাহস? আজ বেলুড় দক্ষিণেশ্বর, কাল সিনেমা, পরশু লেক...খুব চালাচ্ছিস্? তো এখনও কি শুধু হাত ধরাধরিই, না একটু এগিয়েছে?

—যাহ্। প্রচণ্ড জোরে চিমটি কেটেছে মানসী,—তুই বড় ফাজিল হয়েছিস! বলতে বলতে গলা নামিয়েছে,—কিস্ করেছে।

মিস্ মার্পলের মত ওর চোখের দিকে তাকিয়েছি আমি,—কেমন লাগে রে? টকটক? মিষ্টিমিষ্টি? ভীষণ ভাল?

—ও বলে বোঝানো যায় না। তোর হোক, বুঝতে পারবি। স্বর্গসুখ রে স্বর্গসুখ।

প্রবীরদার সঙ্গে এর মধ্যে দু একবার দেখা হয়েছে এদিক ওদিক, হেসে কথাও বলেছি এক আধটা, ভালই লেগেছে। হিংসে এখন অতীত। মনের গভীরে ওদের প্রেম অনুক্ষণ এক গোপন আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে আমার। কীভাবে ওদের প্রেম পূর্ণতা পাবে তাই নিয়ে ভাবি দিনরাত। যেন ওদের প্রেমের সার্থকতাতে আমারও কিছু অংশীদারি রয়ে গেছে।

পাশে দাঁড়ানো মানসীকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কিরে মানি, পরীক্ষার সময়তেও ধ্যান চলছে?

মানসী মাথা ঝাঁকাল, নাহ্, কালকের বায়োলজি পরীক্ষার কথা ভাবছি।

—বাজে বকিস্ না। তোর নাকটানা দেখেই আমি বুঝতে পারি সর্দি হয়েছে কিনা। প্রবীরদার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্?

শীতের শুকনো পত্রপুষ্পবিহীন কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়েছিল মানসী। হুট্ করে আমার হাত চেপে ধরেছে,—ও কেমন বদলে যাচ্ছে রে অপু।

—কেন? কী বলেছে তোকে?

—বলবে আবার কি। দুচার মিনিট কথা বলেই আমাকে আজকাল কাটাতে চায়। বেরোতে বললে পড়াশুনোর ছুতো দেখায়।

—বারে, পড়াশুনো করবে না? রেজাল্ট ভাল হলে তো তোরই লাভ। সে'ও তো তোরই জন্যে।

—হুঁহ্, আমার জন্যে না হাতি। মেয়েদের চোখ ঠিক বুঝতে পারে। তুই একবার ওর সঙ্গে কথা বলবি?

—আমি! আমি কি বলব! সদ্য পড়া উপন্যাস উগরে দিলাম মানসীকে,—দ্যাখ্ মানি, প্রেম হল এক ধরনের সাধনা, ব্রত। দুজন নারীপুরুষের মধ্যে চিরন্তন সম্পর্কের ইমারত গড়ে ওঠার শক্ত ভিত। এখানে তৃতীয় মানুষের ভূমিকা নেই রে। প্রবীরদাকেও তো দেখেছি, মিথ্যে ভাবিস না, প্রবীরদা খুবই ভালবাসে তোকে।

মানসী হঠাৎই খেপে গেল,—থাক, তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। যদি কোনও দিন মরে যাই...

আমি ওর মুখ চেপে ধরলাম,—তুই তো লায়লাকেও হার মানালি রে। অল রাইট, কাল পরীক্ষা শেষ হোক, ধরছি প্রবীরদাকে।

পরীক্ষার পর মানসীর ঘ্যানঘ্যানানি এড়াতে না পেরে শেষ পর্যন্ত এক বিকেলে গেলাম প্রবীরদার ঘরে। আমাকে দেখে প্রবীরদা প্রথমটা খুবই অবাক। শুধু অবাক নয়, কেমন যেন মনে হল খুশিও।

সরাসরি কথা পাড়লাম,—অ্যাই মশাই, আমার সুন্দর বন্ধুটাকে আপনি এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

প্রবীরদা অল্প থমকাল,—কষ্ট দিয়েছি! কই নাতো!

—বাজে কথা বলবেন না। ওর সঙ্গে আপনি ভাল করে কথা বলেন না, বাইরে বেরোতে চান না, কথা বলতে গিয়ে হাই তোলেন, ব্যাপারখানা কি?

আমার আক্রমণে বিন্দুমাত্র বিচলিত নয় প্রবীরদা, মিটিমিটি হেসেই চলেছে,—তোমার বন্ধুর কথা ছাড়ো। নিজের কথা বলো। তোমাকে যে কী সুন্দর দেখতে লাগছে আজ। এখখুনি যদি সুচিত্রা সেন তোমাকে দেখত...

একটা শিরশিরে চোরা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। জীবনে প্রথম কোনও পুরুষের মুখে আমার রূপের স্তুতি!

—ইস্, ফাজলামি হচ্ছে? দেব মানিকে বলে তখন টেরটি পাবেন।

চকিতে প্রবীরদা এগিয়ে এল আমার দিকে,—তোমার মনে হচ্ছে আমি ফাজলামি করছি? তুমি জানো তুমি কত সুন্দর? আয়নায় ভাল করে দেখেছ নিজেকে?

প্রবীরদার চোখ ক্রমশ ঘোলাটে, অস্বচ্ছ। আমি সরে আসার আগেই আমার হাত চেপে ধরেছে,—বিশ্বাস করো অপরাজিতা, তোমাকে দেখার পর থেকে, তোমার সঙ্গে কথা বলার পর থেকে, মানসী অসহ্য হয়ে গেছে। ম্যাড়মেড়ে। জোর করে ওর সঙ্গে বেরিয়েছি, এদিক ওদিক গেছি, কিন্তু সে প্রায় বাধ্য হয়ে। তুমি ছাড়া...

কেউ যেন সিসে গলিয়ে ঢেলে দিচ্ছে আমার কানে। সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে দু হাতে কান চেপে ধরলাম,—কী পাগলের মত যা তা বলছেন! এ তো ট্রেচারি, চিটিং, ছি ছি ছি...ছিঃ।

পলকে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল প্রবীরদা। দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে আমার কোমর। এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে ছিটকে এসেছি ভেজানো দরজার কাছে। নিচু স্বরে হিসহিস করে উঠলাম,—জানোয়ার। জানোয়ার কোথাকার। মানি একটা জানোয়ারকে ভালবেসেছিল।

নীচে উদ্বিগ্ন মানসীর সামনে এসে দাঁড়ানোর সময়েও হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘণ্টি বাজাচ্ছে। মুঠো শক্ত করে চোয়াল ঘষলাম। মানসী যেন কিছু আঁচ করতে না পারে।

—কী বলল রে?

—কিছুই না, এমনি হাসিঠাট্টা করছিল। শক্ত রাখতে গিয়েও আমার গলা কেঁপে গেল,—তুই ওকে ভুলে যা মানি। ও বোধহয় অন্য কাউকে...

মানসী অন্ধের মত আঁকড়ে ধরল আমাকে, বলল? বলল সে কথা? বলল আমাকে ভালবাসে না?

—বলেনি। কথা শুনে মনে হল। আমি ঢোঁক গিললাম,—হয়ত ইউনিভার্সিটিতে কাউকে...হয়ত নিজের দেশেরই কেউ...

মানসী এক ছুটে দোতলার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল। দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভেঙে পড়েছে শব্দহীন কান্নায়, কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠেছে।

আমারও চোখ ফেটে যাচ্ছিল। নিজেকে প্রাণপণে সামলানোর চেষ্টা করছি,—কাঁদিস না মানি। একটা নোংরা বাজে লোকের জন্য তুই কাঁদবি কেন? ও তোর মতো মেয়ের কান্নার যোগ্য নয়।

বলতে গিয়ে বমি এসে যাচ্ছে। তখনও যেন আমার শরীরটাকে চাটছে ওই পুরুষ নেকড়েটা। নেকড়ে নয়, শেয়াল।

এই তবে প্রেম? ঘেন্না। ঘেন্না। ঘেন্না।

এর পর বেশ কিছুদিন কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিলাম আমরা। মানসী তো পুরোপুরি বিধ্বস্ত। মানসিক ভাবে, শারীরিক ভাবেও। নিয়ম মতো স্কুলে যায়, একেক দিন বিকেলবেলা জোর করে ওকে টেনে বাইরে বার করি, কখনও নিজেই বাড়িতে বসে থাকি চুপচাপ, চোখে জমে থাকে বিষাদের বরফ। তবে সময় তো সম্মোহনের মন্ত্রমাখা একমুখী ধাবমান তীর, সেই সম্মোহনেই বিষাদ মুছে যায়, নিরাময় হয় শোকের ক্ষত। সেই সম্মোহনেই প্রথম পুরুষের দেওয়া অপমান ভুলি আমরা। আবার নতুন করে হাঁটতে শুরু করি হলুদ বিকেলে। ঘুমন্ত রিক্সাঅলার কাঁধের গামছা চুরি করে হাসিতে গড়িয়ে পড়ি, পাড়ার ছোট মেয়েদের সঙ্গে দাগবসন্তী খেলায় মেতে উঠি এক আধদিন, দাদার কাছে বাধ্য ছাত্রীর মতো বসে অ্যালজেব্রা কষি দুজনে। আমরা দুজনেই ঠিক করেছি হায়ার সেকেন্ডারির পরে ডাক্তারি পড়ব। হাজার হাজার রুগী আসবে আমাদের কাছে, তাদের কাছে আমরাই ঈশ্বর, ভাবলেই কী যে শিহরন জাগে! তার জন্য অবশ্য ভাল রেজাল্ট করা দরকার। অর্চনার চিন্তা নেই, ও যা লেখাপড়ায় ভাল, ডাক্তারিতে চান্স পাবেই। তবে ইদানীং মেয়েটা একটা বিশ্রী মাথার যন্ত্রণায় মাঝে মাঝেই বড় কষ্ট পায়। ইলেভেন ওঠার পর থেকে তো প্রায়ই কামাই করছে। প্রিটেস্টের আগে পাক্কা কুড়ি দিন দেখা নেই। এখন আর অর্চনার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ না থাকলেও পুরনো একটা টান তো আছেই। সেই টানেই আমি আর মানসী ওকে দেখতে গেলাম।

অর্চনাদের বাড়িটা আগে একতলা ছিল। এখন দোতলা তিনতলা উঠে গেছে। লোহার ব্যবসায়ে অর্চনার বাবা জ্যাঠার নাকি এখন দারুণ রমরমা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর বাগান, বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ। সাজানো বাগানের মাঝে আলটপকা গাছটা কেমন যেন বেমানান।

অর্চনা দোতলার ঘরে শুয়েছিল, আমাদের দেখে উঠে বসেছে। খুবই রোগা হয়ে গেছে কদিনে, চোখের তলায় নীলচে ছোপ। ক্ষীণ স্বরে ডাকল,—আয়। এতদিন পরে খোঁজ নিতে এলি?

মানসী বলল,—রোজই ভাবি আসব, হয়ে ওঠে না রে। এত পড়ার চাপ...

আমি ঢোক গিললাম। শুধুই কি পড়ার চাপ? যোগাযোগের অসুবিধে? নাকি অন্য কারণও আছে? নিজেদের তৈরি করা জগতে ডুবে আমি আর মানসী একটু

স্বার্থসচেতন হয়ে যাইনি কি? নিজেদের নিয়েই নিজেরা মগ্ন আছি। দীপিকার কথাও তো আজকাল মনে পড়ে না আমাদের। অপরাধী মুখে প্রশ্ন করলাম,—এখন কেমন আছিস?

অর্চনার মা ঘরেই ছিল, করুণ মুখে বলে উঠল,—দ্যাখো না এত ডাক্তার দেখানো হল, এবার আর মাথা ব্যাথাটা কিছুতেই যেতে চাইছে না। হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তখন কী হয়ে যায় ওর! হাত পা ছুঁড়তে থাকে, চোখ উল্টে যায়, গোঁ গোঁ শব্দ ওঠে গলা থেকে, দেওয়ালে পাগলের মত মাথা ঠোকে তখন।

—ডাক্তারবাবুরা কী বলছেন?

—একেক ডাক্তারের একেক মত। মাথার ছবিও তো তোলা হল, কিছু পাওয়া গেল না। কেউ বলছে এ এক ধরনের হিস্টিরিয়া, কেউ বলছে নার্ভের দোষ, কেউ বলছে ব্রেনে কোথাও কিছু হয়েছে...। অর্চনার মা দীর্ঘশ্বাস ফেলল,—কী যে হল!

অর্চনা চোখ বুজে ফেলল, ঠোঁট দুটো কেমন সাদাটে হয়ে গেছে, কাঁপা গলায় বলল,—কবে যে আবার স্কুল যেতে পারব!

মানসী বলল,—ওষুধ পড়ছে তো। দ্যাখ্ না, দু চার দিনের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠবি।

আমাদের কথাবার্তার মাঝে অর্চনার জেঠিমা আমাদের জন্য সিঙ্গাড়া মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। অর্চনার মা'র মত এঁর কপালেও এক ধ্যাবড়া সিঁদুর, সিঁথি জবজবে লাল, ঘরেও এঁরা খুব দামি দামি তাঁতের শাড়ি পরেন। অর্চনার জেঠিমার চেহারা বেশ দশাসই, অর্চনার মা'র মতো রোগাসোগা ছোটখাটো নয়, চোখ দুটো জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের মত বড় বড়, টানা টানা। তিনি বললেন,—আর গুচ্ছের ওষুধ খাইয়ে কাজ নেই। ডাক্তারদের কেরামতি বোঝা গেছে। পরশু গুরুদেব এসে পড়ছেন, তাঁর ছোঁওয়াতেই অনু আমাদের ঠিক সেরে উঠবে।

রাস্তায় এসে মানসীকে বললাম,—কী হয়েছে ডাক্তাররা ধরতে পারছে না কেন বল্ তো?

—কে জানে, ডাক্তাররা তো আর ধন্বন্তরি নয়। অনেক অসুখই তো আছে ধরা পড়ে না। বড় বড় ডাক্তাররাও...

—তার মানে ডাক্তার হলে আমরাও অনেক রোগ ধরতে পারব না? রুগী মরে যাবে?

মানসী হেসে ফেলল,—আগে থেকে এত ঘাবড়ে যাচ্ছিস্ কেন? হয়ত ওরা যাদের দেখিয়েছে তারা ধরতে পারেনি, বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নতি করেছে. কত সব জটিল রোগের ওষুধ বেরিয়ে গেছে...

আমি বললাম,—তাছাড়াও মাথার ওপর তো ভগবান আছেন। অর্চনাকে ভগবানই ঠিক ভাল করে দেবেন।

মানসী অল্প উত্তেজিত হল,—ওষুধ না খাওয়ালে ভগবানের বাবারও সাধ্যি নেই ওকে ভাল করার। শুনলি না ওর জেঠিমা কী বলল?

—দূর, ওটা কথার কথা। নিজের ছেলেমেয়েকে কেউ ওষুধ না খাইয়ে থাকতে পারে! দ্যাখ হয়ত গুরুদেবই কিছু ওষুধ বিষুধ জানেন...তাঁর ওষুধেই হয়ত ভাল হয়ে যাবে অর্চনা।

তখনও আমাদের মনে এরকমই অনেক সাদামাটা সরল বিশ্বাস। জীবনের প্রতি। মানুষের প্রতি। ঈশ্বরের প্রতি। বাড়ি ফিরেও তাই ঠাকুরপ্রণাম করতে গিয়ে মনে মনে বলছি,—হে ঠাকুর, অর্চনাকে তুমি ভাল করে দিও। যে করে হোক।

এর পর ক'দিন প্রিটেস্টের চাপে অর্চনাকে আর দেখতে যাওয়া হয়নি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই একদিন স্কুলে গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাসের মেয়েরা এক জায়গায় জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে কী যেন বলাবলি করছে, তখনও প্রেয়ারের সময় হয়নি। অন্যদের মতো আমি আর মানসীও ভিড়ে ঢুকে পড়লাম,—কী হয়েছে রে?

—ওমা, তোদের সঙ্গে এত ভাব তোরা জানিস না? অর্চনা মা কালী হয়ে গেছে। ওদের গুরুদেব নাকি বলেছেন...

পুরোটা শোনার আগেই প্রার্থনার ঘণ্টা পড়ে গেল। খোলা আকাশের নীচে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আমরা হাতজোড় করে গাইছি,—তোমারই গৃহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে...

ক্লাসে ফিরে আবার সেই জটলা। আবার সেই রোমহর্ষক আলোচনা।

মানসী জিজ্ঞাসা করল,—তোরা কেউ নিজের চোখে দেখেছিস্?

কেয়া চোখ ঘোরালো,—দেখে কাজ নেই, যা শুনেছি তাই যথেষ্ট। দুনিয়াশুদ্ধ লোক সবাই জেনে গেছে। প্রত্যেক শনি মঙ্গলবারে নাকি ভর হচ্ছে অর্চনার, মা কালী আসছেন ওর শরীরে।

মানসী অবিশ্বাসী গলায় বলল,—যাহ্, এই আমরা সেদিন গিয়ে দেখে এলাম...

—আমিও তো প্রথমে বিশ্বাস করিনি। ওরা নাকি আর ডাক্তারও দেখাচ্ছে না। গুরুদেব কিসব শেকড়বাকড় খাওয়াচ্ছে, তাই খেয়ে নাকি মড়ার মত পড়ে থাকে সারাদিন। বিশ্বাস না হয়, আজ তো মঙ্গলবার, গিয়ে দেখে আয় না।

ছুটির পর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি।

অর্চনা দোতলার সেই ঘরেই চোখ বুঁজে শুয়ে। পরনে চওড়া লালপাড় সাদা

তাঁতের শাড়ি, আরও শীর্ণ প্যাকাটির মত চেহারা, শুধু মেঘলা বিকেলের শেষ আলো এসে ওর ফ্যাকাসে মুখটাকে যা একটু উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমাদের দেখে অনেক কষ্টে চোখ খোলার চেষ্টা করল, পারল না, আপনা থেকেই চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জড়ানো স্বরে শুধু বলতে পারল,—স্কুল হচ্ছে? পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল নারে? অনেক পড়া এগিয়ে গেছে?

মানসী অর্চনার অস্থিসার হাতে হাত রাখল,—তেমন কিছু না, তুই সেরে ওঠ্, ঠিক ধরে নিতে পারবি।

অর্চনার বন্ধ চোখের কোলে দুফোঁটা জল টিলটিল,—ফিজিক্সটা এখনও কত বাকি রয়ে গেছে আমার...

কথা শেষ হওয়ার আগেই অর্চনার মা ঘরে ঢুকে আঁতকে উঠেছে,—একি! তুমি ওকে ছুঁয়েছ কেন? শনি মঙ্গলে ওকে ছোঁওয়া একদম বারণ।

মানসী ভয়ে ভয়ে হাত ছেড়ে দিল,—কেন মাসিমা?

—গুরুদেব বলেছেন যেদিন ওর শরীরে মা অধিষ্ঠান করবেন, সেদিন ওকে বাইরের লোক স্পর্শ করতে পারবে না। তোমরা এক কাজ করো, নীচের ঘরে গিয়ে বোসো, একটু পরে ওর আরতি আরম্ভ হবে, প্রসাদ নিয়ে যেও।

ভদ্রমহিলার স্বরে এমন কিছু ছিল, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত নীচে নেমে এলাম। বড় হলঘরটায় এর মধ্যেই ধুপধুনো দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। অর্চনার জেঠিমা গরদের শাড়ি পরে গঙ্গাজল ছিটোচ্ছেন গোটা ঘরে। ফাঁকা ঘর আমাদের চোখের সামনেই ভিড়ে ভিড়। আরও খানিকক্ষণ পর, লাল পোশাকপরা, বাবরিচুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, সৌম্যদর্শন এক উজ্জ্বলচোখ সন্ন্যাসী খড়ম খটখটিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে। মুহূর্তে দিব্য গন্ধে চতুর্দিক মাতোয়ারা। সকলে ভক্তিভরে উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখাদেখি আমরাও। অজান্তেই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল,—কী অলৌকিক গন্ধ রে মানি।

মানসী জোরে জোরে নাক টানল,—গন্ধটা খুব চেনা চেনা লাগছে রে আমার! কোথায় যেন...কোথায় যেন...! বড়মাইমার ফ্রেঞ্চ পারফিউমটা কি...!

ভক্তদের বাবা বাবা রবে মানসীর গলা ঢাকা পড়ে গেল। তিনি সযত্নে পাতা অজিনাসনে বসলেন। মন্দ্র কণ্ঠে সকলকে বললেন,—বোসো। বলেই অর্চনার বাবার দিকে তাকিয়েছেন,—কই, আমার বেটি কোথায়? আমার খ্যাপা মা?

অর্চনার বাবা আর জ্যাঠতুতো দাদা প্রায় কোলপাঁজা করে নিয়ে এল আধা অচেতন অর্চনাকে। জ্যাঠা তাকে স্থাপন করলেন লাল শাটিনমোড়া বেদির ওপর। অর্চনার দুই বোন দ্রুত এসে তিনদিকে তিনখানা তাকিয়া দিয়ে দিল। সেই তাকিয়ার

ঠেকাতে আধশোয়া অর্চনা কেমন নির্জীব নিষ্প্রাণ ভাবে ঝুলছে। টকটকে লাল একটা শাড়ি তার শরীর ঘিরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, গায়ে ব্লাউজ নেই, মাথার চুল খোলা, কপালে অ্যাত্তো বড় একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা। গুরুদেব তার গলায় পঞ্চমুখী জবার মালা পরিয়ে জলদগম্ভীর গলায় হুঙ্কার ছাড়লেন,—মা মাগো করালবদনী তারা ব্রহ্মময়ী, একবার বুকে চেপে বোস্ মা, বদরক্ত সব বেরিয়ে যাক...মা...মাগো...

চিৎকারের জন্য কি না জানি না অর্চনার স্থির শরীর একটু নড়েচড়ে উঠল। তারপর আচমকাই গলা থেকে ছিটকে এসেছে গোঁগোঁ শব্দ, ঠোঁট বেয়ে কষ গড়াচ্ছে, এক মাথা চুল ঝপাং করে নেমে আসছে মুখের ওপর, আবার ঝাঁকুনি খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘর জুড়ে অস্ফুট মা মা ধ্বনি। আচমকা কে যেন কাঁসর বাজাতে শুরু করল, অর্চনার মা শাঁখ বাজাচ্ছে, বাবা জ্যাঠা জেঠিরা সাষ্টাঙ্গে প্রণত মেয়ের পায়ের কাছে। গুরুদেব একটু করে ফুল ছিঁড়ে ভক্তদের হাতে দিচ্ছেন আর প্রশ্ন করছেন,—বলো, তোমার কী জিজ্ঞাস্য আছে? মা'র কাছে কী জানতে চাও তুমি?

এক এক করে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, মাকে প্রণামী দিয়ে জানতে চাইছে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ, আর গুরুদেব মায়ের থরথর ঠোঁটের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শুনে নিচ্ছেন উত্তর। আমার কী রকম গা ছমছম করছিল, সুগন্ধী ধোঁয়ায় সব আবছা হয়ে আসছে। হঠাৎ দেখি নীলসাদা স্কুল ইউনিফর্ম পরা মানসী এগিয়ে যাচ্ছে বেদির দিকে। একেবারে সামনে গিয়ে প্রশ্ন করল,—মা, আমাদের অর্চনা কবে ভাল হবে মা?

এবার আর গুরুদেব অর্চনার দিকে ফিরলেন না, মানসীকে কাছে টেনে নিয়েছেন, মণিমুক্তোখচিত আঙুলগুলো মানসীর মাথার ওপর,—ভাল হবে কী রে বেটি, তোর বন্ধু তো ভাল হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে সবিস্তারে সকলকে বর্ণনা দিলাম পুরো ঘটনাটার। মা তো শুনে গদগদ,—আমাকে সামনের শনিবার একবার নিয়ে চল্ তো।

বাবা ধমকে উঠল,—খবরদার না। যত সব বুজরুকি। ভণ্ডামি।

দাদা বলল,—পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। গুরুদেবটাকে ইমিডিয়েট্‌লি অ্যারেস্ট করুক।

আমি তর্ক করে উঠলাম,—কেন? তিনি কী দোষ করলেন? তাঁর ওষুধ খেয়ে মাথার যন্ত্রণা আর একটুও নেই অর্চনার, সেটা জানিস্? তাছাড়া আমরা নিজের চোখে দেখে এসেছি ওর ভেতরে সত্যি সত্যি মা কালী...

দাদা রেগে গেল,—হায়ার সেকেন্ডারি দিবি, এখনও এত গাধার মতো কথা বলিস কী করে রে অপু?

আমি দাদার ওপর খুব রেগে গেলাম। তর্ক করলাম না বটে, তবে বাবার কথাও মানতে পারলাম না মনে মনে। বিশ্বাসেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় আমি জানি। ঠিক করলাম এর পরদিন মা কালীর কাছে গিয়ে পরীক্ষার রেজাল্টটা কী হবে জেনে আসব। অর্চনার বোন বলছিল ওর বাবা জ্যাঠারা নাকি একটা মন্দির করে দেবেন গুরুদেবকে, সেখানে মায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেই মা কালী অর্চনার শরীর থেকে বেরিয়ে আসবেন, তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে অর্চনা।

অর্চনাটা অবশ্য তার আগেই মরে গেল।

সেদিন ছিল রাখিপূর্ণিমা। সকাল থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি। কেয়ার মুখে খবর পেয়ে আমি আর মানসী পড়িমরি করে ছুটেছি। গিয়ে দেখি ক্লাসের প্রায় অর্ধেক মেয়ে পৌঁছে গেছে। কয়েকজন দিদিমনিও। ভেঙে পড়েছে গোটা অঞ্চল। অত লোক, তবু কারুর মুখে একটা শব্দ নেই।

উঠোনের ফুলে ভরা গন্ধরাজ গাছটার নীচে বিশাল এক বোম্বাই খাটে শুয়ে আছে অর্চনা। রক্তলাল শাড়ির আড়ালে শুকনো সরু কাঁঠালিচাঁপা ডালের মতো শরীর প্রায় দেখাই যায় না, ছোট্ট কপালে টিপ যেন শেষ বিকেলের সূর্য, গলায় জবাফুলের মোটা মালা।

আমার সমস্ত শরীর ঝনঝন করে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অর্চনা চোখ খোলার চেষ্টা করছে, পারছে না...স্কুল হচ্ছে অপু? অনেক দূর পড়া হয়ে গেল নারে? ফিজিক্সটা এখনও কত বাকি রয়ে গেছে আমার...। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললাম। চারদিকে এ কী ভয়ানক ভাঙচুর চলছে? ভাঙছে, ভাঙছে। ভাঙনে সব ভেসে গেল। শ্রদ্ধা। প্রেম। সমর্পণ। ভক্তি। বিশ্বাস। আমার ভেজা চোখ মাড়িয়ে অর্চনা চলে গেল। দীপিকা চলে গেল। প্রবীরদারাও। বিকেল বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। আমাদের বিকেল। আমাদের হলুদ বিকেল।

এখন শুধু সামনে এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। শরতের বাতাস কাঁপিয়ে মাঝে মাঝেই সাইরেন বেজে ওঠে। এয়াররেড। অল ক্লিয়ার। এয়াররেড। ছদ্ম মহড়ায় স্কুলে খোঁড়া ট্রেঞ্চে অথবা বালির বস্তার আড়ালে লুকোই আমরা। সন্ধে হতেই রাস্তার বাতিগুলো মুখ ঢাকে কালো ঠুলিতে, রুদ্ধ জানালাদরজার কাচে আড়াআড়ি ভাবে সাঁটা হয় কাগজের ফালি। পুজোর আগে শহর জুড়ে প্রতিরোধের সাজসাজ রব।

আমার মনের ভেতরেও এক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকে অবিরাম। ক্রমশ বড় হয়ে উঠি আমি। সত্যিকারের বড়।

দৃষ্টিহীন

আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন একা একা। শেষ সময়ে তাঁর বিছানার পাশে আমরা কেউই ছিলাম না, যদিও মা ছাড়া আমরা সকলেই তখন হাসপাতালে। দাদা ছোড়দা দিদি, আরও অনেকে। আমিও।

মারা যাওয়ার ঠিক ন'দিন আগে বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ। ক'দিন ধরেই তিনি ইনটেনসিভ কেয়ারে ছিলেন, আমরা কেউ তাঁর দেখা পেতাম না। দেখা পেয়েই বা কী হত! ডাক্তার-নার্সদের মুখে শুনতাম তিনি নাকি কোমাতেই আছেন। বাবাকে বাঁচানোর জন্য খরচে কার্পণ্য করিনি আমরা, নামী হাসপাতাল, দামী চিকিৎসা সবই হয়েছিল। ডাক্তাররা যখন যেমন বলেছে ওষুধ ইনজেকশন কিনে দিয়েছি, দিনেরাতে সর্বসময়ে কেউ না কেউ পালা করে থেকেছি, বাবার চিকিৎসায় যেন সামান্যতম ত্রুটি না হয় সেদিকে আমাদের সতর্ক নজর ছিল। আমরা কাজের মানুষ, প্রত্যেকেরই সুবিধে অসুবিধে আছে, সেগুলো সামলে-সুমলে চার ভাইবোন একসঙ্গে মিলতাম বিকেলে। ভিজিটিং আওয়ারের পর চারজনই বড় ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতাম। তিনি খুব একটা আশা দেননি, তবু যেন মনে হত এত দিন যখন কেটে গেছে, বাবা হয়তো এযাত্রা বেঁচে গেলেন।

বাড়ি ফিরে মাকে রোজকার সংবাদ দিতাম আমরা। মা সচরাচর কিছু বলত না। শুনত শুধু। নীরবে। বাবা হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন থম মেরে গিয়েছিল আমাদের স্বল্পভাষী মা।

বাবা টিকলেন না। মারাই গেলেন। এক চৈত্রের বিকেলে।

নামে চৈত্রমাস হলেও দিনটা ছিল খুব গুমোট। গরম। শেষ বসন্তে যে একটা এলোমেলো বাতাস বয় তার কোনও চিহ্নই ছিল না কোথাও। শুকনো পাতারা

উড়ছিল না, শহরের সমস্ত গাছ নিস্পন্দ, হাসপাতালের পুকুরের জলেও তরঙ্গ ছিল না এতটুকু। সব কিছুর মধ্যেই ছিল এক মৃত্যুর পূর্বাভাস।

আমরা অবশ্য তেমন কিছু লক্ষ করিনি।

লক্ষ করার তখন অবকাশই বা কোথায়? অন্তত আমার? সেদিন দুপুর থেকেই আমার নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়, বিকেল নাগাদ বেশ বেড়ে যায় চাপ। কষ্টটা নতুন কিছু নয়, তখন প্রায়ই হত। কোনও ঋতু একটু চড়া হলেই ওই রোগ ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। সে কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্ম, কিবা বর্ষা। গুমোট হলেও নিঃশ্বাসে টান, ঘোর বর্ষায় দম আটকে আসে, ঠাণ্ডা হাওয়া চললেও ভাল করে শ্বাস নিতে পারি না। কড়া গন্ধ আমার শত্রু, ধুলোবালি বিভীষিকা, যে কোনও মানসিক উদ্বেগই আমার ফুসফুসের শমন। এই চেনা কষ্ট যে এক আসন্ন মৃত্যুর সঙ্কেত, আমি তা বুঝব কী করে!

সিঁড়িতে বসে তখন হাঁপাচ্ছি আমি, দাদাদিদিরা এলোমেলো কথা ছেড়ে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দিদি বলল, তোর তো ব্যাগে ট্যাবলেট আছে, একটা খেয়ে নে না।

ছোড়দা বলল, জল এনে দেব?

বড় বউদি বলল, তোমার কাছে স্প্রে থাকে না, মুখে একটু টেনে নাও...

ছোট বউদি বলল, ওকে একটু চা এনে দাও। গরম চা খেলে এখন আরাম হবে।

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। আমি আর খুকিটি নেই, ঊনত্রিশ বছর বয়স হয়েছে আমার, চাকরিবাকরি করি, নিজের ভাবনা নিজেই ভাবা আমার প্রকৃতি। তা ছাড়া হাসপাতালে বসে আমাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে ওঠাও ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না আমার। হাত তুলে দু'দিকে মাথা নাড়লাম—কিচ্ছু লাগবে না।

জামাইবাবু তবু কোত্থেকে ছুটে এক ভাঁড় চা নিয়ে এসেছে। খেতেই হবে।

ভাঁড় হাতে নিয়ে সবে চুমুক দিয়েছি, তখনই ডাকটা এল। মৃত্যুদূতের মতো কে যেন হাঁকছে, আই সি ইউ সেভেনটিন... আই সি ইউ সেভেনটিইইন...! পেশেন্টের বাড়ির লোক কেউ আছেন?

আমাদের বাবা চিত্তপ্রিয় রায় যে আই সি ইউ সেভেনটিন হয়ে গেছেন, সেটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লেগেছিল আমাদের।

দাদা হঠাৎ সিগারেট ফেলে লাফিয়ে উঠল, আমাদের ডাকছে! বাবা...

হুড়মুড় করে ছুটল সবাই। চেষ্টা করেও আমি উঠতে পারলাম না কিছুতেই। বুকের ভেতর তখন আমার আস্ত পাহাড়ের ভার, শ্বাসকষ্টে চোখ ঠেলে বেরিয়ে

আসছে, সামনে শুধু চাপ চাপ ধোঁয়া। বাবাকে দেখতে যাব কী, মনে হচ্ছিল আমিই বুঝি তক্ষুনি মরে যাব।

কতক্ষণ এ অবস্থা চলেছিল মনে নেই। বড়জোর আরও মিনিটখানেক। তারপরেই চাপ ভাবটা সরতে লাগল। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল শরীর। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে দেখতে পেলাম নতমুখে নেমে আসছে দিদি-দাদারা, আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুবৎ।

দাদা নিচু স্বরে, অনেকটা টেলিগ্রাফিক মেসেজ শেষ হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, ওভার।

কে যেন প্রশ্ন করল। বোধহয় আমার মাসতুতো ভাই, টাইমটা নোট করেছ?

—আমরা পৌঁছনোর আগেই...। ওরা বলল পাঁচটা সাত।

ছোড়দা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, আমাদের আরেকটু আগে ডাকতে পারত!

মৃত্যুর আগে বাবার কি একবারও জ্ঞান ফিরেছিল! বাবা কি খুঁজেছিলেন আমাদের!

দিদি কাঁদছিল, বড় বউদি ছোট বউদিরাও।

দাদা সিগারেট ধরাতে গিয়ে কয়েকটা কাঠি নষ্ট করল। চোখের কোল মুছল আঙুল দিয়ে, এখানে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি কোরো না। বাড়ি গিয়ে মাকে খবর দাও, আমরা বডি নিয়ে আসছি।

মা খুব শান্তভাবেই গ্রহণ করেছিল দুঃসংবাদটা। যেন জানতই বাবা আর ফিরবে না। যেন এই ক'দিন ধরে একটা এলেবেলে যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিলাম আমরা। অমোঘ নিয়তির সঙ্গে। কিছুক্ষণ স্থির থেকে বলল, এবার তাহলে তোমাদের শেষ কর্তব্যগুলো সেরে ফ্যালো।

মা চিরকালই শক্তপোক্ত মানুষ, নিজেকে প্রকাশ করে না সহজে। তা বলে বাবার মৃত্যুতেও এত নিরুত্তাপ! এত সমাহিত!

নিজেকে দেখেও খুব আশ্চর্য হচ্ছিলাম আমি। বাবার জন্য যতটা কাঁদা উচিত, ততটা কান্না আসছে না। বরং কেমন নির্ভার লাগছিল নিজেকে। সেই যে ভয়ঙ্কর টানটা হাসপাতালে উঠেছিল, সেটা যেন কোন ম্যাজিকে উধাও। সামান্য চাপ ভাব একটা ছিল বটে, তবে তা তেমন কিছু নয়। অথচ আমি ট্যাবলেটও খাইনি, স্প্রেও নিইনি, বাতাসে গুমোট ভাবও কমেনি এতটুকু! কেন এমন হয়েছিল!

মেয়েরা সাধারণত শ্মশানে যায় না, যেতে চায়ও না, কিন্তু আমি গেলাম। দিদি গেল না, বউদিরাও কেউ গেল না, আমি কেন গেলাম কে জানে! ভেতর থেকে কেউ কি ঠেলছিল আমাকে? শেষ দেখা পাক না-পাক, সবাই তো দৌড়ে

গিয়েছিল, একা আমি যেতে পারিনি—এই ঘটনাটুকুই কি উচিত-অনুচিতের বোধ উস্‌কে দিচ্ছিল? নাকি কর্তব্যে অবহেলার বোধ?

শ্মশানে পৌঁছতে সেদিন রাত হয়েছিল অনেক। প্রায় সাড়ে বারোটা। বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন দেরি করে এল, তার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শ্মশানে গিয়েও অপেক্ষা, ইলেকট্রিক চুল্লির সামনে সেদিন মৃতদেহের মিছিল। শুনে দেখা গেল আমরা হচ্ছি পনেরো নম্বরে, যত তাড়াতাড়িই হোক, ঘন্টা ছ'য়েকের আগে বাবা চুল্লিতে ঢোকার সুযোগ পাবেন না।

হালহকিকত বুঝে দাদাই তুলল কথাটা, আমার মনে হয় এখানে আমাদের অপেক্ষা করার কোনও মানেই হয় না।

আমরা দাদার কথা ঠিক ধরতে পারিনি। ছোড়দা জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কী করব?

—পাশেই তো কাঠের চুল্লি ফাঁকা পড়ে আছে। আমরা বাবাকে কাঠেও পোড়াতে পারি।

গত ন'দিনে পাঁচ রাত জাগার পালা পড়েছিল ছোড়দার, কালও জেগেছিল হাসপাতালে। সে খুব একটা ভাবার সময় নিল না। বলল, কাঠে পোড়ানোই তো ভাল। মোর ট্র্যাডিশনাল। বাবা মাঝে মাঝে বলত না, আমাকে তোরা কাঠেই দিস, চুল্লিতে ঢুকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি বাবার দেহটি ছুঁয়ে বসে ছিলাম। এক ঝলক দেখলাম বাবাকে। মরার পরেও দম বন্ধ হওয়ার ভয়! বাবার মাথাতেই এসব আসত বটে!

দাদা জিজ্ঞাসা করল, কী রে পুতুল, তুই কী বলিস?

অন্যমনস্কভাবে বলে দিলাম, তোমরা যা ভাল বোঝ করো।

প্রচুর চন্দন কাঠে চিতা সাজানো হল। জামাইবাবু অনেকটা ঘি কিনে এনেছিল, সবটুকু মাখিয়ে দেওয়া হল বাবাকে। যথাযথ শাস্ত্রবিধি মেনে চিতা প্রদক্ষিণ করল দাদা। বাবার মুখে আগুন ছুঁইয়ে দিল। চিতা জ্বলে উঠল দাউদাউ।

বাবা পুড়তে শুরু করলেন। বাবা নিঃশেষ হতে শুরু করলেন।

তখনই একটা বাতাস উঠল। ঝোড়ো ঠাণ্ডা। সারাদিনের ভ্যাপসা গরম ফুঁড়ে ছুটে এল এক দামাল কালবৈশাখী। রক্তবর্ণ আকাশ ফালা ফালা হয়ে গেল নীল বিদ্যুতের চাবুকে। ঝমাঝম বৃষ্টি নামল।

ঝড়ের আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গেছি আমরা। শ্মশানেই একটা পাকা শেড ছিল, প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় পলকে ছুটে গেছি তার নীচে। নিজেদের মাথা বাঁচাতে।

মুহূর্ত-পরেই হুঁশ ফিরল। বাবা একা। মুহূর্তেই ছুটে গেছি বাবার কাছে। দাদারাও

এসেছে পিছুন পিছুন। চিতা অবধি পৌঁছনো হল না, তার আগেই শিউরে উঠেছি আমরা।

যা দেখছি তা কী সত্যি!

জল পড়ে চিতা প্রায় নিভু-নিভু। ধিকিধিকি আগুনের মধ্যিখানে খাড়া উঠে বসে আছেন বাবা। শরীরের প্রায় কিছুই পোড়েনি তখনও, এখানে ওখানে কিছু ঝলসে যাওয়ার দাগ। একমাত্র চোখ দুটো গলে গেছে। চোখের জায়গায় দুটো বড় বড় গর্ত।

ঠিক যেন এক অন্ধ মানুষ!

দুই

বাবা কোনও দিনই খুব একটা চক্ষুষ্মান ছিলেন না। সফলও না। বরং তাঁকে মোটামুটিভাবে সাংসারিক দৃষ্টিহীন এক আদর্শ বিফল মানুষ বলা যায়। চাকরি করতেন খুব সাধারণ। সারাজীবন খেটেখুটে কনিষ্ঠ কেরানী থেকে বড়বাবু হয়েছিলেন, এইটুকুনই তাঁর সাফল্য। অফিসের ছেলেছোকরারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত। বলত, চিত্তদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়, গাধার খাটুনি খেটে ধন্য হয়ে যায় চিত্তদা। সত্যি, চাকুরি নিয়ে বাবার মধ্যে কখনও কোনও ক্ষোভ দেখিনি! অফিসের কর্তাব্যক্তিরা বাবার পরিশ্রমের কোনও মূল্য দেয়নি, তাই নিয়েও বাবার কোনও হিলদোল ছিল না। বাবা শুধু কাজ করেই সন্তুষ্ট।

বাবার এই অল্পে সন্তুষ্টি আমাদের পছন্দ ছিল না। ছেলেবেলাটা আমাদের বেশ অনটনে কেটেছে, হয়তো সেই জন্যই। আমাদের বড় হয়ে ওঠার মূলে বাবার বিশেষ অবদান ছিল না। মা'ই আমাদের সংসারের শক্ত খুঁটি।

বাবার সামান্য আয়ে কী নিপুণ হাতে মেপেজুপে সংসার চালাত মা!

মার সঙ্গে বাবার সব বিষয়েই ঘোরতর অমিল। আমাদের মা প্রকৃত সুন্দরী, বাবাকে চেষ্টা করেও সুদর্শন বলা কঠিন। মার গানের গলাটি চমৎকার, বাবার কণ্ঠে সুরের রেশটি ছিল না। মা বলত মূর্তিমান অ-সুর। মা'র সেলাইয়ের হাতটি কী অসাধারণ! শিল্পীর আঁচড়ে আগে কাপড়ে ছবি এঁকে নিত মা, তারপর রং মিলিয়ে সুতোর কাজে ভরাট করত ছবি। দেখে মনে হত যেখানে যে রংটি মানায়, সেখানে ঠিক সেই রংটিই পছন্দ করেছে মা। আর বাবা? তিনি তো ভাল করে রংই চিনতেন না। মেরুন ম্যাজেন্টা রানি সবই বাবার চোখে এক—লাল।

মাঝে মাঝে বড় বিস্ময় জাগে, কী করে বাবার সঙ্গে মার বিয়েটা হয়েছিল।

খুব গরিব ঘরের মেয়ে ছিল মা, সেই জন্যই কি? কিন্তু বাবাও তো এমন কিছু রাজাবাদশা ছিলেন না? শুনেছি, দাদু মানে আমার মার বাবা নাকি একবার এক দুর্ঘটনায় আহত হন, বাবাই নাকি তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যান। বাবার দৌলতেই সেবার প্রাণে বেঁচে যান দাদু। তিনি হাসপাতাল থেকে ফেরার বছরখানেকের মধ্যেই মা-বাবার বিয়েটা ঘটেছিল। সম্ভবত দাদুর আগ্রহেই। মা কি মন থেকে মেনে নিতে পেরেছিল বিয়েটা? কে জানে। তবে লক্ষ করেছি, বাবার প্রতি মার চিরকালই একটা নাকউঁচু ভাব ছিল। শীতল ঔদাসীন্যও। বাবার একবার এক কঠিন অসুখ হয়। খুব খারাপ ধরনের প্লুরিসি। আমি তখন ক্লাস ফাইভ কী সিক্সে পড়ি। আমাদের কাউকে তখন বাবার ঘরে ঢুকতে দিত না মা। বাবা আমাদের চুপি চুপি ডাকলেও মা ঠিক দেখতে পেয়ে যেত, ঘর থেকে টেনে বার করে নিত সঙ্গে সঙ্গে। বাবার থালা আলাদা, গ্লাস আলাদা, বাবা তখন বলতে গেলে প্রায় অচ্ছুত। একমাত্র মা ঢুকত বাবার ঘরে। ওষুধবিষুধ খাওয়াত, পথ্যি দিত, রাত্রে শুতও বাবার কাছে, কিন্তু বাবার অসুখে মা খুব কাতর হয়ে পড়েছে, এমনটি কখনও মনে হয়নি।

বাবা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। আমাদের নাক দিয়ে এক ফোঁটা কাঁচা জল ঝরলেও মাকে অতিষ্ঠ করে তুলতেন। শুধু আমাদের কী বলি, কোন আত্মীয়স্বজনের বিপদে অসুখে না ছুটতেন বাবা! নিজের ভাইবোনদের জন্য তো বটেই, এ ছাড়াও যত নিকট-দূরের জ্ঞাতিগুষ্টি আছে, কারোর একটু খারাপ খবর পেলেই বাবা সেখানে হাজির।

মা ভীষণ চটে যেত। বলত, সাতজন্মে কে কবে তোমার খোঁজ রাখে? আমাদের হাঁড়ি চড়ছে কিনা ভুলেও দেখতে আসে কেউ?

বাবার এক উত্তর, কী করব, থাকতে পারি না যে। বুকের ভেতরটা কেমন আনচান করে।

আত্মীয়স্বজনরা বাবাকে দেখে যে খুব গদগদ হয়ে পড়ত, তাও কিন্তু নয়। একবার তো মেজকাকার বাড়িতে বাবা যথেষ্ট অপমানিত হয়েছিলেন। ভাইঝির খুব কাশি হয়েছে শুনে কোথায় কোন ঝোপ ঘেঁটে গাদাখানেক বাসকপাতা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই পাতার রস খেয়ে কাকার মেয়ের গলা ফুলে ঢোল। পাতায় বোধহয় বিষাক্ত কিছু লেগে ছিল। কাকিমার মুখে পাঁচ কথা শুনে বাড়ি এসে মুখ চুন করে বসেছিলেন বাবা।

মা বলেছিল, ঠিক হয়েছে। যাও আরও! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল!

বাবার মুখ কাচুমাচু, আমি ওদের কাজের মেয়েটাকে পাতা ধুয়ে বাটতে বলেছিলাম। সে যদি ভুল করে...

—থামো তো! ওদের কি ওষুধ কিনে খাওয়ার পয়সা নেই, তুমি পাতা গেলাতে গেছ?

বাবার মুখে নির্ভেজাল হাসি, নেড়ির গলা একটু ফুলেছে, কিন্তু সত্যিই কাশিটা চলে গেছে গো। কাশতে কাশতে গলা চিরে গিয়েছিল বেচারীর।

তো এই ছিলেন আমাদের বাবা। যেচে অন্যের দায় নিজের ঘাড়ে নেওয়া, অকারণ উদ্বেগে আকুল, শিল্পসৌন্দর্য বিষয়ে রসকষবিহীন এক মাটো মানুষ।

কত ঘটনা যে আছে বাবার, বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়। কত পারিবারিক প্রলয় ঘটে গেছে বাবার জন্য। মারা যাওয়ার মাসচারেক আগে কী কাণ্ডটাই না হল! ছোড়দার ছেলের সামান্য জ্বর, তেমন কিছুই না, ওরকম জ্বরজারি বাচ্চাদের হয়ই, বাবা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দিনের বেলা টুটুলের মাথার কাছে বসে আছেন, ঠিক আছে—রাত্তিরেও যা শুরু করলেন, আধ ঘন্টা অন্তর ছোড়দাদের দরজায় টোকা দিচ্ছেন।

—বাচ্চু, টুটুল ঘুমোল!

—এই বাচ্চু, একবার থার্মোমিটার দিয়ে জ্বরটা দ্যাখ!

—বাচ্চু, টুটুল কাশল কেন? সিরাপটা একটু খাইয়ে দে না?

একে শীতের রাত, বার বার লেপ ছেড়ে উঠতে হচ্ছে, তার ওপর বাবার প্যানপ্যানানিতে ছোড়দা ছোটবউদি ধৈর্যের শেষ সীমায়।

শেষমেশ ছোড়দা বলে উঠল, আহ্ বাবা, বিরক্ত কোরো না তো! টুটুল তোমার ছেলে নয়, আমাদের ছেলে, ওর ভাবনা আমাদেরই ভাবতে দাও।

ছোটবউদি ছ্যারছ্যার শুনিয়ে দিল,—সাধে কি দাদারা কেটেছে এখান থেকে? ওই আদরের অত্যাচার আর সহ্য হয় না!

মা কোনও দিন বাবার পক্ষ নেয় না, সেদিন ছোট বউদির খোঁটায় দুম করে খেপে গেল, তোমাদের না পোষায় তোমরাও চলে যাও, কে আটকে রেখেছে?

এক কথা থেকে দু'কথা। দু'কথা থেকে চার কথা। ছোটবউদি পরদিনই ছেলে নিয়ে সোজা বাপের বাড়ি। তিনি না ফেরা পর্যন্ত ছোড়দারও মুখ এতখানি। বাড়ির লোকের সঙ্গে টোটাল নন-কোঅপারেশান।

আমি তখন বাবাকে বলেছিলাম, কী এক-একটা কাণ্ড করে বসো বলো তো? যেচে মান খোয়াতে তোমার ভাল লাগে?

বাবার কোনও তাপউত্তাপ নেই। বললেন, ওদের কথা গায়ে মাখলে চলে? রাগের মাথায় কী বলতে কী বলেছে, রাগ পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—তোমার শিক্ষা হবে না বাবা। দাদার মতো ছোড়দাও যখন মানে মানে সরে পড়বে তখন টেরটি পাবে।

—কী যে তোরা বলিস! বাবলু কি শখ করে এ বাড়ি থেকে চলে গেছে? নেহাত অফিসের কোয়ার্টারে না গেলে নয়, তাই না...

আমার আর বোঝানোর প্রবৃত্তি হয়নি। দাদা-বউদি যে পৃথক হবে বলেই চলে গেছে, অফিসের কোয়ার্টার পাওয়াটা একটা ক্যামোফ্লেজ, এ কথা বাবার মাথায় কোনওদিনই ঢোকেনি।

দাদার চলে যাওয়াতে আমি অবশ্য তেমন দোষ দেখি না। দাদার যে রকম বড় চাকরি, যে ধরনের মানুষের সঙ্গে দাদার ওঠা-বসা, ক্লাব-পার্টি, এ বাড়িতে থেকে সেটা মানাত না। তাও কি দাদা বাবার হাত থেকে ছাড়ান পেয়েছিল? দিব্যি কর্তাগিন্নি মনের মতো করে আলাদা হয়েছে, সেখানেও প্রতিদিন সকাল না হতে গিয়ে বসে আছেন বাবা! এটা ঝাড়ছেন, ওটা পরিষ্কার করছেন, এই শোকেসের পুতুল ওই ক্যাবিনেটের মাথায় তুলছেন, যেন ওটা বাবার নিজেরই ফ্ল্যাট। দাদা বাড়িতে পার্টি দিল, সেখানেও হংসো মধ্যে বকো যথা হয়ে বসে আছেন বাবা। অফিসের লোকদের সামনে দুমদাম বেফাঁস মন্তব্য করে বসছেন! বাবলুটা আমার কমজোরি, ওকে যেন বেশি খাটাবেন না! অত মদ খাচ্ছেন কেন, মাতাল হয়ে যাবেন যে! দাদা তো খেপে মেপে এসে মাকেই শাসিয়ে গেল! বাবার যদি ওবাড়ি যাওয়া বন্ধ না করো, তাহলে কিন্তু আমরা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব! সে এক বিদিকিচ্ছিরি পরিস্থিতি।

দিদির সংসারেও কম কেচ্ছা করে এসেছেন বাবা! দিদির শাশুড়িটার আট বছর আগে সেরিব্রাল হয়েছিল, তারপর থেকে তিনি চব্বিশ ঘন্টাই বিছানায়। হাত নড়ে না, পা নড়ে না, পাশ ফিরতে গেলেও ফিরিয়ে দিতে হয়, কিন্তু মুখের কমতি নেই বুড়ির। বেডপ্যান দিতে পনেরো সেকেন্ড দেরি হলে গালাগালির চোটে দিদির ভূত ভাগিয়ে দেবেন, অথচ তাঁর সব কিছু করতে হবে দিদিকেই। আয়া একটা রাখা আছে, তাকে দিয়ে চলবে না। ওই শাশুড়ির পিছনে খাটতে খাটতে দিদির অ্যানিমিয়া হয়ে গেল। মুখ শুনতে শুনতে প্রেসার লো। জামাইবাবু ভীষণ মাতৃভক্ত, সে মায়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই শোনে না। বাবা গিয়ে ঝপ করে একদিন তাকে বলে এল, তোমাদের আমি মেয়ে দিয়েছি বিপ্লব, ঝি দিইনি! তোমার মা তো মরবেনই, তার সঙ্গে আমার মেয়েটাকে মারছ কেন?

জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির এই লাগে তো সেই লাগে। বাড়ি বয়ে এসে কেঁদে গেল দিদি, মা, বাবাকে থামাও। এমনিতেই প্রচুর অশান্তির মধ্যে আছি, তার ওপর উটকো ঝগড়া আর ভাল লাগে না।

বাবাকে থামানো কি সহজ কথা! বাবার স্নেহের রথ ছুটবেই। এক অদ্ভুত বাস্তববোধহীন কাছাখোলা মানুষ ছিলেন বাবা।

বাবাকে দেখে আমরা লজ্জাই পেয়েছি চিরকাল। তাঁর দৃষ্টিহীনতায় আমাদের মাথা হেঁট থেকেছে। তাঁকে দেখেই আমরা শিখেছি কী রকম হলে জীবনে ব্যর্থ হয় মানুষ, আর কী রকমটি না হলে এই দুনিয়ায় প্রাপ্তিযোগের কমতি থাকে না।

আমরা কি চূড়ান্ত সফল? জানি না। তবে বাবার মতো হেলাফেলার বস্তুও নই। পড়াশুনোয় আমরা ভালই ছিলাম। দাদা ইঞ্জিনিয়ারিং করে মালটিন্যাশনাল কোম্পানির উঁচুতলার চাকুরে। ছোড়দা অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রিতে এম এস সি, নিজের কেমিক্যালসের কারখানা আছে। চালু ব্যবসা। আমাদের মধ্যে দিদি মার গলাটি পেয়েছিল, গানও শিখেছে মনপ্রাণ দিয়ে। এক জলসায় দিদির গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিল জামাইবাবু। পাত্র হিসেবে জামাইবাবু এ ক্লাস। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নিজেরই ছোট ফার্ম, গাড়ি আছে, ফ্ল্যাটও। আমি কলেজে পড়াই। বিয়ে করিনি।

আমার বিয়ে না করার কারণটা কেউ স্পষ্ট জানে না। সকলের ধারণা ওই বেয়াড়া হাঁপানির টানটার জন্যই বিয়েতে আমার অনীহা। সেরকমই আমি বলতাম কিনা।

এ ছাড়া বলিই বা কী? জগৎসুদ্ধু লোককে কী করে বলে বেড়াই শৈবাল নামের এক বোকা ছেলে আমার অহঙ্কারেই আত্মহত্যা করেছে! হুল্লোড়বাজ অপদার্থ ছেলেটা যদি একতরফা আমার প্রেমে পড়ে সে কি আমার দোষ? প্রথম থেকেই তো আমি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম, তোমার লিমিট কেরানীগিরি, ইউনিভার্সিটির সেরা মেয়েটার দিকে চোখ তুলে তাকানো তোমার শোভা পায় না। শৈবাল শুনল কই! অবুঝপনা করত। বিরক্ত করত। তুমি রিফিউজ করলে আমি বিষ খাব! রেললাইনে গলা দেব! রাগ করে বলেছিলাম, সেটাও অন্তত করে দেখাও। সত্যি সত্যি করে দেখিয়ে দিল! উল্টোডাঙার কাছে রেললাইনে দু'আধখানা হয়ে পড়ে রইল শৈবাল। পকেটে চিরকুট—কেউ দায়ী নয়।

কিছুটি জানতে পারল না কেউ। আমার দিকে আঙুলও তুলল না। শুধু আমার ফুসফুসটা কেমন কমজোরি হয়ে গেল। সর্বনাশা রোগ বাসা বাঁধল শরীরে। কতবার নিজেকে বলেছি, একটা নিপাট মূর্খের জন্য কষ্ট পাওয়ার কোনও যুক্তি নেই। কিন্তু বুককে চাবকে সিধে করি সে জোর আমার কোথায়? নিজে-নিজেই পুড়ি আমি। নিজের মধ্যেই রচনা করি এক অকারণ যন্ত্রণার বৃত্ত।

একমাত্র বাবাই কি আন্দাজ করেছিলেন কিছু? নাহলে মৃত্যুর বছরতিনেক আগে কেন হঠাৎ বললেন, রোগটা তোর কী করে এল রে পুতুল? এ কষ্ট তো আগে ছিল না তোর! আমাদের বংশেও তো কারও এ রোগ নেই!

মনে আছে তখন শীতকাল। পিঠে তিনটে বালিশ নিয়ে কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছি

আমি, হিমকণা জমাট বেঁধেছে বুকে। অজান্তেই জল ঝরছে চোখ বেয়ে। তবু প্রাণপণে হাসার চেষ্টা করেছিলাম, শহরে যা পলিউশন! এ অসুখ এখন ঘরে ঘরে!

বাবা আমাকে দেখছিলেন। হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মাথায়। কেউ যেন শুনতে না পায় এমন নিচু স্বরে বললেন, মনের কষ্ট চেপে রাখিস না পুতুল, উগরে দে।

বাবা কি জেনেছিলেন কিছু! না নিছকই অনুমান।

অনুমান, না অনুভব।

আমার অন্ধ বাবার কি তৃতীয় নয়ন ছিল!

তিন

বাবার শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছিল খুব ঘটা করে। আমরা চার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে প্রচুর খরচা করেছিলাম শ্রাদ্ধে। চারদিকে যত আত্মীয়-পরিচিত আছে, সব্বাইকে বলেছিলাম। সে প্রায় শ'পাঁচেক মতো হবে। নিয়মভঙ্গের দিনও দেড়শো পাত পড়েছে। কেটারার দিয়ে মাছ মাংস পোলাও মিষ্টি, সে এক এলাহি আয়োজন। সব শেষে বাবা যা যা খেতে ভালবাসতেন সব একটা থালায় সাজিয়ে ছাদে রেখে আসা হয়েছিল। স্বচক্ষে দেখেছি কাকের পাল এসে খেয়ে গেল সবটুকু।

বাবা তৃপ্ত হলেন। আমরাও।

কিছুদিন পর থেকে কয়েকটা ঘটনা ঘটতে শুরু করল। ঘটনা ঠিক নয়, হয়তো এগুলো হওয়ারই ছিল। কিন্তু এমনভাবে ঘটতে থাকল, আমরা নজর না করে পারলাম না। বেশ কিছুদিন ধরে দাদা কোম্পানিতে একটা লিফট পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল। হঠাৎ পেয়ে গেল। এক ধাপ নয়, একেবারে কয়েক ধাপ। কোম্পানির বাঙ্গালোরের ফ্যাক্টরির প্রায় কর্ণধার হয়ে বসল দাদা। বছরখানেক ধরে ছোড়দা কেমিকাল এক্সপোর্টের চেষ্টা চালাচ্ছিল, হঠাৎই একসঙ্গে তিন দেশ থেকে অর্ডার—বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, তাইল্যাণ্ড। কয়েক কোটি টাকার অর্ডার, ছোড়দা যা কখনও কল্পনা করেনি। দিদির শাশুড়ি, যাঁর সম্পর্কে ধারণা ছিল তিনি অন্তত হাজার বছর বাঁচবেন আর বিছানায় শুয়ে অবিরাম মানসিক অত্যাচার চালাবেন দিদির ওপর, ঝুপ করে এক ঘুমের মধ্যেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন চিরতরে।

সবই ঘটল বাবার মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে।

আমার মধ্যেও এক অভিনব পরিবর্তন এল। বাবা চলে যাওয়ার ক্ষণেই শেষ দেখা দিয়েছিল টানটা, তারপর থেকে যেন একেবারে হাল্‌কা হয়ে গেছে। গরমকাল

আর বর্ষাকাল—একটি বারের জন্য পাথর-চাপা-ভাবটা ফিরল না। রুক্ষ, গোঁড়া মেজাজি বলে আমার বদনাম ছিল, কারও সঙ্গে মিশতে ভাল লাগত না, সবটাই কি শারীরিক কারণে? হয়তো না। মনেও বোধহয় কিছু বাধা ছিল। আচমকা আবিষ্কার করলাম, দিব্যি হাসিখুশি হয়ে গেছি আমি। জোরে জোরে কথা বলছি, হাসতেও ভাল লাগছে আমার। মাঝেমধ্যে দু'একটা গানের কলিও গুনগুন করছে বুকে।

মাও যেন আর ঠিক আগের মতো নেই। মাকে আমি কোনও দিনই বেশি কথা বলতে দেখিনি, কেজো সাংসারিক কথা ছাড়া মার যেন কোনও কথা থাকত না। সেই মাকে দেখি আমি কলেজ থেকে ফিরলেই কত হাবিজাবি গল্প করে আমার সঙ্গে। ছেলেবেলার কথা, দাদু, দিদা, মামা-মাসিদের গল্প, আরও কত কী যে! কবে একবার ছাতুবাবুর বাজারে চড়কের মেলায় গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, গরমের ছুটিতে কোন নস্যিবুড়ির গাছ থেকে জামরুল পাড়তে যেত, কুয়োয় ঘটি পড়ে গেলে কোত্থেকে ঘটিতোলা এসে হাজির হয়ে যেত, এরকম অজস্র গল্পের ঝাঁপি খুলে বসত মা।

মার মধ্যেও এত গল্প জমা ছিল! নাকি আমাকে খুশি দেখেই মার ওই অর্গলমুক্তি! ছোটতে তো আমি হাসিখুশিই ছিলাম, তখন মার মুখে ওসব গল্প শুনিনি কেন? মার সুখের স্মৃতি কি হঠাৎ উথলে উঠল?

দাদা ছোড়দা দিদি মা, এমনকি আমার জীবন থেকেও অনেক অবরোধ সরে যাচ্ছিল। খুব দ্রুত। এত দ্রুত যে কাকতালীয় বলে মনেই হয় না। ধন্দ জাগে।

কে ওই অবরোধ সরাচ্ছিল—মনের, বাইরের পৃথিবীর?

বাবা!

চার

পুজোর পর বাঙ্গালোর থেকে দাদার চিঠি এল। চিঠিতে দাদা এক অদ্ভুত কথা লিখেছে। বাবাকে নাকি পর পর তিন চার দিন দেখতে পেয়েছে দাদা। রোজ কাকভোরে দাদা সামনের পার্কে জগিং করতে যায়, সেখানেই নাকি বসে থাকেন বাবা। একটা পাথরের বেঞ্চিতে। কাছে গেলেই মিলিয়ে যান।

আমরা পড়ে খুব হাসাহাসি করলাম। ছোড়দা বলল, দাদার কত বয়স হল রে?

—কত আর! মা-ই জবাব দিল, এই তো পৌষে তেতাল্লিশ পুরে চুয়াল্লিশে পড়বে।

—ওহ, তাহলে নির্ঘাত চালশে ধরেছে। চশমা নিতে লিখে দাও।

আমি বললাম, যাহ্। চালশে হলে তো কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধে হয়, দুরের জিনিস ভুল দেখবে কেন?

ছোট বউদি বলল, আমার মনে হয় দূর বিদেশে আছেন...দাদার বোধহয় বাবাকে এখন মনে পড়ে।

টুটুল সাত বছরেই সর্বজ্ঞ। সে বলল, তোমরা কিচ্ছু জানো না, এই সময়ে ভোরে খুব কুয়াশা থাকে, জেঠু কী দেখতে কী দেখেছে!

ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টাতেই ধামাচাপা পড়ে গেল। সাতদিন যেতে না যেতে দিদি একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে উদয় হল বাড়িতে। কী কাণ্ড, পরশুদিন নিউ মার্কেট থেকে বাজার করে বেরোচ্ছি, হঠাৎ দেখি বাবা! উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো ভাবলাম মনের ভুল। হয়তো বাবার মতো দেখতে অন্য কেউ। আমি যখন রাস্তা পেরোচ্ছি, তখনও বাবা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি চোখ টিপলাম, তুই আজকাল জামাইবাবুর দেখাদেখি চুমুক-টুমুক দিচ্ছিস নাকি?

—নারে! আজকেও দেখলাম! মিতুনকে নাচের স্কুলে দিয়ে ফিরছি, দেখি ঢাকুরিয়া ব্রিজ দিয়ে হেঁটে আসছে বাবা—আমার দিকে! খুব কাছে এসে হঠাৎ উবে গেল!

হাসতে হাসতে বললাম, জামাইবাবুকে বলেছিস?

—কী বলব? বাবার কথা? ও তো হেসে উড়িয়ে দেবে!

আমি দিদির কাঁধে চিমটি কাটলাম, তোর তো কপাল ভাল রে! বাবাকে দেখেছিস, ভাগ্যিস তোর শাশুড়ি দেখা দেননি!

মা চুপ করে শুনছিল। কিছু বলল না।

রাত্রে ছোড়দাকে শোনালাম গল্পটা। ছোড়দা আগের বারের মতো হাসল না, বরং খানিকটা গম্ভীরই হয়ে গেল। বলল, আমি তোদের একটা কথা বলিনি পুতুল! বাবাকে আমিও দেখেছি। বেশ কয়েকবার। একদিন ট্রামের পাদানিতে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি সিট থেকে উঠে এগিয়ে যেতেই ভ্যানিশ। একদিন এস্‌প্ল্যানেডে দেখলাম! মনোহর দাস তড়াগের পাশে গম্বুজগুলো আছে না, তার নীচে দাঁড়িয়ে। আমাকেই দেখছিল। পাশে দু'তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, তারা কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না ওখানে আরেকটা মানুষ আছে!

ছোট বউদিও চিন্তিত, হ্যাঁ, তোমার ছোড়দা ক'দিন ধরে ঘুমোতে পারছে না। বলতে বারণ করেছিল, তাই বলিনি। কী করা যায় বলো তো?

আমি কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করছিল।

এরা যা বলছে তা কি কখনও সত্যি হতে পারে? এতগুলো লোক একসঙ্গে হ্যালুসিনেশন দেখবে কী করে?

কলেজ খোলার পরদিনই আমার পালা এসে গেল। ছুটির পর কলেজের ফাঁকা করিডোর দিয়ে হেঁটে আসছি, বাইরের বাগানে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাবাকে। একটা গাঁদাগাছের পাশে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে ধুতি আর ফুলহাতা শার্ট, যেমনটি নিত্যই থাকতেন। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে বাবার, যেন কিছু বলছেন!

আমি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। চমকটুকু কাটিয়ে পলকে ছুটে গেছি বাগানের দিকে। নেই—কোথাও কেউ নেই! কুঁড়িভরা গাঁদাফুলের গাছ শুধু দুলছে হাওয়ায়!

কলেজ থেকে ফিরেই মাকে কথাটা বললাম। মা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আমি জানি সে আমাদের ছেড়ে যায়নি।

—তুমিও কি দেখেছ নাকি?

—নাহ্। মা মাথা নাড়ল, তবে সব সময়েই মনে হয় আশেপাশেই কোথাও আছে, এই ঘাড় ঘোরালেই দেখতে পাব।

পরদিন সন্ধেবেলা দিদিকে ডেকে জরুরি মিটিং বসল একটা। আমরা কেউই আমাদের চোখের দেখাটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি না, কিন্তু আমাদের সকলেরই মনে হচ্ছে বাবা যেন কিছু বলতে চান। যদি সত্যিই আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে তো তাঁর কথা আমাদের শোনা উচিত। আমরা শেষ মুহূর্তে বাবার কাছে কেউ পৌঁছতে পারিনি, নিশ্চয়ই বাবা খুঁজেছিলেন আমাদের! হয়তো বাবার কিছু বলার ছিল!

অনেক ভেবেচিন্তে দাদাকে টেলিফোন করলাম। কী করা যায়?

দাদা তেমন সদুত্তর দিতে পারল না। বলল, তোরা যা করবি, তাতে আমিও আছি। আমারও বড় অস্বস্তি হচ্ছে রে।

কয়েক মাস দোলাচলে কাটল। ঘনিষ্ঠ দু'চারজনের সঙ্গে আলোচনা করা হল, একেকজন একেক রকম পরামর্শ দেয়। কেউ বলে, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে এসো। কেউ বলে, বাড়িতে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করো, হোমযজ্ঞের ঠেলায় অতৃপ্ত আত্মা পালাতে পথ পাবে না। গোটা ব্যাপারটাকে উপেক্ষাও করতে বললে কেউ কেউ। তাদের মতে সময় গেলে মন স্থির হবে, তখন নিজেরাই আমাদের মনের ভুল বুঝতে পারব।

কোনও পরামর্শই আমাদের ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। যেমনই আলাভোলা মেঠো মানুষ হোন বাবা, তাঁকে কি ভূত বলে ভাবা যায়?

আরও কিছুদিন কাটল। ধীরে ধীরে বাবার দর্শন পাওয়ার হারটাও কমে আসছিল। দশদিন পনেরোদিন অন্তর হঠাৎ হয়তো কেউ একজন দেখতে পায় বাবাকে। মেট্রো রেলের স্টেশনে। লেকের পাড়ে। চৌরাস্তার মোড়ে।

বাবার বাৎসরিকের দিন-কুড়ি আগে ছোড়দা একটা কথা তুলল। ছোড়দার বন্ধুর কে এক মামা আছেন, তিনি নাকি সরাসরি আত্মার সঙ্গে কথা বলিয়ে দেন। টাকা পয়সার কোনও ব্যাপার নেই, তিনি নাকি সাধুসন্ন্যাসীও নন, এ নাকি তাঁর এক বিচিত্র খেয়াল। ছোড়দার কয়েকজন বন্ধুও নাকি ওই ভদ্রলোকের মাধ্যমে আত্মার সঙ্গে কথা বলেছে। যদি আমরা চাই, ছোড়দা তাহলে আমাদের পারিবারিক ঘটনা নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনা করবে।

দিদি তো খুবই রাজি। আমিও নিমরাজি হয়ে গেলাম। মাও বিশেষ আপত্তি করল না।

ছোড়দা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে এল। ভদ্রলোক বললেন, তিনি আসবেন। বাবার বাৎসরিকের দিন রাত্রিবেলা। আমাদের সব ভাইবোন আর মাকে উপস্থিত থাকতে হবে।

দাদাকে জানানো হল।

অধীর আগ্রহে বাৎসরিকের দিনটার প্রতীক্ষায় রইলাম আমরা। দিন যায়, বুক কাঁপে। বুক কাঁপে, দিন যায়।

কী বলার আছে বাবার?

পাঁচ

বাৎসরিকে প্রাণ ছিল না। কোনওভাবে নমো নমো করে শেষ হল কাজটা। আমাদের বুক গুড়গুড় করছিল, অতি সহজ কাজেও ভুল হয়ে যাচ্ছিল বারবার। পিণ্ডদানের সময়ে দাদার তো স্পষ্টতই হাত কাঁপছিল। সামান্য ক'জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি এবার, তারা সবাই খাওয়াদাওয়া করে চলে যেতেই আমরা টানটান।

অপেক্ষা করছি সন্ধ্যার।

সন্ধ্যা এল। গড়িয়ে গড়িয়ে পার হচ্ছে। যেন ভয় পাচ্ছে এগোতে।

সাড়ে আটটা নাগাদ ভদ্রলোক এলেন। সুপুরি গাছের মতো লম্বা চেহারা। ঋজু। কৃশ। দেখে বোঝা যায় গায়ের রং একসময়ে টকটকে ফর্সা ছিল, এখন

তামাটে। বয়স বছর ষাটেক, কিংবা তার কিছু বেশি। চোখ দুটো ভীষণ তীক্ষ্ণ। ঈগলনয়ন।

আমাদের সঙ্গে নিয়ে মার ঘরের দরজা বন্ধ করলেন ভদ্রলোক। নিজে মেঝেতে বসলেন, আমাদেরও বসতে বললেন ভূমিতে। ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা মাটির প্রদীপ বার করে সামনে রাখলেন, সঙ্গে এক শিশি রেড়ির তেল, খানিকটা তুলোও। প্রদীপে তেল ঢেলে তুলোর সলতে পাকাচ্ছেন।

এ কেমন প্ল্যানচেট! তেপায়া টেবিল নেই! মোমবাতি নেই!

ভদ্রলোক মুখ তুলছেন না, কী যেন বিড়বিড় করছেন। প্রদীপের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। পাখা বন্ধ করুন।

আলো নিবতেই অন্ধকার ঝেঁপে এল। ছমছম আঁধারে মার গা ঘেঁষে বসেছি আমরা—দাদা ছোড়দা দিদি আমি।

ভদ্রলোক প্রদীপ জ্বাললেন। শিখা একটু একটু করে উজ্জ্বল, কাঁপতে কাঁপতে স্থির হল একসময়ে। প্রদীপের শীর্ণ আলোয় চেনা ঘরটাকেও কেমন রহস্যময় লাগছিল। দেওয়ালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছায়া। ছায়ামূর্তিগুলো কি আমরাই।

ভদ্রলোকের ভারী স্বর শোনা গেল, আপনারা প্রদীপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন।

পীতবর্ণ শিখা দেখছি আমরা। বিভ্রম জাগছে চোখে। শিখা কি রং বদলাচ্ছে! এই তো হলুদ ছিল! এই নীল! নাকি লাল!

জলদ্‌গম্ভীর স্বর বাজল আবার, দেখছেন?

সমস্বরে বললাম, দেখছি।

—এবার আপনারা তাঁর মুখ স্মরণে আনুন। ওই শিখাতেই দৃষ্টি রেখে।

বাবার মুখ মনে করার চেষ্টা করছি। কী আশ্চর্য, কোনও মুখই মনে আসে না কেন? শৈশবের দেখা মুখ নয়, কৈশোরের নয়, যৌবনেরও নয়! প্রাণপণে মনঃসংযোগের চেষ্টা করলাম। কিছুই স্মরণে আসে না। চুরি করে দেওয়ালের দিকে তাকালাম। ও হরি, বাবার ছবিটা তো আজ বাৎসরিকের জন্য বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! ছবিটা যেন কেমন? ভাঙা-ভাঙা চোয়াল! চশমাপরা চোখ! চুল পাটপাট করে আঁচড়ানো! কিন্তু বাবার মুখটা কোথায় গেল? যত ভাবার চেষ্টা করি অন্য মুখ ফুটে ওঠে! শৈবাল!

কেমন যেন সংশয় হল। ঝট করে একবার দিদি-দাদাদের দেখে নিলাম। তাদের চোখের মণিও ইতিউতি ঘুরছে। দিদির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই আবার চোখ রেখেছি শিখায়।

ভদ্রলোক বললেন, আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্তপ্রিয়বাবুর মুখ মনে করছেন তো?

সত্যি বলতে সঙ্কোচ হল। বললাম, হ্যাঁ।

কথাটা যেন কোরাসে বেজে উঠল। আবছায়া মাখা ঘরে মাথা খুঁড়ছে বার বার। একমাত্র মা'ই নির্বাক। যেন সমাধিস্থ।

—এবার তা হলে আপনাদের কাছে আসবেন তিনি। কথা বলবেন।

সময় যাচ্ছে। সময় বয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ বসে আছি আমরা? দশ মিনিট? বিশ মিনিট? অনন্ত কাল?

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উঁহু, পাচ্ছি। দুটো চোখ। গলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। চোখের জায়গায় দুটো গর্ত। কুচকুচে কালো। নিবিড় অন্ধকারের মতো কালো।

ভদ্রলোকের মুখমণ্ডল ক্রমশ কঠিন হচ্ছিল। চোয়ালে চোয়াল ঘষছেন, নিশ্বাস ফেলছেন ঘন ঘন। কেমন যেন নির্দয় দেখাচ্ছিল তাঁকে। একসময়ে গমগমে স্বরে বলে উঠলেন, আপনারা মিথ্যে কথা বলেছেন। আপনারা আমার সময় নষ্ট করছেন।

আমরা নিরুত্তর। পাথরে ঘা খেয়ে ফিরে গেল কথাটা।

হাতের ঝাপটায় প্রদীপ নিবিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। নিকষ কালিমায় ছেয়ে গেল ঘর। যেন ঘর নয়, কয়লাখনির ভয়ঙ্কর খাদান।

কালো অন্ধকার গর্জে উঠল, চিত্তপ্রিয়বাবু আসবেন না। তিনি আপনাদের মধ্যে তো ছিলেনই না কোনও দিন।

দাদা মিনমিন করে বলল, তাহলে আমরা তাঁকে দেখি কী করে?

—চোখ আর কতটুকু দেখে! দেখে তো মন! মনকে জিজ্ঞাসা করুন, উত্তর পেয়ে যাবেন!

অলৌকিক বাতাসের মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। আমরা নিথর বসে আছি। মা'ও। চৈত্রের তাপে ঘামছি দরদর। আলো জ্বালাতে ভয় পাচ্ছিলাম আমরা। যদি পরস্পরের মুখ দেখে ফেলি! যদি ধরা পড়ে যাই!

ক্রমশ একটা শব্দ শোনা গেল। কান্নার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মা। ফ্যাসফেসে একটা আওয়াজ বেরোচ্ছিল মার গলা দিয়ে, অস্ফুটে কী যেন বলছিল মা, আমরা শুনতে পাইনি।

আমাদেরও চোখ ভিজে যাচ্ছিল। বাবাকে আমরা আদৌ দেখিনি কখনও। মৃত্যুর আগেও না, পরেও না। যা দেখেছি তা এক নির্জন ভালবাসার অলীক ছায়া।

আমরা কষ্ট পাচ্ছিলাম। বাবার মৃত্যুতে সেই আমাদের প্রথম শোক।

বাবা শুধু একা-একাই মারা যাননি। বাবা বেঁচেও ছিলেন বড় একা।

সাদা গুঁড়ো লাল রং

চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে নীলা বলল,—সরস্বতীর শয়তানিটা দেখেছ! আজ আবার ডুব মারল।

ফাল্গুনের সকাল। শুভময় সোফায় বসে কাগজ গিলছিল। অনেকটা ঝুঁকে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। এমন ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদেও তার কোনও হিল্‌দোল নেই, হাতের ইশারায় নীলাকে বসতে বলল শুধু।

নীলার খটকা লাগল। বাজার যাওয়ার আগে ভারি অলস মেজাজে থাকে শুভময়, নীলার বিরক্তির উত্তরে পাল্‌টা চুটকি ছোড়াই তার স্বভাব। আজ শুভময়ের মুখভাব যেন কেমন কেমন!

নীলা জিজ্ঞাসা করল,—কী হয়েছে?

—কেলো কেস। শুভময়ের স্বর চাপা,—সরোজ ধরা পড়েছে।

—কে সরোজ?

—আমাদের সরোজ। অফিসের সরোজ ব্যানার্জী। যার ছেলের পৈতেতে সেদিন খেয়ে এলে। কাল পার্ক স্ট্রিটের কোন্ বারে বসে পার্টির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল, ভিজিলেন্সের লোক গিয়ে... একেবারে কট্ রেডহ্যান্ডেড।

নীলা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। একেবারে সামান্যও নয়, আবার ভীষণও নয়। সরোজ ব্যানার্জী শুভময়ের পুরনো সহকর্মী, তবে তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ইদানিং দুজনেই এক অফিসে পোস্টেড বলে শুভময়ের মুখে নাম শুনেছে সরোজের, তবে দেখেছে সাকুল্যে ওই এক বারই। ওই পৈতের দিনই। মুখটাও মনে পড়ে গেল নীলার। ফর্সা, গোলগাল, মাথায় অল্প টাক, চোখ দুটো হাস্যময়। কথাবার্তায়ও ভারি অমায়িক, নীলাদের খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ তদারকি করছিল। মাংস

পোলাও-এর পালা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কেটারারকে ডেকে লাল্টুর পাতে জোর করে দুটো ফিশফ্রাই চাপিয়ে দিল। বেচারা লাল্টু একটা ফ্রাই তো ছুঁতেই পারল না। দেখে ভদ্রলোকের কী হাসি! কী মিসেস চক্রবর্তী, আজকাল ইয়াং ছেলেরাও ডায়েটিং শুরু করেছে নাকি! আমরা তো ওই বয়েসে...। শুভময় যে এত মুখের রক্ত তুলে পয়সা রোজগার করেছে, খাবেটা কে!

সেই লোকটা ধরা পড়েছে!

নীলা অবিশ্বাসের সুরে বলল,—যাহ্‌।

—যা নয়, হ্যাঁ। থার্ড পেজের লাস্ট কলামটা দ্যাখো।

খবরের কাগজখানা হাতে নিল নীলা। তেমন বড় সড় কিছু খবর নয়, জোর সাত আট লাইন। তবে তাকালেই হেডিংটা চোখে পড়ে যায়—ঘুষ নিতে গিয়ে সরকারি অফিসার ধৃত। ভেতরের লাইনের ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরগুলো পড়ছে নীলা। চোখ কুঁচকে, দৃষ্টি থেকে কাগজ বেশ খানিক তফাতে রেখে। সম্প্রতি নীলার চোখে চালশে এসেছে, চশমা করানো হয়নি। গড়িমসি। কী হবে ছাতার মাথা চোখে দুটো ঠুলি এঁটে! সিনেমা টিভি তো খালি চোখেই দিব্যি সাফ দেখা যায়।

শুভময় বড় বড় চুমুক দিচ্ছে কাপে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ছি ছি ছি, মানইজ্জত সব চলে গেল। কোথ্‌থাও আর মুখ দেখানো যাবে না।

—তোমার কি? পড়া থামিয়ে নীলা টেরচা চোখে তাকাল,—তোমাকে ধরেছে?

—এই না হলে মেয়েছেলের বুদ্ধি! দেখছ না, অফিসের নাম ধাম সব ছেপে দিয়েছে!

—তো? বিশ্বসুদ্ধু সবাই বুঝি তোমার অফিসের নাম জেনে বসে আছে?

—চেনা লোকেরা তো জানেই। শুভময় গোঁজ মুখে কিংসাইজ সিগারেট ধরাল,—বাকিরাও জানে। না জানার ভান করে।

—জানলে জানে। অত কেয়ার করার কী আছে?

কথাটা নীলা বলল বটে, তবে স্বরে যেন তেমন প্রত্যয় ফুটল না। আশঙ্কাটা তার বুকেও ছ্যাঁক করে উঠেছে। এই না বাপের বাড়ি থেকে ফোন এসে পড়ে। বাবা দাদা করবে না, তারা যথেষ্ট বুঝদার। কিন্তু বউদি? তা ওই কৌতূহলী মার্জারীকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা অবশ্য আছে নীলার। স্ট্রেট কাট্‌ বলে দেবে, চোর ডাকাত আজকাল কোন্‌ অফিসে নেই ভাই! আগেও ছিল, চিরকালই থাকবে। উৎকোচ শব্দটা বাংলা নয়, সংস্কৃত।

শুভময় কাকে যেন ফোন করতে উঠল। বোধহয় অফিসের কোনও বন্ধু-টন্ধুকে। নিচুগ্রামে বাক্যালাপ চলছে, এত নিচু যে স্বরযন্ত্রের ওঠা নামাকে অলীক

বলে ভ্রম হয়। ফিরে এসে আবার একটা সিগারেট ধরাল, দু টান দিয়েই নিবিয়ে দিল। এক হাতে কপাল চেপে বসে আছে। হঠাৎ পাড়ার থিয়েটারের স্বগতোক্তির ঢং-এ বলে উঠল,—একেবারে ক্যালাস্। মাথামোটা। একুশ বছর চাকরি হয়ে গেল, *অ্যাদ্দিন পর ধরা পড়ার কোনও মানে হয়!*

আক্ষেপের মর্মার্থ সঠিক উদ্ধার করতে পারল না নীলা। আগে ধরা পড়লে তার বুঝি কোনও মানে হত?

চিন্তিত মুখে নীলা প্রশ্ন করল,—এখন তা হলে কী হবে?

—কার? সরোজের? শুভময় ফোঁস করে শ্বাস ফেলল,—ধরে নাও, চাকরি গন্।

—চাকরিই গন্?

—আপাতত সাসপেন্ড হবে, কেস চলবে...যদি তরে গেল তো ভাল, নইলে...হাতে নাতে ধরা পড়েছে, এ কেসে বাঁচা খুব মুশ্‌কিল।

—ইশ্, ফ্যামিলিটা তো তাহলে ভেসে গেল!

—হুম্। অত সুন্দর সুন্দর দুটো ছেলেমেয়ে...তুমি তো দেখেছ, ছেলেটা সামনের বছর সি বি এস সি দেবে। মেয়েটাও কী একটা কনভেন্টে পড়ে। ক্লাস এইট। ভাইবোন দুটোই নাকি লেখাপড়ায় খুব ব্রিলিয়ান্ট।

—মেয়েটার কথাবার্তাও খুব মিষ্টি। কী সুন্দর প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে সকলকে আপ্যায়ান করছিল।

—মেয়েটার চোখে কী একটা প্রবলেম হচ্ছে। সরোজ মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। গরমের ছুটিতে ম্যাড্রাসে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবে বলছিল।

—আহারে। নীলার মন দুঃখে ভরে গেল,—ওদের বাড়িতে একটা ফোন করো না। তোমার অ্যাদ্দিনের কলিগ, একটা তো খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

এক মুহূর্ত থমকে থেকে শুভময় বলল,—খেপেছ? এই সময়ে? কী করতে কী হয়ে যাবে...। থলি দাও, বাজার সেরে আসি। আজ একটু সকাল সকাল অফিস বেরোব।

পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে গেল শুভময়।

লাল্টু এখনও ঘুমোচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আর তিন হপ্তা মতো বাকি, রাত জেগে পড়ে ছেলে, উঠতে বেলা হয়। নীলা ছেলের ঘরে ঢুকে চারদিকের ছত্রখান চেহারাটা দেখল একবার। টেবিল অগোছালো, জামাকাপড় লুটোচ্ছে মেঝেয়, খাটময় বইখাতা। বালিশের পাশে ওয়াকম্যান। গান শুনতে শুনতে অঙ্ক কষে লাল্টু, ওতে নাকি মনোযোগ বাড়ে। ছেলে শুয়েও আছে দ্যাখো কেমন কুঁকড়ে মুকড়ে, যেন শিশুটি! আপন মনে হাসল নীলা, দ্রুত হাত চালিয়ে মোটামুটি বিন্যস্ত করল

ঘরটাকে। বেরিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার মুখে কী ভেবে একটু থামল। সেন্টার টেবিল থেকে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে সোজা চালান করে দিল নিজেদের ঘরের বিছানার নীচে। শুভময়দের খবরটা লাল্টুর না দেখাই ভাল। এমনি অবশ্য ছেলের কাগজ পড়ার তেমন নেশা নেই, ওই খেলার পাতাই যা দেখে দুচার মিনিট। দরকার কি, যদি চোখে পড়ে যায়! কী ভাবতে কী ভাববে, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন জুড়বে, মিছিমিছি বিব্রত হবে শুভময়।

নীলা কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ল। সিঙ্কে গত রাতের বাসনের কাঁড়ি, একটা একটা করে মাজছে। চেপে চেপে। ঘষে ঘষে। সরস্বতীটা মহা নেমকহারাম। এত টাকা মাইনে দেওয়া হয়, তবু কথায় কথায় কামাই, কথায় কথায় কামাই। এ মাসে ছাড়বে না নীলা, মাইনে কাটবে। কাজ ছেড়ে দেয় দিক, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। চড়াং করে মনে পড়ল, কাপড়ের স্তূপ ভেজানো রয়েছে বাথরুমে। হা ঈশ্বর, ওসব এখন কে কাচে, কে মেলে! কদ্দিন ধরে শুভময়কে বলছে, একটা ওয়াশিং মেশিন কেনো, একটা ওয়াশিং মেশিন কেনো...! আচ্ছা, সরোজ ব্যানার্জীর ছেলেমেয়ের স্কুলে খবরটা জানাজানি হলে কী হবে? ইস্, বাচ্চা দুটোর ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। লাল্টু ঘঙ ঘঙ কাশছে কেন? উঠে পড়েছে কি? সকালের দিকে এখনও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে, ফুল স্পিডে ফ্যান না চালিয়ে ঘুমোয় না ছেলে, পরীক্ষার আগে অসুখ বিসুখ না বাধিয়ে বসে। কী ব্রেকফাস্ট করা যায় আজ লাল্টুর জন্য? সেই টোস্ট ওমলেট কলা? নাকি চিকেন স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেবে? ফ্রিজে তো মুরগি সেদ্ধ করা আছেই। দুধ খাওয়া নিয়ে বড় নকর ঝকর করে লাল্টু, আজ একটু চকোলেট গুলে দিতে হবে। সরোজ ব্যানার্জী কি বারে মদ গিলছিল? মনে হয়, তাইই। মোদোমাতালরা ভারি অসাবধান হয়। ভাগ্যিস শুভময়ের ওই কুঅভ্যাসটি নেই! ও হরি, শুভময়ের ভাতও তো বসাতে হবে। বাজার থেকে মাছ আনলে নো প্রবলেম। দু পিস্ ভেজে দিলেই সোনামুখ করে খেয়ে নেবে শুভময়। যদি মাংস আনে? কিংবা পাবদা, কি চিতল? কাল রাতে লাল্টু মালাইকারির কথা বলছিল, শুভময়ের কানে গেছে, যদি চিংড়ি নিয়ে হাজির হয়? দেখা যাবেখন। আলু টালু ভেজে দিলেও চলবে, সঙ্গে ঘি। সরোজবাবুর বউ কি কাল রাতেই খবর পেয়েছিল? পুলিশ বোধহয় জানিয়ে দেয়, নাহলে সারা রাত...!

বিজবিজে ঘামের মতো সরোজ ব্যানার্জীর ভাবনাটা কিছুক্ষণ লেগে রইল নীলার মস্তিষ্কে, তারপর উবে গেল। কত কাজ হাতে, কত কাজ!

চিন্তাটা ফিরে এল সন্ধেবেলা। শুভময় অফিস থেকে ফেরার পর।

শার্ট ছাড়তে ছাড়তে শুভময় বলল,—বুঝলে গো, যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই। কেস পুরো জন্ডিস হয়ে গেছে। সরোজ আজ বেল পায়নি।

নীলা হাঁ হয়ে গেল,—কেন?

—পেল না। আরও সাত দিন এখন পি. সিতে থাকবে। পি. সি মানে জানো তো? পুলিশ কাস্টডি। থানার হাজত। সাত দিনে রস একেবারে নিংড়ে নেবে।

—সে কী! একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে চোরছ্যাঁচোরদের সঙ্গে রাখবে?

—কপাল। শুভময় হাত ওল্টাল,—যা ইন্টারোগেশান চলবে না!...পেট থেকে সর্ষেদানা পর্যন্ত বার করে আনবে।

নীলা ঘাবড়ে যাওয়া মুখে বলল,—তোমাদের কথা কিছু বলে দেবে না তো সরোজবাবু?

—ধুৎ, আমাদের কথা কী বলবে?

—না, মানে তোমরাও তো...নীলা বুদবুদটা গিলে নিল।

লাল্টু টিউটোরিয়ালে, আটটা সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। এখন এই চার দেওয়ালের মধ্যে লুকোছাপা হুশহাশ না করলেও চলে। শুভময় হো হো হেসে উঠল—দূর দূর, আমরা কি আয় তবে সহচরী হাতে হাত ধরি ধরি করে কাজ করি নাকি? যার যার, তার তার। একজনের সিক্রেট অন্যজন জানবে কী করে?

আশ্বস্ত নীলা রান্নাঘরে গিয়ে কফির জল চড়াল। সন্ধের পর শুভময় চা তেমন পছন্দ করে না। বিকেলে একবার বেরিয়েছিল নীলা, টুকটাক সাংসারিক জিনিসপত্র কিনতে। গোটা কয়েক বার্গার এনেছিল সেসময়ে, হট অ্যান্ড কোল্ড থেকে। দুটো বার্গার বার করে ওভেনে গরম করতে দিল।

সরোজের থেকে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই বুঝে সরোজের ওপর আবার যেন একটু মায়া জন্মাচ্ছিল নীলার। দুঃখী দুঃখী গলায় প্রশ্ন ছুড়ল—ওদের বাড়ির লোকের খবর কিছু পেলে?

—শুনলাম তো সরোজের মিসেস কোর্টে গিয়েছিল। ভাল উকিল টুকিলও লাগিয়েছে। নো রেজাল্ট। বউটা নাকি খুব কান্নাকাটি করছিল কোর্টে।

—তোমায় কে বলল?

—অনিমেষ, আবার কে। ও তো আজ সারাক্ষণ কোর্টে ছিল।

অনিমেষকে ভালই চেনে নীলা। সে নাকি খুব দাপুটে অফিসার। শুভময়দের অ্যাসোসিয়েশানের একটা মাথাও বটে। শুভময় বলে, অনিমেষ ভারী আপরাইট মানুষ। ঠিকাদার কনট্রাক্টর ছাড়া কারুর কাছে সে মাথা নোয়ায় না। এমনকী নিজের বাবা মার কাছেও না। পাছে নত হতে হয় সেই কারণে মিনিবাসে পর্যন্ত ওঠা

ছেড়ে দিয়েছে অনিমেষ, গাড়ি ট্যাক্সি ছাড়া সে দু পা'ও চলে না। অফিস কলিগদের বিপদে আপদে সব সময়ে অনিমেষ পাশে থাকে। তাই চাকরিতে ঢের জুনিয়ার হলেও অনিমেষের ওপর শুভময়ের গভীর শ্রদ্ধা, নীলা জানে।

কফি আর বার্গার নিয়ে শোওয়ার ঘরে এল নীলা। মুখ হাত ধুয়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে শুভময়, গড়াচ্ছে বিছানায়। ট্রেটা বিছানার পাশের টেবিলে রাখল নীলা, বেতের গোল মোড়া টেনে খাটের ধারে বসল,—আর কী বলল অনিমেষ?

—কী আর বলবে! দুঃখ করছিল। সরোজের মিসেসকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল...

—কাল ঠিক কী ঘটেছিল কিছু শুনলে?

—ও হ্যাঁ, সে তো এক কেচ্ছাকেলেঙ্কারি কাণ্ড। শুভময় তড়াং করে উঠে বসেছে। একটা বার্গার হাতে তুলে নিল,—ঠক্কর ব্রাদার্স বলে একটা পার্টির লাইসেন্স নাকি সরোজ অনেক দিন ধরে আটকে রেখেছিল। দরেটরে বনছিল না বোধহয়। ওই শালারাই কাল টোপ দিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিল, গ্রীন হেভেনে। পার্টির কাছ থেকে একশো টাকার একটা বান্ডিল নিয়ে যেই না সরোজ ব্রিফকেসে ভরতে গেছে, অমনি ভিজিলেন্সের লোক এসে ক্যাঁক। সরোজ নাকি নার্ভাস হয়ে সঙ্গে সঙ্গে টাকাটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, বাট ততক্ষণে দা গেম ইজ ওভার। টেবিলে জলের গ্লাস ছিল, সরোজের হাত ধরে গ্লাসে চুবিয়ে দিয়েছে, দেন অ্যান্ড দেন গ্লাসের জল লাল।

নীলা মুখের হাঁ বন্ধ করতেও ভুলে গেল—বুঝলাম না।

—তুমি একটা ট্যাড়োশ! ডিটেকটিভ সিরিয়ালে দ্যাখো না, অপরাধীর দুষ্কর্ম প্রমাণ করার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট লাগে? সরোজের হাতের ছাপ তোলার জন্য নোটের গায়ে এক ধরনের গুঁড়ো লাগানো ছিল। সাদা সাদা কী যেন নাম! মিনপ্থেলিন না ফিনপ্থেলিন। লাল্টু বলতে পারবে।

—আহ্, লাল্টুকে এর মধ্যে টানা কেন!

—না, মানে...লাল্টু সায়েন্সের স্টুডেন্ট তো, হয়ত জিনিসটার নাম জানে। ...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই গুঁড়ো মাখা হাত জলে ডোবালেই জল নাকি লাল হয়ে যায়। এই জন্যেই না বলে কট্ রেডহ্যান্ডেড। এখন আর সরোজ ডিনাই করতে পারবে না। সাক্ষীরা ছিল, তারা দেখেছে। সঙ্গে নোটেও আঙুলের ছাপ...

নীলার হঠাৎ কেমন শীত শীত করে উঠল। কী সব্বোনেশে ব্যাপার! গুঁড়োটাও সাদা সাদা, জলেরও কোনও রং নেই, অথচ ওই গুড়োমাখা হাত জলে পড়লেই...!

অস্ফুটে নীলা বলল,—ধরারও এত সব প্যাঁচ পয়জার আছে নাকি?

—আছে বৈকি। ফাঁদ কি এক রকম হয়?

—তুমি জানতে ব্যাপারটা?

শুভময় উত্তর দিল না। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরিয়েছে। চোখ ঘুরছে এদিক ওদিক। খাটে আলগা ঠেসান দিল,—তবে আমরাও ছাড়ছি না। ওই ঠক্কর ব্রাদার্সকে আমরা এমন শিক্ষা দেব...! হতে পারে সরোজের সঙ্গে তার ইয়ে চলছিল। হতে পারে সরোজেরই দোষ। বেশি স্কুইজ করার চেষ্টা করছিল। বাট দিস ইজ আনএথিকাল।

—কোন্‌টা আনএথিকাল? স্কুইজ করা?

—উঁহু, ওই ধরিয়ে দেওয়াটা। তোরা টাকা দিস কেন বাছা? তোরা হারামজাদা চোর নোস? রবি ঠাকুর কী বলেছেন? অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে...! শুভময় স্পষ্টতই উত্তেজিত,—আমরা সইব না। ছুটির পর অনিমেষকে নিয়ে বসেছিলাম। ডিসিশান হয়ে গেছে। এককাট্টা হয়ে ঠক্কর ব্রাদার্সকে বয়কট করব আমরা। দেখি শালা কী করে ব্যবসা করে খায়! দরকার হলে অন্য পার্টিদেরও সমঝে দেব।

—সব্বাই তোমাদের কথা মানবে? তুমিই তো বলো, তোমাদের অফিসে যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে চলে?

—এটা মানবে। মানতেই হবে। সারভাইভালের প্রশ্ন না? ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল।

রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না নীলার। এলোমেলো কথা ভাবছিল। শুভময়ের কথা, সরোজ ব্যানার্জীর কথা...। নীল অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছে সরোজ ব্যানার্জী বসে আছে হাজতে, তার বউ ছেলেমেয়ে মুখ কালো করে দেখতে এসেছে তাকে, দাঁড়িয়ে আছে গরাদের এপারে। কী লজ্জা! কী অপমান! কে বেশি হেনস্থা হচ্ছে? সরোজ ব্যানার্জী, না তার বাড়ির লোকজন? কেন এত লোভ করল সরোজ ব্যানার্জী? মেয়ের চিকিৎসার জন্য? শত বিপদে পড়লেও এমনটা করবে না শুভময়। মুখে যতই তড়পাক, শুভময় কক্ষনো খামচা খামচি করে না। কাজ হাসিল হলে যে যা ভাল মনে দেয় শুভময় তাতেই খুশি। সারা মাস খেটে ক'পয়সাই বা পায় শুভময়! কারুর পাকা ধানে মই না দিয়ে কটা টাকা বাড়তি আনলে যদি একটু বেশি সুখ কেনা যায়, সেটা কি খুব দোষের?

নীলা টের পেল শুভময় নড়াচড়া করছে। মৃদু স্বরে বলল,—ঘুমোওনি?

—গরম লাগছে।

—গরম, না হাতি! নীলা আলগা ছুঁল স্বামীকে,—উল্টোপাল্টা ভাবনা করছ তো?

—নাহ্ কী আর ভাবব...

শুভময় চুপ করে গেল। ঘর যেন নিঝুম হঠাৎ। পাখা ঘুরছে সোঁ সোঁ, একঘেয়ে চাপা শব্দে বেড়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্য। অন্ধকারে সময়ও যেন সহসা প্রলম্বিত হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর শুভময়ই কথা বলল,—শুনছ?

—উঁ?

—এবার বোধহয় আমাদের একটু রয়ে সয়ে চলার সময়।

নীলা ছোট্ট হাই তুলল,—হঠাৎ এ কথা?

—বোঝই তো, সারাক্ষণ সকলের চোখ টাটাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি সব্বার।

—তো?

—আড়ালে আবডালে কে কী ফিসফাস করে ঠিক নেই...

—তো?

—তো তো করছ কেন? সব কথা কি খুলে বলতে হবে?

এই অন্ধকারও যেন সব কথা খুলে বলার জন্য যথেষ্ট আড়াল নয়!

নীলা ভার ভার গলায় বলল,—ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? সোজাসুজি বলো। কী বড়মানুষিটা করি আমরা যে লোকের চোখ টাটাবে?

—আমরা নয়, তুমি। কলকাতায় এসেই ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে পাগল হয়ে গেলে। ঠিক আছে, চিরটা কাল বাইরে বাইরে ঘুরছি, আজ এখানে বদলি, কাল ওখানে। এবার যখন কলকাতায় মোটামুটি থিতুই হয়েছি, একটা নয় নিজের আশ্রয় বানালামই। কিন্তু তারপর?

—কী তারপর?

—লিস্ট দিতে হবে? আজ হাড়ে আদা দিয়ে চালু ফ্রিজ পাল্টে গন্ডার সাইজের ফ্রিজ কিনছ, কাল কালার টিভির মডেল বদলাচ্ছ। কথায় কথায় গয়না গড়াচ্ছ, শাড়ি কিনছ...এই সেদিন পনেরো হাজার দিয়ে নতুন সোফা কিনলে...পরশুদিনই তুমি সাড়ে তিন হাজার দিয়ে একটা বালুচরী কেনোনি? আবার বউদিকে ফোনে ঘটা করে দাম জানাচ্ছিলে! পৃথিবীসুদ্ধু লোক কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে, অ্যাঁ?

—সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ? ছেলেকে আহ্লাদ করে ভিসিআর কিনে দিল কে? প্যাকেট প্যাকেট বিদেশী সিগারেট ওড়াচ্ছ... বোন ভগ্নীপতিকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে যাবে, টুরিস্ট বাস নয়, গাড়ি ভাড়া করে চলো... এগুলো বুঝি কারুর নজরে পড়ে না?

—ঠিক আছে, নয় আমরা দুজনেই করি। এবার থেকে একটু সমজে বুঝে চললে...

—থামো তো। রামের ঠ্যাং ভেঙেছে বলে কি শ্যামকেও খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে? নীলা খ্যাক খ্যাক করে উঠল,—পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন দেখিও না। সব্বার সব আমার জানা আছে। ঘাঁটলে প্রত্যেকের গু থেকেই গন্ধ বেরোবে।

—সকলের গু তো এক্ষুনি পাওয়া যাচ্ছে না। যারটা নিউজ হয়েছে, তারটা নিয়েই এখন সকলে খোঁচাখুঁচি করবে।

—রাত দুপুরে সতীপনার নাটক শুরু করলে কেন বলো তো? নীলা মটকা মেরে উল্টো দিকে পাশ ফিরল। গরগর করতে করতে বলল,—বেশ তো, কাল থেকে তেলাপিয়া নাইলন ট্রিকা ছাড়া মাছ আনবে না। ঝিঙে কুমড়ো দিয়ে থলি ভরতি কোরো, তাই তোমাদের পাতে ঢেলে দেব। দেখি, বাপ ছেলের কদ্দিন রোচে!

—খচে যাচ্ছ কেন? ভালর জন্যই তো বলছি। শুভময় নীলাকে টানার চেষ্টা করল,—সরোজটা এমন একটা স্টুপিডের মতো কাজ করল...

নীলা ঠেলে সরিয়ে দিল শুভময়কে। সে যত বার শুভময়কে সরোজের থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে, ততই নিজেকে সরোজের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে শুভময়।

কে স্টুপিড? সরোজ, না শুভময়?

•

দুটো দিন যেতে না যেতে সব আবার স্বাভাবিক। অথবা গয়ংগচ্ছ।

সরোজ সংবাদের আর কোনও প্রচার নেই, সকালবেলা অলস মেজাজে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে পারছে শুভময়। বাজার থেকে চিতল চিংড়িও আসছে নিয়মিত। আসছে মুরগি মাটন, আসছে পনীর কলা আপেল আঙুর বেদানা। স্বামী আর ছেলের জন্য নিত্যনতুন খাবার বানাচ্ছে নীলা, পুষ্টি আর জিভ দু দিকেই খেয়াল রেখে। পায়েস পুডিং কাবাব চাঁপ...। একদিন দুপুরে দোতলার ফ্ল্যাটের সেনগিন্নির সঙ্গে বেরিয়ে নিউ মার্কেট চষল নীলা, চব্বিশ মিটার পর্দার কাপড় কিনে আনল। প্রায়শই বিকেলে পার্টির গাড়ি নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শুভময়কে, ঘরে ঢুকেই ঘটাং ঘটাং আলমারি খুলছে শুভময়। সুরেলা বাজনাওলা নতুন গ্যাস লাইটারটায় শোভা পাচ্ছে শুভময়ের পকেটে। উপহার।

এর মধ্যে শুভময় একদিন জানাল সরোজ জামিন পেয়ে গেছে। মুক্ত হয়েই সরোজ পরদিন অফিসে এসেছিল, গুলি ফুলিয়ে বলে গেছে আরও বড় উকিল লাগাবে। সেই উকিল নাকি কোর্টে ভিজিলেন্স অফিসারদের প্যান্টজামা খুলে নেবে।

শুনে নীলার কী হাসি। যেন কল্পচোখে ভিজিলেন্সের দুঁদে লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে। জাঙ্গিয়া পরে কোর্টের বারান্দায় মলিন মুখে চোখ মুছছে লোকগুলো।

হাসতে হাসতেই স্বামীকে চিমটি কাটল,—তাহলে যে তুমি বললে সরোজবাবুর দফা রফা?

—সেরকমই তো মনে হয়েছিল। অবশ্য ওটা সরোজের বারফাট্টাইও হতে পারে। চালবাজ টাইপের লোক, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

—উঁহু, নিশ্চয়ই কোনও ক্যাচ আছে। দ্যাখো হয়তো তোমাদের ভিজিলেন্সকেই ম্যানেজ করে ফেলেছে সরোজবাবু। ভিজিলেন্সের লোকেরা তো আর কন্‌খল থেকে নৌকো ভাসিয়ে কলকাতায় আসেনি। তেমন টাকনাদার চার খাওয়ালে তাদেরও গাঁথা যেতে পারে।

—আই ডাউট। ওখানে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে কি? সত্যি খুঁটি যদি ওর থাকে, অন্য জায়গায় আছে। মিনিস্ট্রি মহলে। ওর ভায়রাভাই নাকি কোন্ এক মন্ত্রীর পি.এ-র বোতলবন্ধু। সে কোনও কলকাঠি নাড়লেও নাড়তে পারে।

নীলা প্রাণপনে মনে করার চেষ্টা করল ওপর মহলে তাদের কেউ জানাশুনো আছে কিনা, হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। ধুস্, কেন এত ভাবছে সে? শুভময় তো সরোজ নয়।

অন্য কথায় গেল নীলা,—তোমাদের সেই ঠক্কর ব্রাদার্সকে টাইট দেওয়ার কী হল? ছেড়ে দিলে?

—সে হারামজাদা তো এখনও ঘাপটি মেরে বসে আছে। অফিসের ত্রিসীমানা মাড়াচ্ছে না। সেন্স অফ গিল্ট্। অপরাধবোধে ভুগছে। শুভময় ঠোঁট টিপল,—তবে একটা মোক্ষম উপকার হয়েছে। বলো তো কী?

নীলা ফ্যালফ্যাল চোখে দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

—এই জন্যই তো তোমায় ট্যাঁড়োশ বলি। শুধু ট্যাঁড়োশ নয়, তুমি একটি চালকুমড়ো। অন্য পার্টিরা এখন আতঙ্কে কেঁচো হয়ে থাকে, বুঝলে? টুসকি বাজালেই অ্যামাউন্ট গুঁজে দেয়। শুভময় চোখ মারল,—রেটও চড়েছে।

ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল নীলা। মঙ্গলময় তিনি, যা করেন মানুষের ভালর জন্যই করেন। সরোজ ব্যানার্জীর ধরা পড়াটা শাপে বর হয়ে গেল। নাহ্, শুভময় নয়, সরোজটাই স্টুপিড। শুভময় ধরা পড়লে সরোজ এই পরিস্থিতিটার ফায়দা লুটতে পারত।

পরের পরের দিন ছবিটা আমূল বদলে গেল। অফিস থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল শুভময়। মুখ শুকিয়ে আমসি, ঘামছে দরদর। নীলাকে শোওয়ার ঘরে টেনে নিয়ে এসে বলল,

—খুব খারাপ খবর। শিয়রে শমন।

নীলা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল,—কী হয়েছে?

—ঠক্কর ব্রাদার্স মেইন কালপ্রিট নয়। সর্ষের মধ্যে ভূত। আমাদের ডিপার্টমেন্টই বেশ কয়েকজনকে বাঁশ পুরে দিয়েছে। নাম পাঠিয়ে দিয়েছে ভিজিলেন্সে। সেই মতই আমাদের অনেক পার্টিকে ট্যাপ করেছিল ভিজিলেন্স, আল্‌টিমেটলি ঠক্কর ব্রাদার্সই দাবার ঘুঁটি হতে রাজি হয়। সরোজ ব্যানার্জীর ভিকটিম হওয়াটা মিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট। ওটা সরোজ না হয়ে অন্য কেউও হতে পারত।

—যাহ্। নীলা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল,—গুজব টুজব নয় তো?

—একদম না। এ হল গিয়ে একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। আমাদের অফিসের মিসেস মুখার্জিকে তো চেনো। বেঁটে মতন, গোলগাল মুখ, চশমা পরা, টিকটিকির ল্যাজের মত চুল... তোমার সঙ্গে রিক্রিয়েশান ক্লাবের ফাংশানের দিন আলাপ হয়েছিল...

—বুঝেছি। যে মহিলা হাঁসের মত ঘুষ খায়, তাই তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নারী প্রগতি! সমান অধিকার! মেয়েছেলেরাই বা কম যাবে কেন! ...ও'ই বলছিল।

—সে জানল কোথ্‌থেকে?

—ওরেব্বাস, ওর যা দারুণ নেটওয়ার্ক। হেডকোয়ার্টারে রেগুলার বাতাসা ছড়ায়, অনেক পোষা গুপ্তচর আছে। শুভময় বড় করে শ্বাস টানল,—এ তো হল খারাপ খবরের ট্রেলার। আসল দুঃসংবাদটি শুনলে পিলে চমকে যাবে। ভিজিলেন্স সাসপেক্ট করছে ওই ঠক্কর ব্রাদার্সের মেথডে কাউকে পাকড়াও করা যাবে না, তাই এবার তারা সরাসরি বাড়িতে হানা দেবে। মানে আর যাদের নাম আছে, তাদের বাড়িতে। হঠাৎ করে। কাক পক্ষীও টের পাবে না।

নীলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল,—কার কার নাম আছে?

—সে লিস্ট তো আর অফিসে টাঙিয়ে দেয়নি। মিসেস মুখার্জির খোঁচড়রাও পুরো ডিটেলস জানে না। তবে...

—কী তবে?

—লিস্‌ন নীলা। শুভময়ের স্বর গম্ভীর,—সাবধানের মার নেই। ঘরদোর ক্লিন রাখাই ভাল।

ইঙ্গিত বুঝল নীলা। এত হিসেবী, এত সতর্ক বলেই না শুভময়ের ওপর নীলার এত আস্থা। এই গুণের জন্যই শুভময়রা কখনও সরোজ হয় না।

তবু নীলা মিনমিন করল,—আমাদের কী এমন হিরেজহরত আছে?

—নো। যেটুকু না থাকলেই নয় সেটুকুই শুধু বাড়িতে থাকবে। বাকি সব লকারে চালান করে দাও।

—লকারও যদি দেখতে চায়?

—আহ্, ব্যাঙ্কের লকার নয়। অনিমেষ আমাকে একটা প্রাইভেট লকারের সন্ধান দিয়েছে, বড়বাজারে।

—সেফ্ তো? চোটপোট হয়ে যাবে না তো?

—আরে না না। মিনিস্টারদের সুইস ব্যাঙ্কের থেকেও সেফ।

দরজায় ছায়া। নীলা চমকে তাকাল। লক্ষ্মী। সরস্বতীর বদলে কাজে ঢুকেছে। সকালবেলা আসে, সন্ধেয় যায়।

লক্ষ্মীর দুহাতে কফির পেয়ালা। ইশারায় টেবিলে রাখতে বলল নীলা। রেখেও দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

নীলার ভুরু জড়ো হল,—কিছু বলবি?

—রাতের জন্য ক'টা রুটি করব আজ?

—যা করিস তাই করবি। বারো চোদ্দটা। ...লাল্টুকে জলখাবার দিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—কী করছে দাদা? পড়ছে?

—হ্যাঁ।

দু এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্মী চলে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখল নীলা। মেয়েটার আড়িপাতার অভ্যেস নেই তো? কী নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল! শুনেছে কি কিছু?

নীলা দরজায় এসে গলা ওঠাল,—লক্ষ্মী শোন্। ...রুটি করতে হবে না। আটাটা মেখে রেখে চলে যাস।

শুভময় পোশাক বদলে দ্রুত কফি শেষ করল। তারপর আলমারি খুলেছে। কী একটা ফাইল দেখছে উল্টেপাল্টে।

নীলা বকের মতো গলা বাড়াল,—কী ওটা?

—অ্যাসেট স্টেটমেন্টের কপি। দেখছি কী কী শো করা আছে। ...নতুন ফ্রিজ টিভি কিছুরই তো এনট্রি নেই দেখছি।

—ও দুটো পুরনোর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে কিনেছ। তাও ক্যাশে নয়, মাসে মাসে ইনস্টলমেন্ট গুনতে হয়। ...ও নিয়ে কেউ ঝামেলা করবে না।

—ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না। কিস্তির মাল বলে কি সাত খুন মাপ? মাসে মাসে কত করে কিস্তি গুনতে হয় সেটা ওরা দেখবে না? যদি জিজ্ঞাসা করে মাসে

সাড়ে দশ হাজার টাকা মাইনে পেয়ে একত্রিশশো টাকা ইনস্টলমেন্ট গোনেন কী করে? মনে রেখো, সঙ্গে আবার ফ্ল্যাটের লোনের আঠাশশো আছে।

—বলবে, পেটে কিল মেরে চালাই।

—ও রকমই কিছু বলতে হবে। মানলে হয়। ...সে কি এই ফ্ল্যাট দেখেও মানবে সাড়ে তিন লাখের মাল?

—বারে, প্রোমোটার তো কাগজেকলমে দাম দেখিয়েই দিয়েছে। তোমারও সমস্ত পেপার সাবমিট করা আছে।

—হ্যাঁ, ওই যা রক্ষে। তবে ওরা কি বুঝবে না কতটা দুধে কত জল মেশানো হয়! ...কিন্তু কিছু করতে পারবে না। ...ফ্রিজ টিভির মেমোগুলো অন্তত বার করে রাখো।

কোনও কাগজপত্রই নীলার সেভাবে গোছানো থাকে না। কোনওটা খুচরো কয়েনের বাক্সে, তো কোনওটা শাড়ির ভাঁজে...। তবে সবই পাওয়া গেল।

শুভময় চোখ কুঁচকে বিল মেমো দেখছে, নীলা ফস করে বলে উঠল,

—তোমার ভি. সি. আরের কোনও কাগজপত্র কিন্তু আমার কাছে নেই।

থাকার কথাও নয়। ভি. সি. আর'টি খাঁটি জাপানি জিনিস, খিদিরপুরের চোরাই মার্কেট থেকে কেনা। স্মাগলড্ গুডসের রসিদ দেওয়ার রীতি এখনও চালু হয়নি।

শুভময় চিন্তিত মুখে বলল,—ওটা কদিনের জন্য তোমার বাপের বাড়িতে রেখে আসা যায় না?

—পাগল! গত মাসে বউদি চেয়েছিল দিইনি, এখন যেচে রাখতে গেলে...! বরং তোমার বোনের বাড়ি চালান করো।

—হুম্। নট আ ব্যাড আইডিয়া। ...লাল্টু কিছু ভাববে না তো?

—ভাবার কী আছে! ওকে কি এখন টিভিও দেখতে দিই! বলব, তোমার পরীক্ষা বলে পিসিকে দেখতে দিয়েছি। শুভ্রাকেও তাই বলব।

বলতে বলতে দরজাটা আলগা ভেজিয়ে দিয়ে এল নীলা। আলমারির লকার খুলে গয়না বার করল। এক জোড়া বালা, এক জোড়া চুড়, দুটো নেকলেস, কানের ঝুমকো গোটা চারেক, বেশ কয়েকটা টাব, আংটি।

শুভময় আঁতকে উঠল,—বাড়িতেই এত গয়না রেখে দিয়েছ?

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরি যে। নীলা ঢোক গিলল,—কাল ব্যাঙ্কে রেখে আসব।

—খবরদার না। ব্যাঙ্কেও বেশি রাখবে না। সব একটা দুটো করে রেখে বাকিগুলো শুভ্রাকে দিয়ে আসবে। কালই।

—সব? শুভ্রাকে? শুভ্রা কী ভাববে?

—সে আমার দায়িত্ব। আমার বোন, আমি বুঝিয়ে বলব।

হ্যাঁ, তারপর ফোকটের মাল ভেবে সব ঝেড়ে দিক, মনে মনে বলল নীলা। তার অপ্রসন্ন মুখ দেখে কিছু যেন আঁচ করল শুভময়। একটু যেন দ্বিধান্বিতও হয়েছে,—ঠিক আছে, ওগুলোও সব প্রাইভেট লকারে পুরে দেব। বটুয়ায় একসঙ্গে ভরে রাখো।

আলমারির দুই তাকের মাঝে টানা চ্যাপ্টা গোপন কুঠুরি। তার থেকে এবার এক এক করে নোটের বান্ডিল বার করছে শুভময়। একশো টাকার, পঞ্চাশ টাকার, দশ টাকারও আছে। পুরনো পুরনো মলিন বান্ডিল।

শুভময় গুনছে। এক বার, দু বার, বার বার। চোখ ছোট করে তাকাল,

—একটা পঞ্চাশ টাকার বান্ডিল কম আছে মনে হচ্ছে!

—কম!

—হ্যাঁ। শুভময় আবার গোটা তাক হাতড়াল,—নাহ্, ভেতরে তো নেই।

—কম কী করে হবে! ভাল করে গোনো।

—বিশ বার কাউন্ট করেছি। বলতে বলতে আরেক বার গুনল শুভময়,—থাকার কথা একচল্লিশ, আছে ছত্রিশ।

—অসম্ভব! টাকার কি ডানা আছে?

—সে তুমিই জানো। বের করোনি?

—আমি ওখানে হাতই দিইনি।

—এ তো মহা চিন্তার কথা হল। তোমার শাড়ির ভাঁজে ফাঁজে নেই? তুমি তুলবার সময়ে কোনওদিন ভুল করে... যা ন্যাতা ছ্যাতা করে রাখার স্বভাব।

—বাজে কথা বোলো না। ঝট করে কথাটা নীলার গায়ে লেগে গেল। ঝপাৎ ঝপাৎ করে নামাচ্ছে শাড়িগুলো, —দ্যাখো দ্যাখো, কোথায় আছে দ্যাখো।

—ও কি আর এখন পাওয়া যাবে? কোথায় কোন স্যাকরার গর্ভে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছ! কিংবা শাড়ি কিনে বসে আছ। হারামের মাল পেয়েছ...

—চেঁচিও না। তোমার ওই তাকের টাকায় আমি কক্ষনো হাত দিই না। যা খরচা করি, সব এই লকারের টাকা থেকে করি। কিংবা যা ভিক্ষে দাও তা থেকে করি। নীলার দাঁতে বিষ এসে গেল,—নিজে কোথাও ফুর্তিফার্তা করে ওড়াও নি তো? এখন ভুলে গিয়ে ঢং করছ!

—আমি ফুর্তিফার্তা করি? কী ফুর্তি করি?

—সে তুমিই জানো। আমি তো আর তোমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাইনি।

ক্রমশ গলা চড়ছে দুজনের। মানুষ থেকে শ্বাপদ, শ্বাপদ থেকে ক্রমে সরীসৃপ হয়ে যাচ্ছে স্বামী স্ত্রী।

ভটাং করে দরজা খুলে গেল,—কী ব্যাপার? সন্ধেবেলা হঠাৎ ফাইট শুরু করলে কেন?

দুজনেই থতমত খেয়ে চুপ।

লাল্টু ঘরে ঢুকল,—একি! সব এমন লণ্ডভণ্ড করল কে? এদিকে গয়না, ওদিকে শাড়ি...!

ছড়ানো টাকা শাড়ির আড়ালে চাপা দেওয়ার অক্ষম চেষ্টা করল নীলা। শুভময় চটপট বলে উঠল,—একটা টাকা রাখা ছিল... পাচ্ছি না।

—কত টাকা?

—পাঁচ হাজার।

—পঞ্চাশ টাকার একটা গোছা তো? লাল্টুর স্বর নির্বিকার,—ওটা আমি নিয়েছি।

—তুই! নীলা শুভময়ের গলা কোরাসে বেজে উঠল,—কেন?

—দরকার ছিল।

—কী দরকার? আমাদের বলিসনি কেন?

—সব ব্যাপার কি তোমাদের বলা যায়!...তবে ওড়াইনি।

নীলা স্থিত হয়েছে খানিকটা। ছেলের এই ভাবলেশহীন আচরণ সহ্য হচ্ছে না তার। কড়া সুরে বলল,—কী এমন ব্যাপার যে আমাদেরও বলা যায় না?

—শুনবে? খুব সিক্রেট। লোককে আবার বলে বেড়িও না। শর্টস টিশার্ট পরা লাল্টুর মসৃণ চোয়ালে রহস্যময় হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। একটা চোখ ছোট করে বলল,—আমাদের টিউটোরিয়ালের জ্যোতির্ময় স্যার তিনটে পেপারের কোয়েশ্চেন দিয়েছেন। ফিজিক্সের দুটো পেপার আর কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপার। তিন দুগুণে ছ'হাজার চেয়েছিলেন, বলে কয়ে পাঁচ হাজারে করিয়েছি। জেনুইন কোয়েশ্চেন। একদম অরিজিনাল। না হলে টাকা ফেরত।

ঘরে কি বাজ পড়ল? মাটি কাঁপছে নাকি? ফ্যানটা যথেষ্ট জোরে ঘুরছে না?

শুভময় বিস্ফারিত চোখে দেখছে ছেলেকে। কোনওক্রমে বলল,—কোয়েশ্চেন পেপার কিনে পরীক্ষা দিবি তুই?

—হাতে এসে গেলে নেব না? উনি বেচছেন, তাই তো কিনছি। আমি তো আর একা নই, অনেকেই...

—এত যে তোর রাত জেগে পড়া, নোট বানানো, ঘড়ি দেখে উত্তর লেখা, সবই কি ফাঁকি? শুধু আমাদের দেখানোর জন্য? নীলার গলা কেঁপে গেল।

—তা কেন? খেটে তো আমি যাট সত্তর পেতেই পারি। তাই বলে কি সেখানেই থেমে থাকব? কটা টাকা দিলে যদি নাইনটি পারসেন্ট এসে যায়, সেটা কি দোষের? লাল্টুর গলায় অভিমান,—মনে রেখো, মাধ্যমিকে আমি স্টার মিস করেছিলাম।

নিজের ঘরে ফিরে গেল লাল্টু।

নীলা অবশ হাতে শাড়িগুলো তুলছে এক এক করে। গয়নাগুলো জড়ো করছে, টাকাও। হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ে গেল। দর্পণে পাশাপাশি দুটো মুখ। শুভময় আর নীলা। দুজনে দেখছে দুজনকে।

কী সরাবে এখন! কোথায় সরাবে!

দুই নারী

প্রথমটা দেখে চিনতে পারেনি অতসী। পারার কথাও নয়। কুড়ি বছর আগে যে মুখ একবারই দেখেছিল মাত্র, যে মুখের একটাই শুধু ছবি লুকানো আছে তার কাছে, সেই মুখ চিরকালের মতো হৃদয়ে গেঁথে থাকলেও, এ মুখের সঙ্গে সে মুখের মিল পাওয়া কঠিন। হঠাৎ দেখে মনে হয় ভূরদুপুরে কোন গরীবদুঃখী সাহায্যের জন্য এসেছে বুঝি। প্রায়ই যেমন আসে। সেই রকমই জীর্ণ শীর্ণ চেহারা। চোখের তলায় ঘন কালো ছোপ। ভাঙা লম্বাটে মুখ। গায়ের চামড়া খসখসে। কণ্ঠার হাড়দুটো বিকটরকম উঁচু হয়ে আছে। মাথা ভরা রুক্ষ্ম চুল এলোমেলো। ক্ষয়াটে শরীর ঘিরে জড়ানো হলুদপাড় সাদা তাঁতের শাড়িটার দশাও দীনহীন। তবু সব কিছু সত্ত্বেও মহিলার মুখেচোখে এক ধরনের আভিজাত্য আছে। বোঝা যায় অবস্থার ফেরেই দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে মহিলাকে।

অতসী জিজ্ঞাসা করল,—কি চাই?

ক্লান্ত মুখে শুকনো হাসি ফুটল,—আমাকে চিনতে পারছেন?

অতসী থতমত খেল সামান্য,—না...মানে ঠিক...কে বলুন তো!

—আমি তন্দ্রা।

তন্দ্রা। তন্দ্রা। ছোট্ট এক ফোঁটা নাম। দুটো মাত্র শব্দ। তবু এখনও, এতদিন পরও, কী তীব্র বিষ তাতে! অতসী নতুন করে সেই বিষছোবল খেল যেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে সরে গেছে কয়েক পা। আশ্চর্য! এতক্ষণ কেন চিনতে পারে নি! সে'ই তো! হ্যাঁ সেই। ওই তো সেই নীলচে চোখ। নীলচে নয়, কটা। ওই তো দিগন্তের আকাশের মত সেই নতমুখী দৃষ্টি। ছলনামাখা। ওই তো অতসীর সব অহংকারকে পিষে দেওয়া পাতলা টেপা ঠোঁট। ঠোঁটের কোণে ছোট্ট বাদামী তিল। সবই রয়েছে।

অতসীর গলা আপনা-আপনি কঠোর হয়ে গেল,—তুমি! তুমি কি জন্য এখানে এসেছ?

তন্দ্রা ঢোঁক গিলল। শুকনো হাসিটা ঠোঁটে লেগেই আছে,—আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম।

—তোমার সাহস তো কম নয়!

তন্দ্রার গলায় তবু কাতর অনুনয়,—একটু যদি সময় দ্যান্...

—আমার সময় নেই। তুমি এখন আসতে পারো।

অতসী মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল প্রায়, আচমকা তন্দ্রা ভোল পাল্টেছে। অতসীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে আধবোঝা পাল্লা দুটো চেপে ধরেছে শক্তহাতে,—আমি কিন্তু ফিরে যেতে আসিনি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

—আমি তোমার সঙ্গে একটি কথাও বলব না।

—তাতে লাভ হবে না। তন্দ্রার গলার আওয়াজ অসম্ভব শান্ত অথচ কী উদ্ধত,—আজকে না শুনলে আমি আবার আসব। বার বার আসব। সেটা নিশ্চয়ই আপনি চাইবেন না। দরকার হলে আপনার ছেলের কাছেও যেতে পারি আমি।

অতসীর এবার বাকরোধ হওয়ার পালা। তন্দ্রা কি অতসীকে ভয় দেখাতে এসেছে! এতদিনকার গোপন কথাগুলো সব ফাঁস করে দেওয়ার ভয়! কি বা বলতে চায় এখন! এতদিন ছিলই বা কোথায়! অতসীর বুকের ভিতরটা আচমকা হু হু করে উঠল। অনেক কষ্টে সংযত করল নিজেকে। গলার কঠিন ভাবটাকে তবু কাটানো গেল না,—তুমি কি ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ আমাকে!

তন্দ্রার মরিয়া ভাব যেমন দুম করে এসেছিল, তেমনই দুম করে মিলিয়ে গেছে। দরজার পাল্লা ধরে থাকা তার হাত দুটো ক্রমে শিথিল হয়ে এল। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে হাপরের মত। হাঁপাতে হাঁপাতেই মাথা নাড়ল দু'দিকে।

অতসীর চোখ তবু তীক্ষ্ণ—কি চাও?

এবারও দু'দিকে মাথা নাড়ছে তন্দ্রা। দরজা ছেড়ে পাশের দেওয়ালটাতে ঠেস দিয়েছে। ঘামছে অসম্ভব! শেষ চৈত্রের ঝাঁ-ঝাঁ রোদে বোধহয় হেঁটেই এসেছে এতটা পথ। সঙ্গে ছাতা-টাতাও নেই। ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল।

—একটু বসতে দেবেন? মাথাটা ঘুরছে।

কখ্খনো না। বলতে গিয়েও অতসী চমকেছে। তন্দ্রা সত্যি সত্যি টলছে। গোটা শরীর কাঁপছে মৃদু মৃদু। পড়েই যাবে নাকি! একটা মানুষ, সে যেই হোক না কেন, তারই দরজায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে আর সে নিশ্চিন্তে দরজা বন্ধ করে দেবে! তন্দ্রাকে দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে কথাগুলো ভেবে নিচ্ছিল

অতসী। ভাবতে ভাবতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বিরস মুখে দরজা ছেড়ে দাঁড়িয়েছে,—এসো। ভেতরে এসে বোসো।

ঘরে ঢুকেই তন্দ্রা বসে পড়েছে সামনের সোফাটাতে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। হাঁপানি-টাপানি আছে নাকি! অতসী ঘরের কোণায় গিয়ে ফ্যান চালিয়ে দিল। সুইচ বোর্ডের সামনে থেকেই জিজ্ঞাসা করল,—জল খাবে?

তন্দ্রা খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

বাইরের ঘর থেকে ভিতরে ঢুকে অতসী আবারও দ্রুত চিন্তা করে নিচ্ছিল। একটু পরেই খুকুরা এসে পড়তে পারে। খুকু আর তার শাশুড়ি। ওদের সঙ্গে বিকেলে আজ বাবলার জন্য সম্বন্ধটা পাকা করতে যাওয়ার কথা। এখুনি যদি ওরা এসে পড়ে! তন্দ্রাকে দেখে খুকু যদি জানতে চায়, কে মা! কিম্বা খুকুর শাশুড়ি! অতসী কি উত্তর দেবে? চিনি না? তার মধ্যেই হয়ত তন্দ্রা সবিস্তারে পরিচয় দিয়ে দেবে নিজের! দিতেই পারে। তন্দ্রার মত মেয়ের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে অতসী নিজের গলাতেই ঢেলে নিল খানিকটা। এ সময় প্রতিদিন বাড়িঘর যেমন থাকে তেমনই নির্জন। রাতদিনের কাজের মেয়েটা বোধহয় ছাদের ঘরে ঘুমোতে গেছে। অতসী এখন রোজকার মতো একা। একাই। কবেই বা একা ছিল না! স্বামী, সংসার, সন্তান সব কিছু থেকেও তো চিরটাকাল একদম একা সে। স্বামী যখন বেঁচে ছিল, তখনও। যখন নেই, তখনও। ছেলেমেয়েরাই বা কতদিন আর শুধু মায়েরই থাকে!

জলের বোতল হাতে নিয়ে অতসী বাইরের ঘরে ফিরল। লম্বা সোফায় শরীর ছড়িয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে তন্দ্রা। রোগা শরীরটা গুটিয়ে কেমন ছোট হয়ে গেছে। এখনও কাঁপছে থিরথির করে। অতসীর নজরে পড়ল তন্দ্রার চুলগুলোও প্রায় সব পেকে গেছে। মুখে দাগ পড়েছে বয়সের। ক্ষণিকের জন্য অতসী স্থির। কত বয়স হল তন্দ্রার! অতসীর থেকে বেশ ছোট। কম করেও বছর পাঁচেকের তো বটেই। খুব বেশি হলেও তন্দ্রা এখন চুয়াল্লিশ, কি পঁয়তাল্লিশ। এর মধ্যেই এত বুড়িয়ে গেল কি করে। কিসের অভাব। টাকা পয়সার! না সঞ্চয়ের! অতসী বুঝতে পারছিল না। পারছিল না বলেই আরও রাগ বাড়ছিল তার। সঞ্চয়ের অভাবে কেন হবে? সঞ্চয়ের অভাবে যদি কারুর ক্ষয়ে যাওয়ার কথা থাকে, সেটা তো অতসীরই। অথচ অতসী, এই পঞ্চাশেও দিব্যি সুস্থ সবল। তাকে দেখে কেউ বলবে না তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলের বিয়েও হব হব।

অতসী টেবিলে জলের বোতলটা রেখে আলতো ধাক্কা দিল তন্দ্রাকে,—কি হল তোমার?

তন্দ্রা চোখ খুলল না। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট সজোরে চেপে ধরে আছে।

—শুনছ? জল এনেছি।

তন্দ্রা তবুও নিশ্চল।

অতসীর অস্বস্তি বাড়ছিল। হঠাৎ করে এ আপদ কেন চেপে বসছে ঘাড়ে! তন্দ্রাকে মোটামুটি ভুলেই গেছিল সে। মোটামুটি কেন, পুরোপুরিই। সঞ্জয় যতদিন বেঁচে ছিল, সঞ্জয়ের সঙ্গে এই মহিলাও মিশে ছিল অতসীর প্রতিটি রক্তবিন্দুর সঙ্গে। প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন করে তুলত অতসীর অস্তিত্বকে। কী তীব্র অপমান আর যন্ত্রণায় যে কেটেছে তখনকার দিনগুলো! সংশয়ের কাঁটা সর্বক্ষণ বুকে বিঁধে থাকত। এই বুঝি আজও সঞ্জয় ফিরল না রাতে! এই বুঝি ট্যুরে যাওয়ার নাম করে ফূর্তি করতে গেল তন্দ্রাকে নিয়ে! তখনকার প্রতিটি দিনের কথা, প্রতিটি রাতের কথা আমৃত্যু রয়ে যাবে অতসীর বুকের গভীরে। শেষের দিকে সঞ্জয় বলত, এখনও তুমি একটা কথা নিয়ে ঘ্যানঘ্যান করো কেন বলোতো! তুমি যা চাও আমি তো সব দিয়েছি তোমাকে। গাড়ি, বাড়ি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম। এখনও আমায় তুমি একটু শান্তিতে থাকতে দেবে না!

অতসী ঝাঁঝিয়ে উঠত,—এটাকে তুমি ওই একটা কথা বলছ? চাই না আমার গাড়ি বাড়ি। চাই না সুখ আরাম। আমি, আমার সারাটা জীবন, আমার ছেলে মেয়ে... সব, সবাইকে ছারখার করে দিয়েছ তোমরা। তুমি আর ওই রাক্ষুসী।

—ওফ্। সঞ্জয় চিৎকার করে উঠত,—কি চাও তুমি খুলে বলো তো? তুমি কি চাও আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই? সারা জীবনের মতো?

অতসীও চেঁচাত,—তাই যাও। দিনের পর দিন এই মানসিক অত্যাচার আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

অতসীর হৃৎপিণ্ড ধকধক করে উঠল। তাই কি অত তাড়াতাড়ি চলে গেল সঞ্জয়! মাত্র পঞ্চাশে পা দিতে না দিতেই! অফিস থেকেই কর্মচারীরা সঞ্জয়ের ঠাণ্ডা শরীরটাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল। নিজের অফিসঘরে বসে কাজ করতে করতে বুকে ব্যথা বলে অজ্ঞান হয়ে যায় সঞ্জয়। সেখানেই সব শেষ। স্বামীর নিথর দেহটার দিকে তাকিয়ে বুক ফেটে কান্না আসতে চাইলেও কিছুতেই কাঁদতে পারে নি অতসী। পনেরো বছরের জমাট অভিমান তার সমস্ত জাগতিক অনুভূতিগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিয়েছিল। বাবলাটা সবে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে তখন। খুকু হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। বাবলা ঠিকমতো বাবার ব্যবসা দেখতে পারবে কিনা, খুকুটাকে আরও বড় করতে হবে এইসব ভাবনাচিন্তায় তন্দ্রা কখন ম্লান হয়ে গেছে অতসীর জীবন থেকে। হয়ত-বা সঞ্জয়ও।

ভাবতে গিয়ে সঞ্জয়ের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর আজ কেন চোখে জল আসছে

অতসীর! সঞ্জয়ের জন্য মন কেমন করছে! সঞ্জয় যেমনই হোক যেভাবে থাকুক, তবু ছিল তো! অতসীর কাছেই! কেন অত তাড়াতাড়ি চলে গেল! কে দায়ী তার অকালমৃত্যুর জন্য! অতসী! নাকি ওই মহিলাই! ওর জন্যই তো সঞ্জয়...!

অতসী আঁজলা ভরে ঠাণ্ডা জল নিয়ে ছুঁড়ে মারল তন্দ্রার মুখে চোখে। জলের ছোঁয়া পেয়ে তন্দ্রা নড়ে উঠেছে। চোখ মেলল। ঘোলাটে নীল চোখে অতসীর দিকে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ধীরেধীরে চোখে ভাষা আসছে।

অতসী জলের বোতল এগিয়ে দিল তার দিকে। মনে মনে বলল, অনেক নাটক হয়েছে। জল খাও। খেয়ে বিদেয় হও।

তন্দ্রা উঠে বসে পুরো বোতল জল ঢেলে নিল গলায়। আঁচল তুলে ঘাড় গলা মুছল। নিশ্বাসের কষ্ট এখনও অল্প অল্প রয়েছে বোঝা যায়।

অতসীর এক বিন্দুও মায়া এল না মনে। তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল,—শরীর ঠিক হয়েছে?

তন্দ্রা যেন বহু কষ্টে বসতে পারছে। থেমে থেমে দুর্বল স্বরে বলল, শরীরটা একদম ভাল নেই। কথায় কথায় মাথা ঘোরে। বুক ধড়ফড়। ডাক্তার বলছে শরীরে নাকি রক্ত নেই। বিশ্রী অ্যানিমিয়া...

অতসীর একটুও শুনতে ইচ্ছে করছিল না। জলের বোতলটা সামনে থেকে সরিয়ে শো-কেসের মাথায় রেখে দিতে দিতে বলল,—মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম তো হয়ে গেল, আরও দরকার?

তন্দ্রা এই চকিত নিষ্ঠুরতায় থমকেছে। মলিন মুখে তাকিয়ে রয়েছে অতসীর দিকে।

—কি দেখছ?

—আপনাকে বোধহয় অসুবিধেয় ফেললাম।

—তা ফেলেছ! অতসী স্পষ্ট উত্তর দিল,—এখুনি আমার মেয়ে আর মেয়ের শাশুড়ি এসে পড়বে। তুমি যদি এখন চলে যাও...

তন্দ্রা ওঠার নামও করল না। নির্জীব চোখ দুটো তার স্থির হয়ে আছে।

—আপনার কাছে বড় বিপদে পড়ে এসেছিলাম। খুব কষ্টে দিন কাটছে...

প্রথম বাক্যটা অতসীই উচ্চারণ করেছিল না একদিন! মান-অপমান শিকেয় তুলে, লজ্জার মাথা খেয়ে এই মহিলার কাছেই বাধ্য হয়েছিল ছুটে যেতে। সেদিনও এই রকমই নীলচে চোখ উদাস তন্দ্রার। অতসী বলেছিল,—বড় বিপদে পড়ে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমিই একমাত্র পারো সঞ্জয়কে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে। কথা দাও আজ থেকে আর কোনও সম্পর্ক রাখবে না সঞ্জয়ের সঙ্গে...

তন্দ্রা কথা দেয়নি। ভাসা ভাসা দু'চোখ ফিরিয়ে রেখেছিল অন্যদিকে।

অতসী তখন মরিয়া। সব কিছু তখন যে ভেসে যেতে বসেছে। সুখ, শান্তি, স্বামী, সংসার, ছেলে, মেয়ে, স্বপ্ন, প্রেম, সব, সব কিছু।

—দ্যাখো, তোমার এখনও বয়স আছে। তুমি দেখতেও সুন্দরী। ইচ্ছে করলে এখনও একটা ভালো ছেলে দেখে দিয়ে করতে পারো। কেন মিছিমিছি একজন বিবাহিত লোকের জন্য নিজের জীবন নষ্ট করছ তুমি?

তন্দ্রা কেঁদে ফেলেছিল হু হু করে। সে কী ভয়ানক বাঁধভাঙা কান্না। কাঁদতে কাঁদতে শুধু বলেছিল,—সে আর হয় না। আর হয় না।

—কেন হয় না।

—আমি বলতে পারব না, আপনি তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

অতসী ঘুরে গিয়ে তন্দ্রার মুখোমুখি সোফাটায় বসল।

তন্দ্রাও নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে,—আমি জানি আপনি আমাকে কখনও ক্ষমা করতে পারবেন না। বিশ্বাস করুন, আমি তাকে অনেকবার বুঝিয়েছি...

অতসী খর চোখে তাকাল,—পুরোনো কথা থাক। কি বলতে এসেছ তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো। আমার সময় নেই।

তন্দ্রার গলা ডুবে এল,—মেয়েটার বিয়ের ঠিক করেছি।

অতসীর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল,—কার মেয়ে?

তন্দ্রা চোখ সরিয়ে নিল অতসীর চোখ থেকে,—আমার মেয়ে।

—ও। ভালো তো। কত বড় হয়েছে সে? বলতে বলতে অতসী নিজেই মনে মনে হিসেব করে নিচ্ছিল। পনেরো আর পাঁচ কুড়ি। নাহ্, তার একটু কমই। বছর উনিশেকের হয়েছে এখন।

তন্দ্রা বলল,—ছেলেটা ভাল। একটা প্রাইভেট কোম্পানির জুনিয়ার অফিসার। বৈশাখেই দিন স্থির হয়েছে।

—বেশ।

—অনেক খরচা। কিছুই জোগাড় করতে পারছি না। আপনি যদি...

এতক্ষণে তন্দ্রার আসার কারণ জলের মত পরিষ্কার। অতসী ঝপ করে উঠে দাঁড়াল,—আমি কি করতে পারি?

তন্দ্রা উঠতে গিয়েও বসে পড়েছে,—জানি আপনি আমাকে খুব নির্লজ্জ ভাবছেন। ভিখিরি ভাবছেন। আমার সত্যিই আর কোনও উপায় নেই।

—কেন? তুমি এখন আর চাকরি করছ না?

—না। সে তো কবেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মেয়ে হওয়ার পর পরই। ওই জোর করে ছাড়িয়ে দিয়েছিল।

—তাই? নাকি নিজেরই তখন সমাজে মুখ দেখাবার উপায় ছিল না?

—সে আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন। তন্দ্রা কপালে হাত রাখল। মুখের ওপর উড়ে আসা চুলগুলোকে সরাচ্ছে,—ও অবশ্য যতদিন বেঁচে ছিল আমার কোনও অভাব রাখেনি।

—তা তার মধ্যেই তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলে। অতসীর গলায় শ্লেষ ফুটল।

তন্দ্রা গায়ে মাখল না ব্যঙ্গটাকে। বিড়বিড় করে বলছে,—তা যদি পারতাম। সে চলে যাওয়ার পর কিভাবে যে কেটেছে পাঁচটা বছর...কি করে বড় করেছি মেয়েটাকে...।

বারবার তন্দ্রার মুখে সঞ্জয় সম্পর্কে ও, সে, সর্বনামগুলো সহ্য হচ্ছিল না অতসীর। বিরক্ত মুখে কথা ঘোরাতে চাইল,—কত টাকা দরকার?

তন্দ্রাও ফিরল কাজের কথায়। হয়ত-বা অতসীর প্রশ্নে উৎসাহিত হল একটু,—সে তো অনেক, গয়নাগাটি কিচ্ছুই নেই। অন্তত হাজার পঞ্চাশেক যদি দ্যান...মুন্নিরও তো তার বাবার সম্পত্তিতে কিছু অধিকার আছে।

তন্দ্রার শেষ কথাটা শেল হয়ে বিঁধেছে বুকে। অতসী টান টান হল,—তুমি কি অধিকার ফলাতে এসেছ?

কথাটা বলে ফেলে তন্দ্রাও বোধহয় বুঝেছে বলা ঠিক হয়নি। আরও বিনীত ভাব তাই এনেছে গলায়,—নাহ্। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

—আমি যদি না দিই?

তন্দ্রা চুপ।

অতসীর মনে হল তন্দ্রা নতুন করে শান দিচ্ছে তার অস্ত্রগুলোতে। আজ যদি অতসী মুখের ওপর না বলে দেয় কি করতে পারে তন্দ্রা? মামলা করে রক্ষিতার সন্তান সম্পত্তির ভাগ চাইবে? ঢি ঢি ফেলে দেবে চারিদিকে? বাবলা খুকু জেনে যাবে তাদের বাবার কীর্তিকলাপের কথা? অতসী ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠছিল। গোপন লজ্জা চিরকাল নিজের কাছেও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে সে। পনেরো বছর ধরে যা কিছু কান্না, যত রাগারাগি, মান অভিমান সবই ছিল শুধু সঞ্জয়ের সঙ্গেই। বাইরের কেউ যদি কোথাও থেকে জেনে থাকে তো জেনেছে, অতসী কারুর কাছেই নালিশ নিয়ে ছোটেনি। আত্মীয়স্বজনের কাছে যায়নি। বন্ধুবান্ধবদের কাছে না। বাবলা খুকুকে পর্যন্ত জানতে দেয়নি কিছুই। ওরা শুধু সর্বসময় বাবা মা'র ঝগড়াঝাটি দেখেছে। ঝগড়ার কারণ জানে নি। অতসীও চায়নি বাবলা খুকু কখনও অশ্রদ্ধার চোখে দেখুক তাদের বাবাকে। আজ যদি তন্দ্রা...!

তন্দ্রা অবশ্য সে ধরনের প্রসঙ্গ আনল না। হয়ত দাবী জানানোর মতো তেমন যুৎ পাচ্ছে না শরীরে। খানিকক্ষণ নীরব থেকে বলল,—সেটা আপনার বিবেচনা।

বাইরের রাস্তায় একটা গাড়ি এসে থেমেছে। খুকুরা এসে গেল নাকি! অতসী দ্রুত এগিয়ে গেল বাইরের খোলা দরজার দিকে। খুকুদের নয়, অন্য কারুর গাড়ি। কাকে যেন নামিয়ে দিয়েই ফিরে যাচ্ছে। ধু-ধু রোদ্দুরে গাড়িটা মিলিয়ে যাওয়ার পরও অতসী তাকিয়ে রইল প্রখর রোদের দিকে। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে চৈত্রের দুপুর বড় তপ্ত এখন। এ সময়েই যখন তখন কালবৈশাখী আসে। হঠাৎ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায় দশদিক। ঝড় এসে ওলোট-পালোট করে দেয় পৃথিবীটাকে।

অতসী অস্থির পায়ে ফিরল তন্দ্রার কাছে,—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন।

—তুমি কি শুধুই আমার বিচার-বিবেচনা জানতে এসেছ? নাকি আইনের হুমকি দিতে এসেছ?

বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা ছায়ায় বসে অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে তন্দ্রা। অনেকক্ষণ পর হাসল আলগাভাবে। আলগা, কিন্তু ধারালো খুব। চেহারা ভেঙে গেলেও হাসির ভঙ্গিটা তার এখনও আগের মতোই। হাসি বা কান্নার চেহারা বোধহয় বদলায় না কখনই। সব বয়সে, সর্ব অবস্থায় হাসি কান্নার রূপ একইরকম। তন্দ্রার হাসিমাখা যে ছবিটা অতসীর কাছে এখনও আছে, সেই হাসির সঙ্গে এ হাসির তেমন তফাত নেই। ছবিটাকে আচমকাই একদিন সঞ্জয়ের জামার পকেটে আবিষ্কার করেছিল অতসী। মনে একটু খটকা লাগলেও তখনও সন্দেহকে পাত্তা দেয়নি তেমনভাবে। দশ বছরের বিবাহিত জীবন একদিনের ঝড়েই ওভাবে তছনছ হয়ে যাবে কে জানত! খুকুটা তখনও স্কুলে যাওয়াই শুরু করেনি, বাবলা সাত কি আট। সঞ্জয় অফিস থেকে ফিরতে সোজা মনেই অতসী তাকে প্রশ্ন করেছিল,—এই ছবিটা কার গো?

সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জয় চমকে উঠেছে,—তুমি ও ছবি কোথায় পেলে?

সেই মুহূর্তে সঞ্জয়ের মুখচোখে, সঞ্জয়ের স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে অতসীও চমকেছে। চকিতে ছবিটাকে লুকিয়ে ফেলেছে পিছনে,—তোমার শার্টের পকেটে ছিল।

সঞ্জয়ের ভুরু জড়ো,—তুমি আমার জামা-প্যান্ট ঘাঁটো নাকি আজকাল?

অতসী হতবাক,—ঘাঁটতে যাব কেন? কাচার জন্য বার করেছিলাম...

—ছবিটা আমায় দাও।

—আগে বলো কে মেয়েটা?

—আমাদের অফিসে কাজে ঢুকেছে।

—তার ছবি তোমার পকেটে এল কি করে?

—আমাকে কি তুমি জেরা করছ?

—না। জানতে চাইছি।

—আমিই রেখেছি।

সঞ্জয় চিরকালই এরকম স্পষ্টবাদী। নিজের গোপন অপরাধগুলোকেও চিরদিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে কখনও দ্বিধা করেনি। আজকাল মাঝে মাঝে অতসীর মনে হয় অত সত্যবাদী সঞ্জয় না হলেও পারত। অতসী বহু যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকতে পারত তাহলে। জীবনে বোধহয় কিছু কিছু নিষ্ঠুর সত্য অজানা রয়ে যাওয়াই ভাল।

অতসী সোজাসুজি তাকাল তন্দ্রার দিকে।

খুকুরা এসে পড়ার আগে তন্দ্রার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়,—তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না।

তন্দ্রার হাসি মুছল,—কি বলি বলুন তো?

—যা সত্যি তাই বলবে।

—সত্যিকে কি মেনে নিতে পারবেন আপনি?

—কি বলতে চাও খোলাখুলি বলো।

আড়ষ্টভাবে সোফায় হেলান দিল তন্দ্রা। মুখ উঁচু করে কয়েক সেকেন্ড পাখার বাতাস টানল বুকে,—যদি বলি আপনার কাছ থেকে আমি দুটোই চাই? বিবেচনা আর আইনের বিচার দুটোই।

—কি হিসেবে?

—হিসেব বুঝি না। যা মনে এল বললাম। হয়ত আপনি যেমন বাবলা খুকুর মা, আমিও তেমনি মুন্নির মা, সেই হিসেবেই।

অতসী ধৈর্য হারাল। বেশ জোরেই বলে উঠেছে,—না। বাবলা খুকুর নাম তুমি মুন্নির সঙ্গে উচ্চারণ করবে না। বাবলা খুকু আর মুন্নি এক নয়।

তন্দ্রা একটুও উত্তেজিত হল না, —দেখলেন তো, আপনি সত্যিটাকে মেনে নিতে পারলেন না। বলতে বলতে চোখ বুজেছে। আপন মনে বলে চলেছে,—অনেক ঘটনা থাকে যা মানুষ না চাইলেও ঘটে যায়, কিম্বা ভুল করেও হয়ে যায় অনেক কিছু। কখনও কখনও পরিস্থিতির ওপর কারুর কোনও হাত থাকে না। বলতে বলতে আরও গলা নামিয়েছে,—একদিন আপনাকে বলেছিলাম, আমার উপায় ছিল না। সত্যি তো উপায় ছিল না। মাটি কি ইচ্ছে করলেই তার ফসল উপড়ে ফেলে দিতে পারে? আপনি কি পারতেন? আপনিও তো বাবলা খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে...

—আমার কথা এখানে আসে না। অতসী তর্ক করে উঠল,—আমি সঞ্জয়ের স্ত্রী ছিলাম। আমার একটা সামাজিক পরিচয় ছিল।

—হ্যাঁ, ওই টুকুনি যা তফাত ছিল আপনার সঙ্গে আমার। কথা নয়, কথার ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে যেন ঘোরে ডুবে যাচ্ছে তন্দ্রা,—আপনাকে ছেড়ে সে আমার কাছে চলে আসেনি। আমাকে ছেড়েও আপনার কাছে ফেরেনি। কেন ফেরেনি কখনও ভেবে দেখেছেন কি? কেন আপনার পাশে শুয়েও সে আমার কথা ভেবেছে? আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আপনার বিছানায়?

অতসী থমকেছে এতক্ষণে। এ কি হেঁয়ালি তন্দ্রার!

তন্দ্রা থামছে না। যেন নিজের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিয়ে চলেছে,—কারণ তার চোখে আমি আপনি সমান ছিলাম। আমি না হয়ে অন্য কেউও হতে পারত, কিম্বা আপনি না হয়ে আর কেউ। একটুখানি সামাজিক চিহ্ন ছাড়া আপনার আমার আলাদা পরিচয় আছে কি?

তন্দ্রার কথাগুলো ভেসে যাচ্ছে। ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে গেল গোটা ঘরে। আপনি না হয়ে অন্য কেউ তো হতে পারত। আমি না হয়ে আর কেউ। ঠিক। ঠিকই তো। অতসী নিজেও জানে না কখন অন্যমনস্কভাবে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। কখন চলে গেছে খোলা জানলার ধারে। অতসী কে ছিল সঞ্জয়ের? তন্দ্রাই-বা কে! এক অর্থে দু'জনেই তো পৃথক পৃথক দুটো পরগাছা মাত্র। সঞ্জয়েরই অর্থে লালিত। সঞ্জয়েরই তৃষ্ণায় জারিত।

অতসী জানালায় দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে উঠল,—আর বোলো না। আর বোলো না। এবার থামো। বলতে বলতে মুখ ঘুরিয়েছে। চড়া রোদ্দুর থেকে অন্ধকারে তাকাতেই সব ঝাপসা। অতসীর নিজের হাতে সাজানো ঘরসংসার, আসবাবপত্র সব, সব কিছু। ঝাপসা আঁধারে শুধু দেখা যাচ্ছে তন্দ্রার মুখ। তন্দ্রার মুখ? না ওটা অতসীরই মুখ? অতসী বুঝতে পারছিল না। পায়ে পায়ে আবারও কখন ফিরে এসেছে তন্দ্রার কাছে। তন্দ্রার হাতে হাত রেখেছে।

—আমার খুব কষ্ট হয় জানো।

—আমারও।

—আমার মাঝে মাঝে বড় কাঁদতে ইচ্ছে করে।

—আমারও।

বলতে বলতে কাঁদছে দু'জনে। বুক ভাঙা কান্না। পাঁচ বছর পর এই প্রথম। সঞ্জয়ের মৃত্যুর পর এই প্রথম।

এভাবেই দুই নারী অন্দরের ছায়ায় বসে কাঁদছিল সংগোপনে। কখন খুকু আর খুকুর শাশুড়ি এসে দাঁড়িয়েছে খোলা দরজায় কেউ খেয়াল করেনি। কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেছে তাও খেয়াল করেনি কেউই। বেলার মনে বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছিল তাদের।

দ্বিতীয় মুখ

ডাক এসেছে গো...ও বাবারা...ঘরকে চলো...।

সকাল থেকে আকাশবাণীর মত বেজে উঠছে শব্দগুলো। কিছু সময় পর পরই। আশ্চর্য! প্রিয়ব্রত খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন,—কি ব্যাপার বলো তো? বুড়ির আজ হলটা কি?

—কে জানে। মৃন্ময়ী ঠোঁট ওল্টালেন। এইমাত্র রান্নাঘর থেকে এসেছেন। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে গেলেন জানালার ধারে। একটু ঝুঁকে ঘাড় কাত করে দেখার চেষ্টা করলেন বুড়িকে। নাহ্। দেখা যাচ্ছে না। বিরক্ত মুখে বিড়বিড় করে উঠলেন,—বার বার বলছি একটা কিছু ব্যবস্থা করো...

—কি ব্যবস্থা করব? প্রিয়ব্রতর স্বরেও বিরক্তি এবার।

—কেন? অন্য কোনও জায়গা নেই মরার? দরজা অব্দি গিয়ে মৃন্ময়ী ফিরে দাঁড়ালেন,—আর কারুর বাড়ির সামনে এমন পড়ে থাকুক না, দেখি কেমন তারা দিনের পর দিন...

—একথা তো আমি প্রথমদিনই বলেছিলাম। প্রিয়ব্রত শব্দ করে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেন,—তোমরাই তখন বেশি মায়া দেখালে...

—ঠিক আছে। এক কথা নিয়ে রোজ খোঁটা দিতে হবে না। মৃন্ময়ী দ্রুত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

প্রিয়ব্রত চোখ থেকে চশমা নামালেন। মেয়েদের নিয়ে এই এক মুশ্‌কিল। কখন কি চায় নিজেরাই জানে না। বুড়ির এখানে আস্তানা গাড়া নিয়ে প্রথম প্রথম তিনি যখন আপত্তি জানিয়েছিলেন তখন এই মৃন্ময়ীই প্রতিবাদ করেছিলেন সব থেকে বেশি,—আহা, থাক না। বাড়ির ভেতরে তো আর ঢুকে আসছে না। রাস্তাতেই পড়ে আছে...

তিনি বলেছিলেন,—বাড়ির সামনেটা তো নোংরা হচ্ছে। কোন্‌দিন দরজার সামনে হেগে মুতে রাখবে...

—না বাবা। শিপ্রাও অমনি শাশুড়ির পক্ষ নিয়েছিল—আমি লক্ষ করে দেখেছি, বুড়ির কিন্তু ওসব সেন্স্‌ ঠিক আছে। বাথরুম পেলে কোমর ঘসে ঘসে ওইদিককার ড্রেনের কাছে চলে যায়।

—তাছাড়া কতটুকুই-বা খায় যে...মৃন্ময়ীর স্বর ভিজে গিয়েছিল মমতায়,—সকালে এক বাটি ভাত দিয়েছিলাম; বিকেলে দেখি পাঁচটা দানাও খেয়েছে কি খায় নি।

হ্যাঁ, এইভাবেই বুড়ি মাস দেড়েকের ওপর রয়ে গেছে বউ শাশুড়ির আশ্রয়ে। প্রিয়ব্রতর এই ঘরেরই কোলে ছোট আয়তক্ষেত্র মাপের ঝুল বারান্দা। তার ঠিক নীচে, ফুটপাথের ওপর সদর দরজার বাঁ দিক ঘেঁসে, সারাটাদিন গুটিসুটি পড়ে থাকে। সম্পত্তি বলতে নোংরা দুটো কাঁথা কানি আর এইটুকুন এক ছেঁড়া পোঁটলা। ছোট্টমতন দলা পাকানো শরীর। যত না ছোট, বয়সের চাপে তার আরও ছোট দেখায়। কংকালসার দেহ। মাথাভরা কাশবন। চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে কালো। সেই রঙের ওপর ইহজীবন বুঝি ঘন সর ফেলে জুড়িয়ে যেতে চাইছে। বুড়িকে দেখে অন্তত প্রিয়ব্রতর সেরকমই মনে হয়। ঠাণ্ডা সরের গায়ে যেমন তেমন অজস্র ফাটল। ফাটলের ফাঁকে ছাই ছাই ময়লা। বুড়ি যে কোথ্‌থেকে এল, কেন এল কেউ বলতে পারে না। শত প্রশ্ন করেও উত্তর মেলে নি কোনও। প্রথমে সকলে ভেবেছিল বোবা বোধহয়। মোটেই না। দু-দুটো দিন ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার পর দুম করে কথা বলে উঠেছিল একদিন,

—ডাক এসেছে গো, ও বাবারা...

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই শব্দটাকে সুর করে করে উচ্চারণ করে চলে। শুধু ওই শব্দকটাকেই। আর কোনও বুলি বুঝি শেখেনি কোনওদিন। শেখেনি? নাকি জীবনের কথা সব ফুরোতে ফুরোতে ওই কটা বাক্যতে এসে ঠেকেছে? সময় অসময় নেই, যখন তখন খেলা করে উঠছে কথা কটাকে নিয়ে। খেলা? নাকি সাবধানবাণী? নাকি শুধুই কান্না? কে জানে?

প্রিয়ব্রত ঘর ছেড়ে ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বুকটা আচমকা কেমন টিপটিপ করছে। বুড়ি আবার কাঁদছে খুনখুনে সুরে। জড়ানো গলায়। কি যে হল? ক্ষিদে টিদে পেয়েছে কি? কিছু খাবার দিলে হয়ত...ঘাড় ঘুরিয়ে মৃন্ময়ীকে ডাকতে গিয়েও সামলে নিলেন। থাক্‌। মৃন্ময়ী আজকাল অকারণে বড় অবুঝ হয়ে পড়েন। আসলে মেয়েদের কল্পনার ঘুড়ি একবার আকাশে উড়তে শুরু করলে তাকে মাটিতে নামানো বড় কঠিন। কী যে এক যুক্তিহীন আশংকা মাথায় ঢুকেছে মৃন্ময়ীর!

যুক্তিহীনই তো। বুড়ি আসার দিন পনেরোর মাথায়, গোবিন্দর মা হঠাৎ সেদিন আজগুবি খবরটা এনে ছড়িয়ে দিল চারদিকে। তড়বড় বাসন মাজতে মাজতে খই এর মতো গল্প ছড়াল,—হদিশ একটা পেয়েছি গো মা। বুড়ির ঘর নাকি সেই বাসন্তীর দিকে। গাঙ্ পেরিয়ে যেতে হয়।

—তুমি কি করে জানলে?

—বুড়ির গাঁয়ের একজন আমাদের এদিকে এসেছে। সেই খবর দিল। তোমরা দেখেছ তাকে। ওই তো, ও পাড়ার মোড়ের বাড়িতে কাজ ধরেছে।

—সে কি! অত দূর থেকে এখানে এল কিভাবে?

—কিভাবে আবার। ঘরের লোকরাই ফেলে দিয়ে গেছে। দ্যাখো না বুড়ি একেবারে ধুম পাগল।

—আশ্চর্য! তারজন্য ফেলে দিয়ে যাবে?

—যাবে না? শুনলাম শুধু পাগলই নয়, বুড়ি ডাইনিও হয়ে গেছে। পটাপট সব গেরামের লোকদের মেরে ফেলছিল। তাই পাঁচজনে যুক্তি করে...

—যাহ্। এরকম আবার হয় নাকি! ছেলের বউ-এর আগে বিস্মিত প্রশ্ন ছুঁড়ে ছিলেন মৃন্ময়ী,—কোথায় ফেলে গেছিল?

—অত বিত্তান্ত বলতে পারবনি বাপু। শহরে এনে ফেলে দিয়ে গেছে শুনেছি। তারপর কি হল, কিভাবে এখানে এল তা ওই বুড়িই জানে। গোবিন্দর মা বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়েছিল,—তবে ডাইনি হয়ে গেছে একথা ঠিক। দ্যাখো না কেমন না খেয়েও বেঁচে থাকে।

কথাটা আংশিক সত্য বটে। অহোরাত্র একই জায়গায় তিন মাথা এক করে বসে থাকে বুড়ি। খেতে দিলে খোঁটে, না দিলে চায় না। নড়াচড়া করে না বিশেষ। পাশ দিয়ে যেতে যেতে লোকজন কখনও-বা পয়সা ছুঁড়ে দেয়। বুড়ি ফিরেও তাকায় না। কাঁথাকানির ওপর শুধুশুধুই চিকচিক করে ধাতব চাকাগুলো। তবে রাত পোহালে সকালবেলা সেগুলোকে আর দেখা যায় না। কোন্ মন্ত্রবলে রাতারাতি উধাও হয়ে যায়।

বাবলু বলে,—উধাও হবে কেন? রাত্তিরে কেউ তুলে নিয়ে যায়। মানুষের দ্বারা সবই সম্ভব।

শিপ্রার চোখ ছলছল করে তখন,—মানুষ বোলো না। বলো মানুষ নামের পশু। মানুষ কখনও মানুষকে অমন ছেঁড়া পোঁটলার মত ফেলে দিতে পারে?

—পারে। মানুষই পারে। দ্যাখো নিজের ছেলেরাই হয়ত মার বোঝা কেউ নেবে না বলে...

—উফ্। শিপ্রা শিউরে ওঠে।

মৃন্ময়ী হয়ত তখন ঝপ করে বলে বসেন,—এরকমই হয়। মা বাপ অথর্ব হয়ে পড়লে বোঝা হয়ে যায়।

এসব কথা হয় সাধারণত খাবার টেবিলে। রাত্তিরবেলা। ছেলে বউ শ্বশুর শাশুড়ি একসঙ্গে খেতে বসেন যখন। তারপর সবার খাওয়া হয়ে গেলে শিপ্রা কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু খাবার রাতের জন্য দিয়ে আসে বুড়িকে। উবু হয়ে সামনে বসে বলে,—খেয়ে নাও একটু। শুনছ? ও বুড়ি?

জরদ্গাব বুড়ি পিটপিট তাকায়। ছানিচোখে কি দেখে কে জানে! দেখেই শুধু। শিপ্রা কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে আসে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা প্রায়ই দেখেন প্রিয়ব্রত। মেয়েটার মন এখনও খুব নরম। হাজার হোক ছেলেমানুষ তো! মৃন্ময়ীও আগে আগে নামতেন নীচে। বুড়ির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেন। আজকাল আর যান না। ওপর থেকে হয়ত বা প্রিয়ব্রতকে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করেন,—সত্যি বুড়ি ডাইনি নয়ত?

—কি যে বলো। প্রিয়ব্রত হেসে ওঠেন জোরে,—তুমিও দেখছি গোবিন্দর-মার মত কথা বলছ।

—কি জানি বাপু! মৃন্ময়ী আরও গম্ভীর হয়ে যান,—আমার যেন কেমন লাগে। বউটা এত গায়ের কাছে গিয়ে বসে...

—থামো তো। প্রিয়ব্রত ধমকে ওঠেন,—বোকার মত কথা বোলো না।

মৃন্ময়ী রেগে ওঠেন,—আমি তো শুধু বোকার মতই কথা বলি।

প্রিয়ব্রত বারান্দা থেকে ঘরে ফিরলেন। প্রচণ্ড গরম যাচ্ছে। বর্ষা এবার দেরি করছে বড়। আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে চলল এখনও মৌসুমী বায়ুর দেখা নেই। বৃষ্টি শুরু হলে বুড়িটাকে রাস্তায় ফেলে রাখা খুব অমানবিক কাজ হবে। সদর দরজার এপারে সরু প্যাসেজটাতে যদি জায়গা দেওয়া যায়, মৃন্ময়ী কি খুব আপত্তি করবেন? প্রিয়ব্রত পাখাটাকে জোর করে দিলেন। বেলা বাড়ছে। উষ্ণতা গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। জানালার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা তেজী রোদের দিকে চোখ রাখলেন। এখন শুধুই বেলা বাড়ার সময়। অবসরই অবসন্ন এখন। রিটায়ারমেন্টের পর ভেবেছিলেন কিছু একটা কাজকর্ম শুরু করবেন নতুন করে। নিদেনপক্ষে কোনও ছোট ব্যবসা। ভাবতে ভাবতেই দিন যাচ্ছে। এরপর কোন্‌দিন হয়ত বুড়িটার মত অথর্ব হয়ে পড়বেন। ওরকম একটা জড়বস্তু মাত্র। ওহ্। নিজের জীবন নিজের কাছেই ক্রমে কেমন অসহায় হয়ে পড়ে। না। মরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন না প্রিয়ব্রত। তিনি আরও আরও অনেকদিন বাঁচতে চান।

বিছানায় বসেই প্রিয়ব্রত শুনতে পেলেন মোটরবাইকের গর্জন। বাবলু অফিস চলে গেল। শব্দটার রেশ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ির গলা বেজে উঠল আবার,

—ডাক এসেছে গোওও...

কিসের ডাক? কেন ডাক? বুড়ি আজ যেন বেশি ভয় দেখাতে চাইছে তাঁকে? মোটেই ভয় পান না তিনি। খাট থেকে নেমে বারান্দার দিকের দরজাটা হঠাৎ চেপে বন্ধ করে দিলেন প্রিয়ব্রত।

বিকেল থেকে মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। ঘন মসিবর্ণ আষাঢ়ে মেঘ। তবে বৃষ্টি নামেনি এখনও। নামেনি বলেই গুমোট তীব্র আরও। দোতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়েও দরদর ঘামছেন প্রিয়ব্রত,—কটা বাজল বলো তো?

মৃন্ময়ী ঝুঁকে ঘরের দেওয়ালঘড়ি দেখলেন,—নটা বাজে প্রায়। বলেই উদ্বিগ্ন মুখে মোড়ের দিকে তাকালেন,—বাবলুর কি হল বলো তো?

—কি হবে, নিশ্চয়ই কাজে আটকে গেছে। মৃন্ময়ী নয়, যেন নিজেকেই নিজে বোঝাচ্ছেন প্রিয়ব্রত। ছেলেটা সাধারণত এত দেরী করে না। নতুন বিয়ে করেছে, সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসে।

—বউমাকে কিছু বলে যায় নি?

—ওফ্, কতবার বলব? মৃন্ময়ী অধৈর্য হচ্ছেন,—তোমাকে আজকাল এক কথা এতবার করে বলতে হয়।

—তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি? প্রিয়ব্রতও রেগে উঠলেন দুম করে,—তোমার ছেলে তো আজকাল অফিস যাওয়ার সময় একবার দেখা করেও যায় না। আগে আগে তাও...

—সে তো আমাকেও বলে যায় না। বউ পেয়ে লায়েক হয়ে গেছে। মৃন্ময়ীর গলায় সামান্য অভিমান।

—ঠিক আছে। ঠিক আছে। একজনকে বলে গেলেই হল। বউমাকে তো বলে যায়। প্রিয়ব্রতর গলা শান্ত হল,—যাও না, আরেকবার বউমাকে জিজ্ঞেস করে এসো না বেরোনোর সময় কিছু বলে গেছে কিনা।

—আমি যেতে পারব না। মৃন্ময়ী পাশের ল্যাম্পপোস্টটার দিকে চোখ রাখলেন,—দরকার হয় তুমি যাও।

—বেশ। তাই যাচ্ছি। প্রিয়ব্রত ঘরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন,—একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?

—কি?

—বুড়িটা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে চুপ মেরে আছে। বলেই অপ্রস্তুত নিজের কাছেই। কেন বললেন কথাটা? এমনিই?

মৃন্ময়ী সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন ঘরে,—সত্যি তে। কখন সুর থামল বলো তো?

—বোধহয় বাবলু যাবার পর পরই। বলতে গিয়েও প্রিয়ব্রত সামলে নিলেন। দূর, অহেতুক ভয় দেখানোর মানে হয় না। শিপ্রার ঘরের সামনে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। ঠিক কখন কান্না থামিয়েছে বুড়ি! বাবলু যাওয়ার পর পরই! নাকি আরও পরে! না একটু আগে! মনে পড়ছে না। ইদানীং সব কিছু হঠাৎ হঠাৎ এমন গুলিয়ে যায়! শিপ্রার ঘরে আস্তে টোকা দিলেন,—বাবলু আজ এত দেরি করছে কেন বউমা?

—জানি না বাবা। শিপ্রা উঠে এল,—বুঝতে পারছি না।

—ওর অফিসের ফোন নাম্বারটা আছে তোমার কাছে? আমি যে কোথায় রেখেছি...

—আছে। শিপ্রা হাসল নরম করে,—তবে এখখুনি ব্যস্ত হবার কি আছে? আর কিছুক্ষণ দেখে...

—আশ্চর্য! না বলে গেলে এত দেরি তো করে না কখনও। প্রিয়ব্রত বিড়বিড় করে উঠলেন।

মেয়েটা তবু শান্ত হাসছে,—নিশ্চয়ই কোনও কাজে আটকে গেছে। আর কিছুক্ষণ দেখা যাক।

প্রিয়ব্রত মন্থর মাথা নাড়লেন। বলতে পারলেন না তাহলে তুমি একা ঘরে চুপচাপ শুয়ে কেন? কেন বাইরের ঘরে বসে রোজকার মত টিভি দেখছ না? নাহ্। ছেলের বউকে এভাবে বলা যায় না। ধীর পায়ে নিজের ঘরে ফিরলেন। ঠিক তখনই ঝুপ করে চারদিকের আলো নিভে গেল। লোডশেডিং।

—ব্যস। এখন তিন ঘণ্টার ধাক্কা।

মৃন্ময়ী টেবিল হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন,—যা বলেছ। ছেলেটা সারাদিন পর ফিরে গরমে পচে...

—বৃষ্টিটা এসেও আসছে না। মোমবাতি জ্বলবার পর প্রিয়ব্রত হাতপাখা টানলেন।

—এখন না আসাই ভাল। বাবলুটা তাহলে রাস্তায় ভিজবে।

—তা অবশ্য ঠিক। এখনকার বৃষ্টি মোটেই ভাল নয়।

দুজনে মিলে জল্পনা করে চলেছেন আবোল-তাবোল। প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে

যাচ্ছেন। কথা থেকে কথায়। দেওয়াল ঘড়ি সশব্দে রাত বাড়িয়ে চলেছে। কারেন্ট গিয়েও চলে এল। বৃষ্টি এসেও এল না।

শিপ্রা একসময় এসে দাঁড়াল দরজায়।

—বাবা, আমি একবার পাশের বাড়ির থেকে ফোন করে দেখব?

—কোথায় করবে?

—ওর অফিসে।

—তুমি থাকো। আমি যাচ্ছি। প্রিয়ব্রত ব্যস্তভাবে পাঞ্জাবি গলালেন গায়ে। সাড়ে দশটা বেজে যাওয়ার পর থেকে মৃন্ময়ী যেন অসাড় হয়ে গেছেন। কথাই বলছেন না। প্রিয়ব্রত যখন নেমে আসছেন নীচে, তখনই শিপ্রার পাশে এসে দাঁড়ালেন হঠাৎ।

—শোন।

—কি হল?

—তোমরা কি এখনও মনে করো আমার সন্দেহ ভুল?

—কি সন্দেহ? প্রিয়ব্রতর গলা কেঁপে গেল।

—বুঝেও না বোঝার ভান করছ কেন? তোমাদের ওই ডাইনি বুড়িটার কথা বলছি।

—আহ্। প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে নিলেন—উল্টোপাল্টা চিন্তা ছাড়ো তো। আমি দেখছি। অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কিছু নেই ঠিকই, তবু কেন যে বুক কাঁপে! ছেলেটা মোটর সাইকেলে অফিস যায়...রাস্তাঘাটে রোজই তো কোনও না কোনও...বীভৎস দুর্ঘটনার দৃশ্যকে জোর করে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলেন প্রিয়ব্রত। কাছের লোকেদের সম্পর্কে কেন যে খারাপটাই আগে মনে আসে! রাস্তায় নেমে লম্বা শ্বাস টানলেন। আকাশ ঘোর লাল বর্ণ ধারণ করেছে। পূব কোণে একঝলক বিদ্যুৎও দুলে উঠল। বুড়িটার সামনে কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। এই অসহ্য গরমেও কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুটিয়ে মুটিয়ে পড়ে আছে। ঠিক একটা নোংরা আবর্জনার মত দেখাচ্ছে ঘুমন্ত শরীরটাকে। এই গরমে পাগল ছাড়া কেউ এভাবে ঘুমোতে পারে না। এগিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীর দরজার বেল টিপলেন প্রিয়ব্রত।

না। বাবলুর অফিসে টেলিফোন ধরল না কেউ। বেশ কয়েকবার নম্বর ঘোরালেন। বেজেই চলেছে। জিতেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—আর কোথাও কি খোঁজ করা যায়? যদি অন্য কোথাও গিয়ে টিয়ে থাকে?

জিতেনবাবুর বড় ছেলে বলল,—চিন্তা করবেন না। আমি এগিয়ে দেখছি।

তার মা বললেন,—কী কাণ্ড! বাবলু তো এমন করে না কখনও! এগারোটা বেজে গেছে...

প্রিয়ব্রতর সব গুলিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। কোথায় যাওয়া যায় এখন? থানায়? হাসপাতালে? কোন্ হাসপাতালে যাবেন? বাবলু কি আইডেনটিটি কার্ড পকেটে নিয়ে বেরিয়েছে? হয়ত বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে আছে মর্গে। কতদিন ধরে পই পই করে বলেছেন মোটর সাইকেল বেচে দেওয়ার জন্য...প্রিয়ব্রত দুহাতে চুল খামচে ধরলেন। পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। হয়ত পড়েই যেতেন, জিতেনবাবুর ছেলেরা এসে জাপটে ধরেছে।

—কি হল মেসোমশাই?

প্রিয়ব্রত কোনওরকমে দুদিকে মাথা নাড়লেন।

—চলুন। বাড়িতে চলুন। আমরা দেখছি...যদি থানায় যাবার দরকার হয়...

—আরেকটু দেখি। আর আধ ঘণ্টাটাক। প্রিয়ব্রত শব্দ করে শ্বাস ফেললেন। টলমলে পায়ে বাইরে এলেন। জিতেনবাবু নেমে এসেছেন সঙ্গে। প্রিয়ব্রত চেষ্টা করেও প্রশ্নটাকে ধরে রাখতে পারলেন না ঠোঁটে।

—আচ্ছা, ওই বুড়িটার সম্পর্কে আপনার কি মনে হয়?

—হঠাৎ বুড়িটার কথা কেন? জিতেনবাবু রীতিমত অবাক।

—না। এমনি। আপনি কি কিছু শুনেছেন?

—কি বলুন তো?

—ওই যে গোবিন্দর মা বলে... প্রিয়ব্রত ঢোঁক গিললেন।

—ওহো। সেই আষাঢ়ে হল্প? সত্যি, কোন্ যুগে দেশটা পড়ে আছে বলুন তো। এদিকে কম্পিউটার, স্যাটেলাইট...

প্রিয়ব্রত চোখ বন্ধ করলেন। এই কথাগুলোই শুনতে চাইছিলেন কারুর মুখ থেকে। রাস্তায় বেরিয়ে দেখতে পেলেন শিপ্রা, মৃন্ময়ী দুজনেই নেমে এসেছেন নীচে। একেবারে সদর দরজায়। পায়ে পায়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালেন,—আমার এখনও মনে হচ্ছে বাবলু কোথাও আটকে পড়েছে।

—ফোন পেলে না?

—না। বেজে যাচ্ছে।

—কি হবে? মৃন্ময়ী ফুঁপিয়ে উঠলেন। শিপ্রার চোখেও অশ্রু টলটল। দেখাদেখি আকাশও আর চুপ থাকতে পারল না, বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ল শরীরে। প্রিয়ব্রত পা বাড়ালেন,—আমি এগিয়ে দেখছি।

শিপ্রা নেমে এল,—চলুন, আমিও যাই।

—যাবে? চলো। প্রিয়ব্রত পুত্রবধূর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছেন। কোথায় যাবেন জানেন না। শুধু বুঝতে পারছেন যাওয়া দরকার তাঁরও। শিপ্রারও। ভুল হল। মৃন্ময়ীও তো খুঁজছেন ছেলেকে। খুঁজছেন বলেই না পিছু ডাকলেন আবারও,—দাঁড়াও।

বেশ জোর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঝোড়ো হাওয়াও ছুটে আসছে বৃষ্টির পিঠে চড়ে। মেঘ হুংকার দিয়ে উঠল। আকাশ চিরে ফালা ফালা হল বিদ্যুৎ। রাস্তার বাতিগুলো ঝাপসা আচমকাই। সেই আলোয় ভুতুড়ে ছায়ার মত মৃন্ময়ী দলাপাকানো বুড়িটার ছেঁড়া কাঁথায় পা রেখে দাঁড়িয়েছেন। দুই চোখ জ্বলছে নিভছে আকাশের মত।

—এই আপদটাকে আগে বিদায় করো। এখ্খুনি।

রাস্তাঘাট বেশি নির্জন হয়ে গেছে যেন। এত নির্জন যে গা ছমছম করে। আশপাশের বাড়ির বাতিরাও নিভু নিভু। আলো আঁধারে বুড়ির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনজনই। ভেজা কাঁথার তলায় আরও গুটিয়ে যাচ্ছে বুড়ি। গুটোতে গুটোতে এত্তটুকুন ডেলা। প্রিয়ব্রত এদিক ওদিক তাকালেন। না, কেউ লক্ষ করছে না তাঁদের। জিতেনবাবুরাও না। বিবেককে ঝেড়ে নিতে একটুও সময় লাগল না। পাড়া প্রতিবেশীর কি, তাদের ঘরের সামনে তো আর বুড়ি পড়ে নেই! তাদের কারুর ছেলেও হারিয়ে যায়নি তাঁদের মত। যদি কেউ দেখে দেখুক। প্রিয়ব্রত নিঃশব্দে কাঁথা শুদ্ধ বুড়িকে ওঠানোর চেষ্টা করলেন। সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন মৃন্ময়ী। শিপ্রাও এগিয়ে এল। কাঁথার তিন কোণ ধরে আছে তিনজনে। বুড়ি ভেতরে নিথর। বুঝি জেনেই গেছে এরকম হবে! এরকমই এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাচার হওয়া।

বৃষ্টি ভেজা অন্ধকারে যখন প্রায় মোড়ের মাথায় তিনজনে, তখনই আওয়াজটা শোনা গেল। মেঘের মত গুমগুম শব্দ দূর থেকে কাছে আসছে। আরও কাছে। একেবারে সামনে এসে থামল,—একি! তোমরা বৃষ্টিতে এখানে দাঁড়িয়ে? ছিছি। ...ওটা কি? তোমাদের হাতে?...ইস্। একটা কাজে এমন বিশ্রীভাবে

...বাবলু একাই বৃষ্টির মতো কথা বলে চলেছে। বাকি তিনজন নির্বাক। তিনজন নয়, চারজন। বুড়িটাও তো শব্দ করছে না কোনও। শূন্যে ঝুলছে একাই। একবার তো ডেকে উঠতে পারে,

—ঘরকে চলো গো এবার...ও বাবারা...

থাক। এ সময় কারুর কোনও কথা না বলাই ভাল।

শহিদের বাবা

মুখে মুখে ছড়িয়ে গেল খবরটা। মধুপুর গ্রামের বাসিন্দা দীনবন্ধু সাহুর ছেলে রমেশ সাহু কাশ্মীর যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। আশপাশের চা-দোকান মুদিখানা বটতলা বাজার স্কুল পঞ্চায়েত-অফিস সর্বত্র আজ ঘুরে ফিরে একটাই নাম। রমেশ সাহু। রমেশ সাহু।

সংবাদটা এসেছিল কাল সন্ধেয়। শ্যামপুর থেকে কাল বেলাবেলিই ফিরেছিল দীনবন্ধু। মনমেজাজ বিশেষ ভাল ছিল না, কাল সোমবার ছিল হপ্তা পাওয়ার দিন, ঘুরিয়ে দিয়েছে হরেন পাল। গজগজ করতে করতে এসে হাত-পা ধুল, সবে চা মুড়ি নিয়ে বসেছে, তখনই গাঁয়ে মিলিটারি।

দীনবন্ধুর বাড়ি অবধি আসেনি মিলিটারির জিপ। রাস্তা নেই। বাঁশবাগানের ওপারে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে গটমট হাজির দুই জলপাইরঙ উর্দি— দীনবন্ধু সাহু কি এই বাড়িতেই থাকেন?

মুড়ির কাঁসি ফেলে ধড়মড় উঠে দাঁড়াল দীনবন্ধু, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই দীনবন্ধু।

সঙ্গে সঙ্গে ঘটাং স্যালুট, —আমরা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আসছি। আপনার ছেলে রমেশ সাহু...

লোকটার স্বরে বুঝি হিমেল আভাস ছিল, বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল দীনবন্ধুর। তার উর্ধ্বতন চোদ্দো পুরুষে কেউ কখনও মিলিটারিতে যায়নি, ছেলেও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে মাত্র সাত মাস, এদের রীতিপ্রকরণ সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই। লোকটার কথার মাঝপথেই তার গলা থেকে শব্দ ছিটকে এল,

—কী হয়েছে আমার রমেশের?

টুপি খুলল লোক দুটো। মাথা নামিয়ে বলল, —তিনি আর নেই। বিহার

রেজিমেন্টের পাঁচ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বীর সিপাহি রমেশ সাহু রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। গত সতেরোই জুন...

আরও কী সব যেন বলে যাচ্ছিল লোক দুটো। কী ভাবে বরফের মাঝে পাহাড় চূড়া দখলের লড়াই-এ অসীম শৌর্য দেখিয়েছে রমেশ, কতগুলো শত্রুসৈন্যকে সে খতম করেছে, কালাশনিকভের গুলি বুকে নিয়েও সে দমেনি, একা হাতে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে বাংকার...সাত দিন পর তার দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, হিন্দু মতে দাহকার্যও সারা...সেনাবাহিনীর তরফ থেকে আবার সময় মতো যোগাযোগ করা হবে পিতা দীনবন্ধু সাহুর সঙ্গে, রমেশ সাহুর শেষ স্মৃতিচিহ্ন পৌঁছে দেওয়া হবে...

এত কথার কিছুই যেন দীনবন্ধুর কানে প্রবেশ করছিল না। আঁধার ঘনিয়ে এল চোখে, টলতে টলতে উঠোনে পড়ে গেল। সনকা ছুটে বেরিয়েছিল ঘর থেকে। প্রথম অভিঘাতে ডুকরে উঠল, তারপরই কী বুকচাপড়ানি আর আছাড়ি-পিছাড়ি। দীনবন্ধুর বুড়ি মা চপলাবালা কাঁপা কাঁপা পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল দাওয়ায়, কী ঘটেছে বোঝা মাত্র তারও কণ্ঠ চিরে খোনা খোনা বিলাপধ্বনি। ভজন-হরি-শ্যামাও সুর তুলেছে। শ্যামা কাঁদছে অঝোরে, ফোঁপাচ্ছে দু ভাই।

গ্রামে মিলিটারির জিপ সচরাচর ঢোকে না। এই মধুপুর গ্রামে তো কস্মিনকালেও না। হয়তো বা সেই কারণেই গোটা মধুপুর ভেঙে পড়েছিল দুই ফৌজির পিছু পিছু, গোল গোল চোখে শুনছিল মিলিটারির বার্তা, নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছিল। সামরিক উর্দিরা বিদায় নিতেই তারা ঘিরে ধরেছে দীনবন্ধুর পরিবারকে। কেউ বা দীনবন্ধুকে ওঠানোর চেষ্টা করছে, কেউ সনকাকে সামাল দিচ্ছে...

তবু ক্রন্দনরোল থামছিল না। একুশ বছরের তরতাজা ছেলেটাকে হারানোর দুঃখ মথিত করছিল গোটা গাঁয়ের বাতাস।

আজ সকাল থেকে অবশ্য পরিস্থিতি খানিকটা অন্য রকম। উচ্চকিত কান্না আর নেই, পরিবেশ শোকস্তব্ধ। ঘন ঘন লোক আসছে দীনবন্ধুর বাড়ি। পরিচিত। অর্ধ পরিচিত। অপরিচিত। যে শোনে সে-ই একবার উঁকি দিয়ে যায়। স্থানীয় এক রাজনৈতিক দলের উৎসাহী ছেলেছোকরারা ঝটপট একখানা মিছিলও বার করে ফেলল। প্ল্যাকার্ড হাতে গ্রাম ঘুরছে, দীনবন্ধুর দরজায় এসে দাঁড়াল, ধ্বনি তুলছে মুহুর্মুহু। বীর জওয়ান রমেশ সাহু জিন্দাবাদ। শহিদ রমেশ সাহু অমর রহে। রমেশ তোমায় ভুলছি না ভুলব না।...

বেলা বেড়েছে। সূর্য এখন প্রায় মাঝ গগনে। এবার যদিও আষাঢ় মাসে বর্ষা

হচ্ছে খুব, আজ আকাশে তেমন মেঘ নেই। রোদ বেশ চড়া, গা হাত-পা জ্বলে যায়। গুমোটও বেড়েছে বড়, গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

দীনবন্ধুর খড়ের চালার সামনেটায় এখনও বড়সড় জটলা। কোলাহল। কাচ্চাবাচ্চাও আছে অনেক, ঘুরে ঘুরে তারা উত্তেজনার আঁচ পোহাচ্ছে। কাঁচা উঠোনের একেবারে মধ্যিখানে দীনবন্ধু, শোকার্ত মুখখানিতে এখন রীতিমত ঘোরলাগা দশা। চার দিক থেকে অজস্র প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে রমেশের নামে, হাঁ করে শুনছে। একেবারে নীরবও সে নেই, কথা বলছে টুকটাক।

হঠাৎই মৃদু শোরগোল উঠল। প্রায় ছুটতে ছুটতে আসছে পঞ্চায়েত-প্রধান কাম গাজিপোতা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভূগোল শিক্ষক দিবাকর ঘোষ। চেঁচাচ্ছে,—তড়িৎবাবু আসছেন! তড়িৎবাবু আসছেন!

বলতে বলতেই পৌঁছে গেছে তড়িৎ ব্যানার্জি। স্থানীয় এম এল এ। উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক। মাঝবয়সী। বাড়ি কাছেই, অনন্তপুর। পরনে ট্রাউজার বুশশার্ট, হাতে শ্বেতশুভ্র পুষ্পস্তবক।

সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়েছিল লোকজন। ফুলের গোছা হাতে তুলে দিয়ে ভারী অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে দীনবন্ধুর কাঁধে হাত রাখল তড়িৎ। সমবেদনা মাখানো স্বরে বলল, —তোমায় যে কী বলে সান্ত্বনা জানাব... ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। রমেশ আমাদের গোটা কন্সটিটুয়েন্সিকে গর্বিত করল।

নেতাদের করস্পর্শে বোধহয় বিশেষ কিছু থাকে, দীনবন্ধুর শোকটা নতুন করে চাগাড় দিয়ে উঠল। কালোকুলো খসখসে চামড়ার মানুষটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, —আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না বাবু। আমার রমেশ...

—উঁহু, একদম চোখের জল নয়। জানো, তুমি কে? আমাদের দেশমাতৃকার বাহাদুর সন্তানের বাবা তুমি। আজ রমেশের জায়গায় আমার ছেলে যদি যুদ্ধে মারা যেত, আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করতাম। আমি তোমাকে ঈর্ষা করি... কী যেন নাম তোমার? হ্যাঁ হ্যাঁ, দীনবন্ধু। তুমি ধন্য।

দীনবন্ধুর বুকে এখনও চাপ ভাবটা অনড় হয়ে আছে বটে, তবু যেন সে চোরা রোমাঞ্চ অনুভব করল। কোথায় এম এল এ বাবু, আর কোথায় গরিব দীনু মিস্তিরি... আজ কি সব তুল্য-মূল্য হয়ে গেল? যুদ্ধে মরে রমেশ এত উঁচুতে উঠিয়ে দিল তাকে?

তড়িৎ পাশে দাঁড়ানো দিবাকরকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, —দীনবন্ধু যেন কী করে?

—কাঠের কাজ।

—ছুতোর? আই মিন সূত্রধর? তড়িৎ গলা ঝাড়ল, —আই মিন শিল্পী? বাহ্ বাহ্, শিল্পীর সন্তান দেশের জন্য যুদ্ধ করছে, ভাবা যায়!

দীনবন্ধু নুয়ে পড়ল। মিনমিন করে বলল, —আজ্ঞে, আমি তেমন কিছু নই। শ্যামপুরে পালেদের ফার্নিচারের দোকানে রোজ হিসেবে খাটি।

—ঠিক আছে ঠিক আছে, ওই হল। নিজের হাতে বানাও তো কিছু, না কী।

—আজ্ঞে, তা বানাই। টুল চেয়ার তক্তপোশ...। ওই তো উঠানে কাঠ রেখেছি, ঘরেও কাজ করি অল্পস্বল্প।

—অতি উত্তম। ছেলেমেয়ে কটি?

—চারটি। বলেও শুধরে নিল দীনবন্ধু। শ্বাস ফেলে বলল, —আজ্ঞে, এখন তিনটি।

—পড়াশুনো করে তো সব?

—ছোট দুটো এখনও তো পড়ছে। একজন পাঁচ কেলাসে, একজন সাত। মেয়েও সাত কেলাস অবধি পড়েছিল...। দীনবন্ধু মাথা নামাল, —ইস্কুল বিল্ডিং-ফি চায়, দিতে পারিনি।

—উমম্। একঝলক দিবাকরের চোখে চোখ রেখে নিল তড়িৎ, —কত বয়স হল মেয়ের?

—আজ্ঞে, সতেরো। এই তো, বড় ছেলের পরেই...। বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে।

—তো দিয়ে দাও বিয়ে। একজন শহিদের ঘর থেকে মেয়ে পাবে, এ তো যে কোনও ছেলের ভাগ্যের কথা। বলতে বলতে আবার তড়িতের দৃষ্টি দিবাকরে। কর্তৃত্বের সুরে বলল, —শুনুন। সরকার তো দীনবন্ধুকে যা দেওয়ার দেবেই, আপনারাও লোকালিটি থেকে কিছু অ্যারেঞ্জ করুন।

—অবশ্যই। ভাবছিলাম যদি একটা রমেশ সাহু ফান্ড খোলা যায়...

—ভাবনা কম, কাজ বেশি। ঢিলেমি করবেন না, লোকাল পিপ্লের সেন্টিমেন্ট থাকতে থাকতে... আমার নামে পাঁচশো এক ধরবেন। ছোটমোটো একখানা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করুন, সেখানে রমেশ সাহুর স্মৃতিতর্পণও হবে, দীনবন্ধুকেও আমরা অভিনন্দন জানাব। ওই দিনই লোকসমক্ষে দীনবন্ধুর হাতে টাকাটাও তুলে দেওয়া যাবে। মানুষ বুঝুক কারা দেশের সুসন্তানের জন্য ভাবে। শেষ বাক্যটি উচ্চ গ্রামে বলেই আবার তড়িতের গলা খাদে, —ওরা এখনও আসেনি, না?

বেঁটেখাটো দিবাকর দ্রুত ঘাড় নাড়ল। আরও নিচু গলায় বলল, —এখনও না।

ওরা কারা, কেন এখনও আসেনি, ওদের আসা না আসার অর্থ কী, বুঝতে

পারছিল না দীনবন্ধু। তবে ভারী অভিভূত হয়ে পড়ছিল সে। একবার বিধায়ক, একবার পঞ্চায়েত প্রধান, পেণ্ডুলামের মতো ঘাড় ঘুরছে তার।

তড়িৎ ব্যানার্জি ব্যস্ত মানুষ, কোথাও তাকে দু'দণ্ড স্থির দেখা যায় না। আজ তার তাড়াহুড়ো নেই একটুও। দিব্যি অলস মেজাজে কথা বলছে উপস্থিত জনতার সঙ্গে। নানান বিষয়ে। রমেশ সাহু। যুদ্ধ। দেশপ্রেম। আন্তর্জাতিক রাজনীতি। প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠছে দেশ ভক্তি, সীমান্তে আহত নিহত সৈনিকদের জন্য মমতা সহানুভূতি। কী করে কার্গিলে এত অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ে, কেন শয়ে শয়ে অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট হয়, তাই নিয়েই তার ক্ষোভ বিস্তর। বর্তমান যুদ্ধের পিছনে কী গভীর দেশি-বিদেশি রাজনৈতিক চক্রান্ত লুকিয়ে আছে, তা বোঝাতেও কসুর করল না সে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে, ক্ষণে ক্ষণে উদ্দীপিত হচ্ছে, শিহরিত হচ্ছে।

সহসা বাঁশবাগানের ধারে এক লাল মারুতি-ভ্যান। হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে জনা চার পাঁচ, একজনের কাঁধে ইয়া বড় ভিডিও ক্যামেরা। টিভির লোক। কুচোকাঁচার দল পোঁ পোঁ ছুটেছিল সেদিকে, একজন হ্যাট হ্যাট করে খেদাচ্ছে তাদের।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরও দুই তরুণের আবির্ভাব, তাদেরও একজনের কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি।

কলরব উঠল একটা। তড়িৎও মুহূর্তে শশব্যস্ত, —যাক, দুটো মিডিয়াই এক সঙ্গে এসে গেছে তাহলে।

সংবাদপত্র আগে পৌঁছে গেল দীনবন্ধুর কাছে। তড়িৎ ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, —কী হে বাদল, তোমরা লেট করলে যে? কথা ছিল সাড়ে এগারোটার মধ্যে হাজির হবে?

দিনরাত পত্রিকার আঞ্চলিক সংবাদদাতা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগে টিভি গোষ্ঠীর অগ্রবর্তী যুবকটি গলা ওঠাল, —হোয়াট আ মেস! রাস্তার কাদায় পাক্কা চল্লিশ মিনিট গাড়ি ফেঁসে গেল!

—কোথায়?

—এই তো নাউল না নউল কী যেন জায়গার নাম, তার কাছেই। মাটির রাস্তায় ঢোকার সময়ে।

—ওদিকে পুজোর পর কাজ শুরু হবে। তড়িৎ গলা খাঁকারি দিল, —আমার কন্সটিটুয়েন্সিতে বর্ষাকালে আমি ঠিকাদারদের পথঘাটে হাত দিতে দিই না।

—ও আচ্ছা, আপনিই এখানকার এম এল.এ? নমস্কার। নমস্কার।

অতঃপর টিভি-সংবাদপত্র-বিধায়ক পঞ্চায়েত প্রধানের ছোট্ট কনফারেন্স, উপচে পড়া ভিড়কে পাশে সরিয়ে। নতুন উদ্দীপনায় যুবকের দল আবার ধ্বনি বাজাচ্ছে, রমেশ সাহু অমর রহে অমর রহে...। এরই মধ্যে পুলিশ ভ্যানও এসে গেল একখানা। শ্যামপুর থানা থেকে। সম্ভবত আরও কোনও ভি আই পি আসছে রমেশ সাহুর বাবার কাছে। আগাম প্রস্তুতি।

দীনবন্ধু দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। রমেশের গরিমা ক্রমশ যেন শোককে ছাপিয়ে যাচ্ছে। সেই রমেশ, যার লেখাপড়ায় এতটুকু মাথা ছিল না, পর পর দু-বার মাধ্যমিকে গাড্ডু খেয়ে পড়াশুনোই ছেড়ে দিয়েছিল! সেই রমেশ, যে সংসারের নিত্যি অভাব অনটনে উত্যক্ত হয়ে বাবা মাকে না জানিয়ে সেনাবাহিনীতে গিয়ে নাম লিখিয়েছিল! সংসারে টাকা পাঠাবে বলে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে দীনবন্ধুকে খুঁজে নিয়েছে টিভি ক্যামেরা। লেন্স অ্যাডজাস্টমেন্টের পালা চলছে। বাদল সাহাও পকেট থেকে নোটবই বার করে ফেলল।

টিভির আগেই সংবাদপত্রের প্রশ্ন শুরু, —আচ্ছা দীনবন্ধুবাবু, খবরটা শুনেই আপনার ঠিক কী রিঅ্যাকশান হয়েছিল?

দীনবন্ধু ফ্যাল ফ্যাল তাকাল।

—মানে, আপনার মনের কী অবস্থা হয়েছিল? খুব আঘাত পেয়েছিলেন? নাকি গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল?

দিবাকর সরে এসেছে দীনবন্ধুর পাশটিতে। কানে কানে বলল, —বলো কষ্টও পেয়েছ, গর্বও হয়েছে।

দীনবন্ধুর শুধু শেষটুকু কানে গেল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, —গর্ব হয়েছে।

—আপনি যদি কাইন্ডলি আপনার ছেলের সম্পর্কে কিছু বলেন...। আমাদের পত্রিকার পাঠক অমর জওয়ান রমেশ সাহুর জীবন সম্পর্কে জানতে চায়।

আবার ফাঁপরে পড়ল দীনবন্ধু। এই ভিড় ভাড়াক্কার মাঝে রমেশের কোন কথাটা বলা উচিত এখন? রমেশ তরতরিয়ে নারকেল গাছে উঠতে পারত? গাঙ্গুলিদের বড় দিঘিটা রমেশ এক দমে পার হয়ে যেত? রমেশ খুব ডানপিটে ছিল, সেটা বলবে কি? বলবে, একবার এক ঘায়ে একটা কেউটে মেরেছিল রমেশ? ডানপিটে বলবে, নাকি সাহসী? ছেলে বাপের কাজে হাত না লাগিয়ে বসে বসে অন্ন ধ্বংস করত বলে দীনবন্ধু প্রচুর গালাগাল করত রমেশকে, এ কথাটা নিশ্চয়ই এখন বলা যায় না!

দীনবন্ধু কথা হাতড়াচ্ছিল। স্মৃতি হাতড়াচ্ছিল।

টিভির লোক উশখুশ করে উঠল, বাদলকে বলল, —আপনি ওঁকে নার্ভাস করে দিয়েছেন, অনেক টাইম লেগে যাবে, আমাদের আগে সেরে নিতে দিন।

বাদল গম্ভীর মুখে বলল, —ডিসটার্ব করছেন কেন? লেট মি ফিনিশ।

—চটছেন কেন মশাই? আমাদের প্রবলেমটা ফিল করুন। চারটের মধ্যে ক্যাসেট জমা দিতে হবে, না হলে নিউজটা আজ কভার করা যাবে না। আমরা যাওয়ার পর আপনি সারাদিন ধরে প্রশ্ন করুন না।

—আমারও আইটেমটা কালকেই বেরোবে।

—সে তো আপনি নটার সময়েও ম্যাটার পাঠাতে পারনে। সরুন, সরুন।

বিবাদের উপক্রম হয়েছে, তড়িৎ জলদি হস্তক্ষেপ করল, —বাদল, তুমি তো লোকাল ছেলে, অতিথিদের আগে ছেড়ে দাও।

বাদল সরে গেল মুখ হাঁড়ি করে। নোট বই পকেটে ঢোকায়নি। টিভির প্রশ্নকর্তার উত্তরগুলোই সে টুকে নেবে বোধহয়। সঙ্গী ফটোগ্রাফারকেও কী ইশারা করল, সে পটাপট শাটার টিপছে।

টিভি ক্যামেরা প্রস্তুত। যন্ত্র ঘুরছে এদিক ওদিক। দীনবন্ধুর ভেজা কালো জীর্ণ খড়ের চাল হয়ে আকাশ গাছগাছালি ছুঁয়ে এল ক্যামেরা। কর্ডলেস মাইক্রোফোন হাতে আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে দীনবন্ধুর মুখের সামনে। মাইক্রোফোনের সুইচ বার কয়েক অন অফ করে নিয়ে বলল, —বাড়ির সকলকেও একটু ডাকুন না প্লিজ।

ছেলেমেয়েরা পিছনেই আছে। ঈষৎ অসহায় মুখে অন্দরের পানে তাকাল দীনবন্ধু। ইঙ্গিত বুঝে দৌড়ে ঘরে গেল শ্যামা, মুহূর্ত পরে ফিরে এল। শুকনো চোখে বাবার দিকে তাকিয়ে দু দিকে মাথা নাড়ছে।

দিবাকর বলল, —থাক না ভাই, আবার ওদের টানাটানি কেন? প্রশ্ন যা আছে দীনবন্ধুকেই করুন।

টিভির লোক খুশি হল, কি বিরক্ত, বোঝা গেল না। পেশাদার ভঙ্গিতে মুখে মাইক্রোফোন ধরেছে, —আচ্ছা দীনবন্ধুবাবু, আপনার ছেলের যে এই জ্বলন্ত দেশপ্রেম, এর প্রেরণা উনি পেয়েছিলেন কোথ্থেকে?

দীনবন্ধু হকচকিয়ে গেল।

তড়িৎ তাড়াতাড়ি বলে উঠেছে, —এক সেকেন্ড। আমার একটা কথা ছিল, সেটা প্রথমে বলে নিই?

—কী কথা?

—আমরা একটা রমেশ সাহু ফান্ড খুলছি। জনগণই খুলছে, আমি শুধু ইনিশিয়েটার। দীনবন্ধুকে আমরা একটা...

—আগে দীনবন্ধুবাবুকে কভার করে নিই? তারপর না হয়...

—তাই হোক। তড়িৎ কাঁধ ঝাকাল। সামান্য আহত যেন। বলল,

—আপনাদের প্রশ্নের সিলেকশান ভাল নয়। দেশপ্রেমের আবার প্রেরণার কী আছে? প্রতিটি নাগরিকই দেশকে ভালবাসে।

টিভির লোক কথাটা গায়ে মাখল না। মাইক দীনবন্ধুর দিকে বাড়িয়ে বলল, —রমেশ সাহু কবে নাগাদ কার্গিল গিয়েছিলেন?

দীনবন্ধু নতুন ধন্দে। আমতা আমতা করে বলল, —আজ্ঞে, আমি তো ঠিক জানি না।

—উনি আপনাদের চিঠি দিতেন না?

—না মানে...রমেশ তো মিলিটারিতে ঢুকলই গত পুজোর পর। দুটো চিঠি লিখেছে এর মধ্যে।

—শেষ চিঠি কবে পেয়েছেন?

—বোশেখ মাসে। ওই যে বড় ঝড়টা হল, তার আগের দিন।

—তাতে কি লিখেছিলেন, ওঁকে কাশ্মীর পাঠানো হচ্ছে?

—ও তো কাশ্মীর দেশেই ছিল।

—কাশ্মীরের ঠিক কোন জায়গায় ছিলেন উনি? বাটালিক? কার্গিল? মাশ্‌কো? দ্রাস?

—আজ্ঞে, সে আমি বলতে পারব না।

—কোন্ চুড়ো জয় করতে গিয়ে উনি প্রাণ হারালেন? টলোলিং? টাইগার হিল? মিডল্ অফ জুন তো ওদিকটাতেই...

—আজ্ঞে, মিলিটারির লোক কাল কী যেন একটা নাম বলল, আমার মনে নেই।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলছে। দীনবন্ধু সপ্রতিভ হয়েছে অনেক, উত্তর দিচ্ছে অকম্পিত স্বরে। উৎসুক জনতা ক্ষণে ক্ষণে ধেয়ে আসছে, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল দীনবন্ধুর গায়ে। টিভিতে মুখ দেখানোর দুর্লভ সুযোগ কেউ বুঝি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। অপ্রসন্ন চিত্রগ্রাহক কনস্টেবলকে ডাকল, খাঁকি উর্দি সেপাই লাঠি তুলে হঠাল জনতাকে। টিভির অন্য লোকগুলোও ভারী চটপটে, ভজন আর হরিকে সঙ্গে সঙ্গে এনে দীনবন্ধুর দু-পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। হরি খালি গা মোচড়াচ্ছে, সরে যেতে চাইছে বাবার আড়ালে।

ক্ষণিক বিরতির পর ফের মাইক্রোফোন চালু, —এবার শেষ প্রশ্ন। দীনবন্ধুবাবু, আপনার তো আরও দুই ছেলে, তাদেরও কি আপনি দেশের জন্য সেনাবাহিনীতে পাঠাবেন?

এবার দীনবন্ধু চুপ একটুক্ষণ। বুঝে গেছে এতগুলো লোক এখন কী জবাব চায়। দুরু দুরু বুকে তার জন্যই বুঝি প্রস্তুত করছিল নিজেকে, তার আগেই ঘর থেকে উড়ে এল এক আর্ত নারীস্বর, —কক্ষনো না। কোনওদিন না। আবার একটা ছেলেকে মরতে পাঠাব, অ্যাঁ?

কাট্। কাট্। কাট্।

এডিট্! এডিট্।

প্রশ্নকর্তা চটজলদি মাইক্রোফোন অফ করে দিল।

চরাচরে রাত নেমেছে। ঘন আঁধার মাখা রাত। দিনভার শুকনো থাকার পর সন্ধে থেকে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে টিপটিপ। ঝরেই চলেছে। একটানা। একঘেয়ে। বাতাস বইছে অল্প অল্প, তেমন বলার মতো কিছু নয়। ব্যাঙ ডাকছিল।

দীনবন্ধুর ঘরে আজ চুলো জ্বলেনি। দুপুরে প্রতিবেশী নন্দদের বাড়ি থেকে ভাত এসেছিল, সনকা দাঁতে কুটোটি কাটেনি, ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসে দীনবন্ধু একটা-দুটো দানা খুঁটছিল শুধু। রাতের জন্য যৎসামান্য চিঁড়ে ভিজিয়েছে শ্যামা। পেট বড় বালাই।

ঘরে টিমটিম হ্যারিকেন জ্বলছে একখানা। তক্তপোশের কোণায় এখনও নিথর সনকা, ভজন আর হরি তার পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে। শ্যামা কী যেন খুটুর খাটুর করছে মেঝেয়। চপলাবালা দাওয়ায়, তিনমাথা এক করে বসে আছে নিঝুম।

ঢোলকলমির বেড়ার ধারে ছায়া। গাঢ় আঁধারে গাঢ়তর। এক মানুষের অবয়ব যেন!

দীনবন্ধু দাওয়াতেই ছিল। খোঁটায় হেলান দিয়ে। আচম্বিতে তার শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বহে গেল। অস্ফুটে ককিয়ে উঠল, —কে? কে ওখানে?

—আমি কাকা। গোবিন্দ।

দীনবন্ধুর বুক ঝাঁকিয়ে ঝলক দীর্ঘশ্বাস ঠিকরে এল, —ও, তুই? আয়।

গোবিন্দ ছাতা বন্ধ করে দাওয়ায় উঠল। হাঁটু-মুড়ে বসেছে, —সকালে ছিলাম না কাকা। বাগনানে খবর পেলাম। পেয়েই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ছুটে আসছি।

—বাগনানেও খবর চলে গেছে?

—সারা দেশ জেনে গেছে কাকা। গোবিন্দর গলা যেন সামান্য ধরে এল, —কী ভাবে কী হয়েছিল কিছু জানলে?

—কত কথাই তো বলে গেল মিলিটারির লোক। দীনবন্ধু টান টান হল,—

কী যেন একটা আগলাতে গিয়ে বুকে গুলি লেগেছিল। রমেশ মরদের বাচ্চার মতো লড়ে গেছে। ওরা খুব নাম করছিল রমেশের। বলছিল, এমন ছেলে নাকি কোটিতে একটা মেলে। অনেক সঙ্গীরও নাকি প্রাণ বাঁচিয়েছে রমেশ...

কথাগুলো যেন নিজে বলছে না দীনবন্ধু, কেউ যেন তাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে। জড়তাহীন স্বর। শোকহীন ভাষা। অন্ধকারেও জ্বলে উঠল চোখ দুটো। সে চোখ যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হাজার হাজার মাইল দূরে পাহাড়ের সারি। বিশাল উঁচু। অন্তহীন। সেই অচিন দেশের বরফ ভেঙে ভেঙে ছুটছে রমেশ, গুলি চালাচ্ছে ঢ্যা ঢ্যা ঢ্যা...

—আমার কিন্তু নিজেকে বড় অপরাধী লাগছে কাকা।

গোবিন্দর মলিন স্বরে দীনবন্ধুর আচ্ছন্ন ভাব ছিঁড়ে গেল। অবাক মুখে জিজ্ঞেস করল, —কেন রে?

—আমিই যে ওকে কলকাতার ঠিকানাটা দিয়েছিলাম। যেখানে গিয়ে ও ফৌজে নাম লেখাল।

সনকা এই কারণেই ভাল করে কথা বলে না গোবিন্দর সঙ্গে, দীনবন্ধু জানে। রমেশ যখন সত্যি সত্যি বাক্সপেটরা বেঁধে চলে গেল, কী রাগ তখন সনকার! ওই গোবিন্দই সর্বনাশ করল ছেলেটার! মিটমিটে ডান কোথাকার! নিজে তুই স্কুল ডিঙিয়ে কলেজে গেলি, বন্ধুটাকে একটু টানতে পারলি না! উল্টে কিনা কুমন্ত্রণা দিয়ে লড়াই করার চাকরিতে পাঠালি!

গোবিন্দর ওপর দীনবন্ধুও যে এতকাল প্রসন্ন ছিল তা নয়, তবে এই মুহূর্তে তার আর কোনও বিদ্বেষ জাগছে না। বরং যেন করুণাই আসে একটু একটু। রমেশের নাম এখন গোটা দুনিয়া জানে, বিদ্যাদিগ্‌গজ গোবিন্দর নাম জানে ক'জন?

আলগা ভাবে বলল, —তাতে কী হয়েছে? তুই তো আর বন্ধুর খারাপ ভেবে কিছু করিসনি!

—বটেই তো। ভাল হবে ভেবেই না...। বলো, মাসে মাসে রমেশের টাকা আসেনি বাড়িতে?

—হ্যাঁ, পাঠিয়েছে তো? যখন যেমন... ছশো সাতশো...

—এখনও পাবে। দু তিন লাখ তো এমনিই দেবে মিলিটারি। তারপর ধরো পেনশান আছে, আরও কী কী সব...। এখানকার গভর্নমেন্টও তো শুনছি দেবে কিছু। তারপর আরও কত জায়গায় চাঁদা উঠছে...

—এত দেবে? দীনবন্ধুর গলা দুলে গেল।

—কেন দেবে না? দেশের জন্য প্রাণ দিল রমেশ, তার কোনও প্রতিদান নেই? কত শত্রুসৈন্য খতম করল, কোনও পুরস্কার নেই? গোবিন্দর স্বরও উত্তেজনায় কাঁপছে, —সব হিসেব বুঝে নেবে কাকা। কিছু ছাড়বে না।

মনে মনে ঢোক গিলল দীনবন্ধু। কতদিন ধরে শ্যামপুর বাজারে তার একটা দোকান দেওয়ার সাধ, সাপুইদের কাঠগোলা থেকে বাছাই সেগুন কাঠ কিনে এনে বাহারী ইংলিশ খাট বানাবে, শ্যামার ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে, ভজন হরির জন্য মাস্টার রাখতে পারলে ভাল হয়, রমেশের মতো তা হলে আর স্কুল পেরোতে গিয়ে ঠেকবে না, চালাটাকে সারাতে হবে ভাল করে...

ক্ষণিকের ভাবনা ক্ষণিকেই ছিঁড়ে গেল। চপলাবালার স্বর বাজছে, —দীনু রে, ও দীনু, একটা কথা বলবি আমায়?

আবছায়ায় কুণ্ডুলি পাকানো জরতী দেহটাকে সঠিক ঠাহর করতে পারল না দীনবন্ধু। আন্দাজ মতো তাকাল, —কী কথা?

—আমাদের রমেশ যাদের মেরেছে, তাদের সব বয়স কেমন ছিল রে?

শ্যামা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বলল, —দাদার বয়সীই হবে। বুড়ো-হাবড়ারা কি আর যুদ্ধে যায়?

—ও। আলোআঁধার কাঁপল তিরতির, —তারাও তবে সব বাপ মার কোল খালি করে...! তাদের ঘরেও কি আমাদের মতো...?

দুম করে একটা ধাক্কা খেল দীনবন্ধু। যে দেশকে সে চেনে না, জানে না, সেখানে পাহাড় আছে, না জঙ্গল, মরুভূমি আছে, না তাদের মতো মধুপুর গ্রাম, কিছুই তার জ্ঞানবুদ্ধির আওতায় নেই, সেই দেশের কোনও এক কাল্পনিক দীনবন্ধু-সনকার কথা ভেবে বুকটা মুচড়ে ওঠে কেন? সে ছেলেগুলো এ দেশে শত্রু হতে পারে, ও দেশে তো তারা দেশপ্রেমিকই! নাকি নিছকই এক রমেশ? চাকরি করতে যুদ্ধে চলে যায়?

যে যাই বলুক, রমেশ যে কতখানি দেশের টানে যুদ্ধে গেছে, তা দীনবন্ধুর চেয়ে বেশি আর কেই বা জানে!

পরদিন কাজে গেল না দীনবন্ধু। কালও রাতে ঘুম হয়নি, ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রায় তালবেতাল স্বপ্ন দেখেছে শুধু, এখনও মাথা ঝিমঝিম। দাওয়ায় বসে থাকতে থাকতে ধুৎতেরি বলে উঠে পড়ল এক সময়ে। নন্দকে নিয়ে সোজা চলে গেল হোটুগঞ্জ। শশী চক্রবর্তীর বাড়ি।

শশী চক্রবর্তী গরিবের পুরুত, খাঁই কম। বাজারে ছোট তেলেভাজার দোকান আছে তার, বিকেলে খোলে, সকালে ক্রিয়াকর্ম পুজোঅর্চনা করে বেড়ায়।

শশী চক্রবর্তী বাড়িতেই ছিল। দীনবন্ধুর বাসনা শুনে মাথা চুলকোল, —হুম, শ্রাদ্ধশ্রান্তি একটা তো করতেই হয়। কবে যেন মৃত্যু ঘটেছে রমেশের?

—আজ্ঞে, গেল ইংরিজি মাসের সতেরোই।

—তাহলে তো ষোলো দিন হয়ে গেল রে! অপঘাতে মৃত্যুর তিন দিনে কাজের বিধান।

দীনবন্ধু নন্দ মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। নন্দ বলল, —রমেশ তো অপঘাতে মরেনি ঠাকুরমশাই? সে তো মরেছে বীরের মতো।

—ওই হল। বীর কি আর ঘরে হেঁপোকেশো রুগী হয়ে মরে? গুলি খেয়ে মরাও অপঘাতে মরা। শশী চক্রবর্তী বিজ্ঞের মতো মাথা দোলালো, —যাক গে যাক, ওই নিয়ে তুই মাথা ঘামাস না দীনু। প্রায়শ্চিত্ত একটা কর, শান্তিস্বস্ত্যয়নও করে দেব। তুই তো এখন ঘটা করেই করতে পারিস। তোর তো এখন খরচের ভাবনা নেই।

দীনবন্ধুর মনটা খচখচ করছিল। বিড়বিড় করে বলল,—না, থাক। মা ঠাকুমার সামনে কচি ছেলেটার কাজ...। নমো নমো করেই সারি।

—তোরই নাম বাড়ত রে। শশী চক্রবর্তী যেন উৎসাহ হারিয়েছে। উদাসগলায় বলল, —আসিস বিকেলের দিকে একবার, দিন ক্ষণ সব ঠিক করে দেব। ফর্দটাও তখন নিয়ে যাস।

বেজার মুখে বাড়ি ফিরছিল দীনবন্ধু। শশী চক্রবর্তীর অপঘাত শব্দটা বুকে লেগেছে। ঠাকুরমশাই ভুল বোঝাল কি না কে জানে! ঝাঁঝাঁ রোদে হাঁটছে পথে, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ঘন ঘন। ভারী অমায়িক স্বরে তারা কথা বলছে দীনবন্ধুর সঙ্গে। রমেশকে বাহবা দিচ্ছে, সেই সুবাদে দীনবন্ধুকেও।

বাড়ি পৌঁছতে একটা বাজল। শ্যামা রান্না চড়িয়েছে আজ, ভাত ফুটছে বগবগ। দীনবন্ধু চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল, —তোর মা কোথায়?

—ওই তো, ঘরে শুয়ে আছে।

দীনবন্ধু অস্বস্তি বোধ করল। সনকা একটুও সামলে উঠতে পারেনি এখনও। কাল রাতভর ছটফট করেছে বিছানায়, হঠাৎ হঠাৎ উঠে বসে গোঙাচ্ছিল। মেয়েছেলে তো, ঘটে বুদ্ধি নেই। বুঝল না, ছেলেটা কত মহান একটা কাজ করেছে। মধুপুরে এখন যে তাদের এত সম্মান, সে তো ওই রমেশের জন্যই। যাক গে, শুয়ে থাক। স্তোকবাক্য শুনিয়ে লাভ নেই, সময়ই মনকে শান্ত করবে।

ভাবতে ভাবতে গামছা কাঁধে পুকুরঘাটে যাচ্ছিল দীনবন্ধু, তখনই বাঁশঝাড়ের কাছে এক যান্ত্রিক গর্জন! মিলিটারির জিপখানা না?

সেই দুই জলপাই রঙ উর্দি! সঙ্গে সৌম্যকান্তি এক পুরুষ! তারও পরনে মিলিটারি পোশাক! বড় অফিসার টফিসার নাকি?

দুই জওয়ান সামনে এসে হুবহু পরশুর কায়দায় স্যালুট ঠুকল, —কর্নেল মুখার্জি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

দীনবন্ধুর আর কিসের শঙ্কা? তবু সামান্য কুঁকড়ে গেল। ঝুঁকে নমস্কার করল লোকটাকে।

কর্নেল মুখার্জি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধুর হাত চেপে ধরেছে, —আমরা অত্যন্ত দুঃখিত সাহুবাবু। আপনার কাছে একটা ভুল খবর পৌঁছেছিল। দোষ আমাদেরই। সংবাদ পাঠানোর আগে আমাদের আরও নিখুঁত ভাবে চেক করা উচিত ছিল।

দীনবন্ধু ভ্যাবলা মুখে ঘাড় নাড়ল, —বুঝলাম না স্যার।

—আপনার ছেলে রমেশ সাহু এখনও সুস্থ শরীরে জীবিত আছে। আশা করছি, শিগগিরই তাকে আপনার কাছে পাঠাতে পারব।

দীনবন্ধু মুখের হাঁ বন্ধ করতে ভুলে গেল।

—বাটালিক সেক্টরে সত্যিই একজন রমেশকে আমরা হারিয়েছি। ওই বিহার রেজিমেন্টেরই। ফিফথ্ ব্যাটেলিয়ানেরই সিপাই। কিন্তু সে রমেশ সাহু নয়, রমেশ সাউ। তার গ্রামের নাম মাধোপুর। ডিস্ট্রিক্ট গোরখ্পুর। ইউ পি। গ্রাম আর নাম দুটোই প্রায় এক হয়ে গিয়ে, প্লাস দুজনে একই সেক্টরে এক সঙ্গে লড়ছিল...। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আবার আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

মিলিটারির জিপ কাদা মাড়িয়ে চলে গেছে বহুক্ষণ। ভিড় জমছে আবার।

দীনবন্ধু অসাড়ে কাঁদছিল। পরশু থেকে এই প্রথম। গৌরব দেশপ্রেম অর্থপ্রাপ্তি সম্মান— সমস্ত ভারী ভারী পাথরের টুকরোগুলো সরে যাচ্ছে। বুক ক্রমে হাল্কা হয়ে এল।

...রমেশ রে, বাপ আমার...

দূরে, অনেক দূরে, আর একখানা মিলিটারি জিপ ছুটছে এখন ধুলো উড়িয়ে মাধোপুরের পথে।

সীমার মধ্যে

এক খণ্ড কাগজ টেবিলে মেলে ধরে লোকটা বলল—এই দেখুন, এই আমাদের প্ল্যান। প্রত্যেক ফ্লোরে তিনটে করে ফ্ল্যাটের প্রভিশন রাখা হয়েছে। দু'পাশে দুটো টু-রুম ডাইনিং, মাঝেরটা ছোট, ওয়ান-রুমড্।

ওরা দুজনেই ঝুঁকে পড়ে দেখছিল। সাদাটে কাগজের গায়ে অসংখ্য জ্যামিতিক টান। বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, রম্বস। মাত্র ইঞ্চি দশেক জায়গায় তিন তিনটে গৃহ কী অদ্ভুত গাণিতিক নিপুণতায় এঁকে দেওয়া হয়েছে!

মিহির জিজ্ঞাসা করল, সিঁড়ি কোনটা?

—এই তো। ক্রস্‌টানা অংশটাতে আঙুল বুলিয়ে তিন ইঞ্চি মাপের এক চৌখুপিতে হাত রাখল লোকটা, —এই ফ্ল্যাটটা আপনাদের জন্য চুজ করেছি। তিনতলার ওপর, খোলামেলা, পার্কও পাবেন এদিকটায়। মানে সাউথ পুরো ওপেন। এই এনট্রেন্স্, তারপর এটা ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেস, এই ধরুন গিয়ে নয় বাই উনিশ মতন। এই একটা বেডরুম, ইলেভেন বাই নাইন পয়েন্ট ফাইভ। অপোজিটে আরেকটা বেডরুম, দশ বাই দশ। বাথরুম সাড়ে চার বাই আট। আর এটা হল গিয়ে বউদির কিচেন। কিচেনটা প্রথমে এত বড় ছিল না, আমি নিজে আর্কিটেক্টের সঙ্গে বসে...। ছোট কিচেনে রান্না করতে বউদিদের বড্ড কষ্ট হয়।

লোকটা চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, গায়ের রঙ বেশ কালো, খাড়া নাক, চোখমুখে একধরনের গরিমা রঙিন বিজ্ঞাপনের মতো ঝলমল করছে। কথা বলার সময় মিহিরের থেকেও শ্রাবণীর দিকে তার দৃষ্টি বেশি। লোকটার দুপাশে দুটো প্রকাণ্ড সাইজের অ্যালসেশিয়ান জুলজুল চোখে বসে।

প্রথমটায় তো ঢুকেই শ্রাবণী রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বাপরে, কী শান্ত অথচ কী হিংস্র চেহারা!

লোকটা অমায়িক হেসে বলেছিল, ভয় নেই বউদি, ওরা দেখতে যত ভয়ঙ্কর ততটা কিন্তু হার্মফুল নয়।

শ্রাবণী অন্যমনস্কভাবে পিঠে আঁচল টেনে নিল। লোকটার বৈভবের তুলনায় অফিসঘরটা বেশ ছোট, খুপরি মতন। টেবিলের দুপাশে গোটা তিনেক চেয়ারেই জায়গাটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। একবার তো একটু পা নাড়াতে গিয়ে লোকটার পায়ে পা ঠেকে গিয়েছিল শ্রাবণীর।

মিহির আবার প্রশ্ন করল, মোট এরিয়া কতটা হবে মনে হয়?

—সার্ভিস এরিয়া নিয়ে ধরুন গিয়ে ছশো নব্বই স্কোয়ার ফুটের মত। আপনাদের জন্য একদম স্যুটেবল্।

—কবে নাগাদ কাজ শুরু করছেন?

—শীগগিরই। খুব শীগগির। মানে প্ল্যানটা স্যাংশন্ হয়ে গেলেই।

—তবু কত দিন লাগতে পারে বলে মনে হয়? বুঝতেই তো পারছেন আমাদেরও সেই মত টাকা পয়সা অ্যারেঞ্জমেন্ট... মিহির দেঁতো হাসি হাসল, —লোন-টোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তো।

—ও নিয়ে ভাববেন না। টাইমলি সব কাগজপত্র আপনাদের দিয়ে দেব। বলেন তো লোনের বন্দোবস্তও করে দিতে পারি।

—না, না। আমরা অফিস থেকেই লোন্ পেয়ে যাব। শ্রাবণী তাড়াতাড়ি বলে উঠল—আপনি আমাদের চারশো টাকা রেটেই দিচ্ছেন তো?

লোকটার মুখে এবার বিনীত হাসি— আমি যতটা পারি ততটাই কমে করার চেষ্টা করি বউদি। আফটার অল দিস ইজ আ সোশাল সার্ভিস। আপনাদের সামান্যতম উপকারেও যদি আসতে পারি...

—কবে নাগাদ বুক করতে হবে তাহলে?

—যেদিন আপনাদের খুশি। তবে বোঝেনই তো ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ। কোনটা নেবেন পছন্দ করে যদি আগে থেকেই বুক করে রাখেন তো নিশ্চিন্ত। যতটা ক্যাশ দিয়ে রাখতে পারবেন ততটাই আপনাদের সুবিধা।

মিহির আরেকবার জ্যামিতিক লাইনগুলোর দিকে তাকাল— নিলে আমরা পার্কের দিকটাই নেব। তুমি কী বলো?

শ্রাবণী কোনও উত্তর দিল না। তার ঠোঁটের ফাঁকে ভোরের আলোর মতন এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল মাত্র।

বাইরে বেরিয়ে মিহির জিজ্ঞাসা করল— স্পটটা একবার দেখে যাবে নাকি?

ভোরের হাসিতে উজ্জ্বল রোদের ছোঁয়া লাগল— চলো, দেখেই যাই।

রবিবারের সকাল ছুটির আলস্য মেখে গা এলিয়ে বসে আছে। মোড়ের মাথায় জটলা বেঁধে আড্ডা দিচ্ছে ছেলেরা, পথচারীদের গতি মন্থর। শ্রাবণী আর মিহির অবশ্য দ্রুত পা চালাচ্ছিল। বাড়িতে রান্নাবান্না সব পড়ে অছে, মিহিরেরও একগাদা কাজ বাকি। তাছাড়া ওরা ফিরলে তবে রুমি বেরোবে। মেয়ের আজ নাচের ক্লাস আছে।

লোকটার অফিস থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে সোজা কিছুটা হাঁটলে রিকশাস্ট্যান্ড। সেখান থেকে একটা সরু রাস্তা ভেতরে ঢুকে গেছে। রাস্তার একেবারে শেষপ্রান্তে এক ভাঙাচোরা প্রাচীন একতলা বাড়ি। কলিবিহীন বাড়িটার গায়ে সময়ের ঘন কালো শ্যাওলা। এক সময়ে পাশেই একটা বড় পুকুর ছিল, পুকুরটাকে বুজিয়ে কয়েকটা নতুন বাড়ি উঠেছে ইদানীং। প্রবীণ আর নবীনদের মাঝখানে একফালি জমিতে করপোরেশন থেকে বাচ্চাদের জন্য পার্ক তৈরি করা হয়েছে একটা। পার্কের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মিহির, পিছনে শ্রাবণী।

—ও, বাবা, এ যে একদম ভুতুড়ে বাড়ি গো!

—ভুতুড়েই তো। এক থুড়থুড়ে বিধবা বুড়ির বাড়ি। বুড়ি অবশ্য একা থাকে না, সঙ্গে এক ভাইঝিও আছে। মাঝবয়সী। আন্‌ম্যারেড।

—এ বাড়ি ভাঙা পড়লে ওরা কোথায় যাবে?

—যাবে মানে? ওরাও তো একটা ফ্ল্যাট পাচ্ছে। সঙ্গে বোধহয় কিছু ক্যাশও। মিহির আলগা হাসল, —আজকাল এরকম আকছার হচ্ছে। জমি বাড়ির বদলে একটা কি দুটো করে ফ্ল্যাট সঙ্গে কিছু টাকা। মহিলাদের তো সুবিধেই হবে। এরকম একটা ভাঙাচোরা বাড়ির বদলে নতুন ফ্ল্যাট...

—যাই বলো বাপু, নিজের ঘরবাড়ি, হোক না পুরনো, তার একটা আলাদা দাম আছে। শ্রাবণী ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, —আমি হলে বাবা কিছুতেই এ বাড়ি ভাঙতে দিতাম না।

—বাহ্, কেউ না দিলে আমাদের মত ভূমিহীনরা জায়গা পাবে কোথ্‌থেকে? তোমার শখের ফ্ল্যাটই বা কী করে তৈরি হবে?

কথাটা ঠিক, একজন না ছাড়লে অন্য জন পায় কোথ্‌থেকে। তবু শ্রাবণী কিছুতেই যেন ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছিল না।

—আচ্ছা, এ বাড়ি ভাঙার পর নতুন তৈরি হতেও তো কিছুদিন সময় লাগবে। ততদিন এরা থাকবে কোথায়?

—তার ব্যবস্থাও প্রেমোটারই করে। মিহির পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল— নিজে আগে কি করবে ঠিক করো তো। ফ্ল্যাটটার চেষ্টা করব, না করব না?

—চেষ্টা তো করতেই হবে। এভাবে আর পরের বাড়িতে কত দিন উদ্বাস্তুর মত ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যায়? যেখানেই একটু পুরনো হব, বাড়িঅলা বাঁকা চোখে তাকাতে শুরু করবে। ভাল লাগে না।

মিহির বড় করে ধোঁয়া ছাড়ল, তবে?

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে মনে মনে হিসাব কষছিল মিহির। ছ'শো নব্বই স্কোয়ার ফুট মানে প্রায় সাতশোই। সাতশো ইন্টু চারশো হলে দু লাখ আশি হাজার টাকা। এর ওপর রেজিস্ট্রেশন ফি আছে, টুকটাক নানা আনুষঙ্গিক। সব মিলিয়ে সওয়া তিন লাখ সাড়ে তিন লাখের কাছাকাছি। অফিস থেকে না নিয়ে এল আই সি থেকে লোন নিলে, তার আর শ্রাবণীর মিলিয়ে যা মাসিক আয়, তাতে দুলাখ টাকা মতন পাওয়া যাবে। তবে প্রতি মাসে যা শোধ দিতে হবে তাতে প্রায় শ্রাবণীর মাইনের পুরোটাই চলে যায়। মিহিরের মাইনেতেই পুরো সংসারটা টানতে হবে তখন। তখন বলতে সেও তো পনেরো বিশ বছর। নতুন করে আর কোন সঞ্চয় হবে না। রুমির বয়স এখন বারো। পনেরো বছর পরে মেয়ে সাতাশ হয়ে যাবে। তার আগে তারও তো একটা বিয়ের ব্যাপার আছে। শ্রাবণী বলেছিল, বাকি টাকা জোগাড় করতে, দরকার হলে, গয়নাগুলো বেচে দেবে। তার মানে মেয়ের বিয়ের জন্য নতুন করে গয়নাও...। মিহির ভেতরে ভেতরে বেশ অস্থির হয়ে উঠছিল।

ওপাশের খাটে শ্রাবণী পিছন ফিরে শুয়ে আছে। শ্রাবণীর পাশে জানলার দিকে রুমি। নাইটল্যাম্পের মৃদু আলোয় ওদের আবছা অবয়ব দেখতে পাচ্ছিল মিহির। কেমন যেন মায়াবী, কিন্তু ক্লান্ত।

মিহির নিচু স্বরে ডাকল, জেগে আছ?

শ্রাবণী পাশ ফিরেই উত্তর দিল—হুঁ। কেন?

—ভাবছি।

—কি?

—অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। আরেকটু ভাবলে হয় না?

শ্রাবণী এবারে এদিকে ফিরল। মুখোমুখি শুয়ে আছে দুজনে। মাঝে প্রায় হাত পাঁচেকের ব্যবধান। মেয়ে একটু বড় হওয়ার পরে খাটে আর ধরে না তিনজনের। আলমারি আর ড্রেসিংটেবিলের মাঝখানটায় ফোল্ডিং খাট পেতে নেয় মিহির।

বাড়ির সামনে পাকা ড্রেন তৈরি হয়ে যাওয়ার পর এ অঞ্চলে মশা অনেক কমে গেছে। রাত্রে আর মশারি টাঙানোর দরকার হয় না। মিহির তবুও স্পষ্টভাবে শ্রাবণীর মুখটা দেখতে পাচ্ছিল না।

শ্রাবণী সামান্য গলা ওঠাল,— এত ভাববার কী আছে? হাজার পঞ্চাশেক টাকা তো রয়েছে ব্যাংকে, তার থেকে তিরিশ চল্লিশ দিয়ে বুক করা যাবে না?

ব্যাংকে কত আছে মিহিরও জানে। শ্রাবণী প্রতি মাসে মাইনের প্রায় অর্ধেকটাই ফেলে দেয় ব্যাংকে। খরচের বিলাসিতা করে না কখনই। মিহিরের বউ-এর এখন শুধু একটাই স্বপ্ন, নিজের করে মাথা গোঁজার মত ঠাঁই চাই। চাই-ই। কিন্তু সাধ আর সাধ্যের মধ্যে ফারাকটা এত বেশি!

মিহির বলল, বুক হয়ত করে ফেলা যায়, তারপরে কি হবে ভেবেছ?

—কি হবে মানে?

—রুমি বড় হচ্ছে, ওর বিয়ে বলেও তো কিছু টাকা থাকা দরকার।

—সে দেখা যাবে।

—কি ভাবে? লোন নিলে কত টাকা করে মাসে কাটবে জানো?

—জানি।

—তাহলে?

—দ্যাখো, অত ভাবলে চলে না। মেয়ে কবে বড় হবে, কবে বিয়ে হবে, শ্রাবণীর গলা সামান্য নামল, ঘাড় ফিরিয়ে ঘুমন্ত মেয়েকে একবার দেখেও নিল আলতো করে—আমার তো মনে হয় মেয়ে বড় হচ্ছে বলেই আরও বেশি করে এসব ভাবা দরকার। ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদের কিছু নিজস্ব প্রাইভেসির প্রয়োজন হয়, আলাদা একটা ঘর, পড়াশুনোর জায়গা...

মিহির চুপ করে রইল। প্রাইভেসি কি শুধু রুমিরই দরকার? এই যে এখন দুজনের মাঝখানে পাঁচ হাতের একটা ফাঁকা জায়গা...এই যে এখন হাত বাড়ালেও শ্রাবণীকে ছুঁতে পারে না মিহির, কোন কোন দিন গভীর রাতে চোরের মত দুজনকে উঠে যেতে হয় পাশের ছোট ঘরে, হাজার সংকোচ আর সাবধানতায় শব্দহীন মিলন...! উপায়ই বা কি? এই দেড়খানা ঘরের ভাড়াই হাজার টাকা। ও ঘরটা সোফাসেট, সেন্টার টেবিল, দুটো ইনডোর প্ল্যান্টের টব আর একখানা টিভি টেপ রাখার ক্যাবিনেটেই জবরজঙ্। ডাইনিং স্পেসও এতটুকুন। চারজনের একটা খাবার টেবিল, ফ্রিজ আর ওয়াটার ফিল্টার রাখার পর নড়াচড়া করা রাস্তা প্রায় নেই। এই ফ্ল্যাটই মিহিররা ছেড়ে দিলে দেড়হাজারি হয়ে যাবে। যাবেই। বাসস্ট্যান্ডে সুপারমার্কেট তৈরি হওয়ার পর হু হু করে দর বেড়ে গেছে এ অঞ্চলের। এখান

থেকে যাতায়াতেরও সুবিধা কত বেশি, কতরকম বাস, মিনিবাস। টারমিনাস থেকে বসে ডালহৌসি পৌঁছতে মিহির শ্রাবণীর চল্লিশ মিনিটও লাগে না।

মিহির চিত হয়ে শুয়েছে, শ্রাবণী আবার বলল, এখানে এখন ফ্ল্যাটের কত দর যাচ্ছে জানো? এই তো বাজারের পাশে যেটা উঠছে, মিসেস রায়রা বুক করেছেন, পাঁচশো টাকা স্কোয়ার ফিট। সে জায়গায় তুমি চারশোতে পেয়ে যাচ্ছ, এটা ছাড়ার কথা ভাবা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—সেটাও তো ভাবছি। মিহির নিজের চুলে আঙুল চালালো। দশ আঙুল ডুবিয়ে আগা থেকে গোড়া অবধি ছুঁয়ে যাচ্ছে, লোকটা এত কমে দিচ্ছেই বা কী করে বলো তো?

—নিশ্চয়ই বুড়ি আর বুড়ির ভাইঝির কাছ থেকে ভাল দাঁও মেরেছে।

—সে-সবাই মারে। তার জন্য নয়। আমার ভয় হচ্ছে মেটিরিয়াল টেটিরিয়াল ঠিক দেবে তো? তারপর ধরো ভবানীপুর বা রিপন স্ট্রীটের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল...

—লোকটা অত চিটিংবাজ বলে মনে হয় না। প্রশান্তদা বলছিল লোকটা নাকি এক সময় পার্টি-ফার্টি করত, এখন ছেড়ে-ছুড়ে প্রোমোটার হয়েছে... ধান্দাবাজ হলেও বেসিকালি মধ্যবিত্ত মানসিকতারই তো মানুষ।

—হবেও বা। পাশ ফিরতে গিয়ে মিহিরের নেয়ারের খাট দুলে উঠল—বলছ, বুক করে দিই?

—দেওয়াই তো উচিত।

—তারপর?

—পরের ভাবনা পরে। অত ভাবলে কোনদিনই কিছু করা যায় না, বুঝলে। শ্রাবণী বিছানায় উঠে বসল। বাথরুমে যাবে। যাওয়ার সময় বহুদিন পর আলগোছে সামান্য আদর করল মিহিরকে।

মিহিরও হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, তার আগেই রুমি নড়েচড়ে উঠেছে বিছানায়। মিহির চোখ বুজে ফেলল।

অফিস থেকে ফিরে মিহির দেখল রুমি বিছানায় বসে পড়াশুনো করছে, শ্রাবণীও তার পাশে কাগজ ডটপেন নিয়ে বসে। শ্রাবণী সাধারণত মিহিরের আগেই ফিরে আসে অফিস থেকে। মিহিরের ফিরতে ফিরতে সাড়ে সাতটা আটটা। অফিসের পর একটু তাস-টাস খেলে তবে সে বাড়ি ফেরে।

খাটের কোণে বসে শার্টের বোতাম আলগা করল মিহির,—তুমি আবার কি পড়াশুনো করছ?

শ্রাবণীর আগে রুমি উত্তর দিল—মার এখন পড়াশুনো কি জানো না? ফ্ল্যাট বুকড্ হওয়ার পর থেকে রোজ সন্ধেবেলা বসে ফ্ল্যাটের নকশা আঁকে। কোন ঘরে কি রাখবে, ড্রয়িং রুম কেমন সাজানো হবে। রুমি কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিল মিহিরের দিকে—দ্যাখো। কতভাবে ফ্ল্যাটটাকে সাজানোর প্ল্যান হয়েছে।

শ্রাবণী লাজুক হাসল,—বারে, যেখানে বাকি জীবনটা থাকতে হবে সেখানটা ঠিকভাবে গুছিয়ে নিতে হবে না?

ফুলস্কেপ কাগজ জুড়ে নকশা আর নকশা। নানা ভাবে, নানা আকারে ফ্ল্যাটের ছবি এঁকেছে শ্রাবণী। কোথাও শুধুই আলাদাভাবে বেডরুম, এগারো বাই নয় পয়েন্ট পাঁচ। কিম্বা দশ বাই দশ। ড্রয়িং কাম ডাইনিং স্পেস নিজের মত করে ভাগ করে দাগ টানা। দরজা জানালার জন্য জায়গা ছাড় দিয়ে কোন দেওয়ালে কি রাখবে, কোথায় খাট, কোথায় রুমির পড়ার টেবিল সব কালির আঁচড়ে সাজানো।

মিহির হেসে ফেলল,—ড্রয়িংরুমের জন্য এতটা জায়গা দিলে ডাইনিং স্পেসটা বড় ছোট হয়ে যাবে না?

—কি আর করা যাবে? শ্রাবণী মোটেই হাসল না—সদর দরজার জন্য তিনফুট বাদ দিলে ড্রয়িংরুমের চওড়াটা হয় মাত্র ছয়। টানা দশফুট লম্বা যদি রাখি, মানে বেডরুমের দরজার আগে পর্যন্ত তাহলে মোট জায়গা দশ বাই ছয়। এইটুকু জায়গায় তুমি কোথায় কি রাখবে বলো? তাও তো ডাইনিং স্পেসটা নয় বাই নয় রেখেছি।

—কিভাবে? দুপাশে বেডরুমে ঢোকার দরজা থাকবে না? সে জায়গাটা তো তোমাকে হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে। তারপর ধরো ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাও বাদ।

—তাতে কি? এর মধ্যেই ধরে যাবে।

—ধরবে না। তোমার ডাইনিং টেবিলের সাইজ কি হবে?

রুমি বলে উঠল—ওই ছোট টেবিলটা এবার কিন্তু বাতিল করতে হবে বাবা। মা বলছিল পার্ক স্ট্রীটের কোন্ দোকানে ডিমশেপের টেবিল দেখে এসেছে, গোল হয়ে বসলে ছ'জন অ্যাট ইজ্ বসা যায়।

—ও বাবা, টেবিলও দেখা হয়ে গেছে?

—কেন হবে না? শ্রাবণী হাঁটু মুড়ে গুছিয়ে বসল,—আমার নতুন সোফাও দেখা হয়ে গেছে। আমাদের পুরনোটা ওইটুকু জায়গায় ধরবে না। সুপার মার্কেটে

আমি আর রুমি ছোট ছোট বেতের চেয়ার দেখে এসেছি, কুশন দিয়ে সাজিয়ে রাখলে দারুণ মানাবে।

মিহির প্রশ্ন না করে পারল না, এই খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিলগুলো থাকছে তো? নাকি এরাও বাদ?

—এগুলো ভাগাভাগি করে আমাদের আর রুমির ঘরে রাখলে ভালই জায়গা হবে। শ্রাবণী নিজের আঁকার দিকে ঝুঁকলো, —এই দ্যাখো না, আমি মোটামুটি সব সেট করেছি। রুমির ঘরে আপাতত ক্যাম্পখাটটা দিয়ে দেব, ড্রেসিং টেবিলটাও। বড় আলমারি আমাদের ঘরে বাঁ দিকের দেওয়ালে, ছোট আলমারি রুমির, রুমির পছন্দমত জায়গায়।

রুমি বলল, আমি কিন্তু পার্কের দিকের ঘরটা নেব।

মিহির হাত ওঠাল,—আরে, দুটো ঘর থেকেই পার্ক দেখা যাবে, ডাইনিং স্পেস থেকেও। ফ্ল্যাটটা এমনিতে মন্দ হবে না, শুধু ঘরগুলোই যা ছোট ছোট।

—হোক গে, তাও তো নিজের বাড়ি। যত ছোটই হোক। শ্রাবণী গম্ভীর—তুমি অফিস যাওয়ার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

—তখন দেখা হয় নি। এই তো ফেরার পথে ঘুরে এলাম।

—কি বলল?

—প্রোমোটাররা যা বলে। প্ল্যান স্যাংশন্ হলেই বাড়ি ভাঙতে শুরু করে দেবে, তারপর ভিতপুজো তারপরই...তার আগেই কাগজপত্র দিয়ে দেবে বলেছে।

—পুজোর আগে হবে?

—না হওয়ার তো কারণ নেই। বলতে বলতে আচমকা সচেতন হল মিহির, —কেন? বাড়িঅলা আবার কিছু বলেছে নাকি?

—রোজই তো বলছে। ছোট ছেলের অঘ্রানে বিয়ে দেবে, ঘর দরকার।

মিহির রেগে উঠল,—কেন? আমাদের এই দেড়খানা ঘর ছাড়া ছেলের কি ফুলশয্যা হবে না? ওপরে অতগুলো ঘর রয়েছে...

—বজ্জাতি, বজ্জাতি। শ্রাবণীও ঝংকার তুলল,—আসলে আমাদের তুলে দেওয়ার ধান্ধা। ছেলে থাকবে না ছাই। আমরা উঠে গেলেই দেড়গুণ বেশি ভাড়া, আরও মোটা অ্যাডভান্স... যত তাড়াতাড়ি এখন চলে যাওয়া যায় বাঁচি। বাড়িঅলা লোকগুলো নিজেদের যে কী ভাবে!

—তুমি বলে দিয়েছ তো আমাদের ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে?

—বলিনি আবার। মুখের ওপর বলে দিয়েছি।

শ্রাবণী খাট থেকে নামল। রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। দরজার কাছে গিয়েও

ঘুরে দাঁড়াল,—শোন, প্রোমোটার ভদ্রলোককে বলে দিও মোটামুটি ঘরগুলো তৈরি হয়ে গেলেই আমরা কিন্তু চলে যাব।

চলে যাব। চলে যাব। চলে যাব বলা যত সহজ, যাওয়াটা তার থেকে অনেক বেশি কঠিন। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই। এই সামান্য কথাটুকু বুঝতে মিহির শ্রাবণীর অনেকটাই সময় লেগে গেল।

প্রথম প্রথম যখনই সময় পেত কাগজ কলম নিয়ে বসে যেত শ্রাবণী। জায়গা বড় কম, তবু তার মধ্যেই নিজেদের সাজিয়ে নিতে হবে। নিজস্ব ভূমিতে। নিজের মতো করে।

মিহির সময় পেলেই ভাঙাচোরা বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াত। প্রোমোটারের প্ল্যান পাস হওয়ার ঠিক মুখে মুখে হাইকোর্টে ইনজাংশন পড়েছিল। করপোরেশন বনাম গৃহব্যবসায়ীদের মামলা। প্রোমোটার লোকটা বলেছিল, চিন্তার কিছু নেই। মামলার রায় শীগগিরই বেরিয়ে যাবে। বেরোলেই বুনিয়াদ শুরু হয়ে যাবে। মিহির তবুও নেশাচ্ছন্নের মত গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভৌতিক বাড়িটার সামনে। চার দিকের নতুন রঙচঙে বাড়িগুলোর মাঝখানে ওই বাড়িটা কী ভীষণ বেমানান, তবু কী অহঙ্কারী! মিহিরকে দেখলেই বাড়িটা দাঁত বের করে যে ব্যঙ্গ করে ওঠে, ভাঙবি আমায়? দখল নিবি?

মিহির প্রবীণার মুখের ওপর সিগারেট ধরায়—নেবই তো। মামলায় জিতে গেলেই নেব। রায় বেরোলেই নেব।

রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলে মিহির শ্রাবণী প্রথমে আইন আদালতের পাতা দেখে। রুমিও। রোজ কত মামলার রায় বেরোয়। ধর্ষণের। খুনের। ডাকাতির। বাড়ির মামলার রায় কোথাও নেই। পৃথিবীর কোন্ এক কোণে, দেড়খানা ঘরে, কোন্ শ্রাবণী মিহিরের ফ্ল্যাটের প্ল্যান আটকে গেছে তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই দুনিয়ায়।

অবশেষে রায় বেরোল। মিহির শ্রাবণী নয়, রুমিরই প্রথম চোখে পড়েছিল খবরটা। ঘুম ঘুম চোখে সোফায় বসে কাগজ দেখতে দেখতে লাফিয়ে উঠল রুমি—বাবা, ফয়সালা হয়ে গেছে। নতুন করে প্রোমোটারদের সব প্ল্যান জমা দিতে হবে। এবার নিয়ম সব অন্যরকম।

শ্রাবণীর চোখের সামনে একরাশ ফুলস্কেপ কাগজ ভেসে উঠল। কাগজ জুড়ে হাজার হাজার জ্যামিতিক টান।

—নতুন করে প্ল্যান তৈরী হবে মানে? আগের মত আর থাকবে না?

—না থাক্। কোনও না কোনও ভাবে তো হবেই।

মিহির ততক্ষণাৎ ছুটল গাঁট্টাগোট্টা চেহারার সেই সুখী মুখ লোকটার কাছে।

—আপনাদের কাজ এবার তাহলে শুরু হয়ে যাবে তো?

লোকটার মুখে মৃদু হাসি,—নিশ্চয়ই হবে। এতদিন ধরে আমার ব্যবসাও কি কম মার খেল? আপনাদের ফ্ল্যাটেরই তো শুধু নয়, আর দু-তিনটে জায়গায় কাজ আটকে আছে।

মিহির আশ্বস্ত বোধ করল,—বাড়িঅলা মশাই লাইফ হেল করে দিচ্ছে, বুঝলেন। ভাড়াবাড়িতে মানুষকে এমন মাথা নিচু করে থাকতে হয়।

—বাড়িঅলারাই বা কি করবে বলুন! লোকটার স্বরে হঠাৎই বিশ্বজ্ঞানী ভাব,—দিনকাল যা পড়েছে। সব কিছুরই দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে। এই দেখুন না, একটা বছরে ইট লোহার দাম কোথার থেকে কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। আমিও কি আর আপনাদের আগের দামে ফ্ল্যাট দিতে পারব?

—মানে?.

—মানে কিছু এস্‌ক্যালেশন তো করতেই হবে মশাই। সাড়ে পাঁচশ'র নীচে আর দিতে পারব বলে মনে হয় না। লোকটা সিগারেট দিল মিহিরের দিকে,—তবে আপনাদের কথা আলাদা। এত দিন ধরে আপনারা আমাকে অ্যাডভান্স দিয়ে রেখেছেন, তাছাড়া বউদিকেও আমি কথা দিয়েছিলাম, শুধু বউদির জন্যই আপনাদের রেট পাঁচশো।

পাঁচশো! মানে পাঁচ সাতে পঁয়ত্রিশ। সাড়ে তিন লাখ টাকা! মিহির দ্রুত হিসাব কষে নিচ্ছিল। অ্যাডভান্স দেওয়া আছে চল্লিশ, কুড়িয়ে বাড়িয়ে আর না হয় হাজার পঁচিশেক টাকা জোগাড় করা গেল। হল পঁয়ষট্টি। এল আই সি থেকে দু লাখ। শ্রাবণীর দশভরি সোনা থেকে তিন হাজার টাকা করে হলেও পাওয়া যাবে তিরিশ হাজার। দুলাখ পঁচানব্বুই। বাকিটা? বাকিটা? মিহিরের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,

—পারব না মশাই।

—কেন পারবেন না? যা শর্ট পড়বে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। ইন্টারেস্ট বেশি নেব না। কুড়ি করে নিয়ে থাকি, আপনার আর বউদির জন্য তারও কনসেশনাল রেট। সিক্সটিন পারসেন্ট্।

মিহিরের ইচ্ছে করছিল সজোরে লোকটার হাসি হাসি মুখে একটা ঘুসি চালায়। পারল না। লোকটা পার্টি করত। এ অঞ্চলে এখনও তার অগাধ প্রতিপত্তি। দুপাশে দুটো মারাত্মক কুকুর নিয়ে বসে থাকে লোকটা।

মিহিরের সাধ্য কোথায় রাগটাও দেখানোর!

রাগে ফেটে পড়ল শ্রাবণী,—বদমাইশি। এ স্রেফ লোকটার বদমাইশি। এত দিন ধরে আমাদের টাকাটা তাহলে আটকে রাখল কেন?

কড়া রোদে হেঁটে এসে মিহিরের খুব ক্লান্ত লাগছিল। সোফায় গা ছড়িয়ে দিয়ে বলল—ও কথা বলে লাভ নেই। আমরাও তো তুলে নিইনি টাকাটা। আমরাও তো লোভে লোভে...

—এরকম করবে তা কি জানতাম?

—জানলেই বা কি করতে পারতে? এখনই বা কি করতে পারো? ঝগড়া? মারামারি? সে ক্ষমতা আমাদের আছে?

শ্রাবণী থমকাল। নিষ্ফল আক্রোশে দুটো চোয়াল তার টিপ টিপ কাঁপছে। কথা বলতে পারল অনেক্ষণ পর।

—আমরা এখন তবে কি করব?

—আর একটা বাড়ি দেখে উঠে যাব। সেখান থেকে দিন ফুরোলে আবার একটা বাড়ি। আবার আরেকটা। জীবন আর কদিনের, এভাবেই ঘুরে ঘুরে কেটে যাক্ না।

মিহিরের দার্শনিকতাকে একটুও আমল দিল না শ্রাবণী,—কাল থেকেই তাহলে বাড়ি দ্যাখো। বলতে বলতে একটু যেন উদাস হয়েছে,—এবার দুটো বেডরুম চাই। এই অঞ্চলেই।

—ভাড়া কত পড়বে জানো?

—কত? আড়াই হাজার? তিন হাজার? আজ থেকে আর একটা পয়সাও জমাব না। আমরা মাইনের সবটাই ভাড়া দিয়ে দেব।

লোডশেডিং চলছে। বাস থেকে নেমে মিহির প্রথমটা অন্যমনস্কভাবে পুরনো রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। সম্বিৎ ফিরতে ঘুরে আবার বড় রাস্তায় উঠল। কালই তারা বাড়ি বদলেছে।

আগেকার বাড়ির থেকে, এবারকার বাড়িটা একটু পিছন দিকে। বাস থেকে নেমে একটু বেশি হাঁটতে হয়। হোক। কদিন পরেই অভ্যাস হয়ে যাবে।

ছায়া ছায়া নাগরিক অন্ধকার পেরিয়ে মিহির পৌঁছে গেল নতুন ঠিকানায়। শ্রাবণী আজ অফিস যায়নি, মা আর মেয়ে মিলে দুজনে সারাদিন গোছাবে বাড়িটাকে। বাড়িটা ভালই পাওয়া গেছে। ঢুকতেই একটা বেশ বড় সড় সাইজের হলঘর।

ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং স্পেস্। তার বাঁদিকে দুটো বিশাল সাইজের শোবার ঘর। একটা চোদ্দ বাই চোদ্দ, একটা চোদ্দ দশ। উল্টোদিকে আধুনিক কায়দার বিশাল রান্নাঘর, বাথরুম, একটা ছোট স্টোররুমও আছে। সব থেকে বড় কথা চব্বিশ ঘন্টা জল। বাড়িঅলা চেয়েছিল তিন, শ্রাবণী বলে কয়ে আড়াই হাজারে রাজি করিয়েছে। অ্যাডভান্সটাই কমানো যায়নি। ওটা পুরো চল্লিশ হাজার।

মিহির দেখল শ্রাবণী আর রুমি জানালা দরজাগুলোতে পর্দাও টাঙিয়ে ফেলেছে। পুরোনা বাড়ির গেরুয়াবরণ পর্দা নতুন বাড়ির জানালায় নিথর।

মিহির ঘরে ঢুকে বলল,—সব দেখছি গুছিয়ে ফেলেছ?

শ্রাবণী হাতে একটা মিনি সাইজের লণ্ঠন ধরে আছে। হাবভাব বেশ খুশি খুশি,—তোমার মত অকর্মণ্যের জন্য কাজ ফেলে রেখে আরেকটা দিন ছুটি নষ্ট করি আর কি।

মৃদু হাসল মিহির,—রুমি কোথায়?

—এই তো বিকেলের দিকে পুরনো পাড়ার দিকে একটু গেল। কোন্ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবে।

মিহির জামাকাপড় বদলে বাথরুমে ঢুকল। বেসিনে জল আছে, শাওয়ারেও। ও বাড়িতে বড় জলের কষ্ট ছিল। তিনবেলা মেপে তিনবার জল দিত বাড়িঅলা। প্রাণভরে স্নান করবে ভেবেও কে জানে কেন শুধু মুখে চোখে জল দিয়ে বেরিয়ে এল মিহির।

শ্রাবণী ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চা ঢালছে। মিহির চেয়ার টেনে বসল,—আজকে ফেরার সময় বাসে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা হল।

—কে অবিনাশবাবু?

—ওই যে, আমাদের যেখানে ফ্ল্যাট হওয়ার কথা ছিল, তার কাছাকাছিই থাকেন।

—ও।

—ভদ্রলোক বলছিলেন, আপনারা টাকাটা তুলে নিয়ে ভালই করেছেন। ও বাড়ি নাকি এখন ভাঙা যাবে না। বুড়ি আর বুড়ির ভাইঝি আগের এগ্রিমেন্ট মানছে না। আরও বেশি টাকা চায়।

শ্রাবণীর মুখটা ঝকমক করে উঠল, তাই?

মিহির হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ টানল।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর শ্রাবণী কথা বলল,—জানো আজ জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে এতগুলো কাগজ বেরোল।

—কী কাগজ?

—হাবিজাবি। ওই সব যা আমি আঁকতাম আর কি।

—তোমার প্ল্যান?

—দুর, এ বাড়িটা ওটার থেকে অনেক ভাল হয়েছে। কত বড় বড় ঘর, কত বেশি জায়গা। ওই ফ্ল্যাটে আমাদের ধরতই না।

লণ্ঠনের আলোতেও মিহির স্পষ্ট দেখতে পেল শ্রাবণীর দু চোখ চিকচিক করছে। কেন করছে? মিহির ঠিক বুঝতে পারল'না। মানুষের চোখ কখন চিকচিক করে? আশায়? না হতাশায়? দুঃখে? না সুখে?

মিহিরের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল,—আমাদের কি আদৌ কোথাওই ধরে শ্রাবণী? ধরাতে চাইলেও?

কিছুই বলতে পারল না। টিমটিম আলোর পিছনে, নতুন রঙকরা দেওয়ালের গায়ে, দুটো হাল্‌কা ছায়া প্রকট হচ্ছিল তখন। স্থির। স্পন্দনহীন।

আজ সুবর্ণজয়ন্তী

কাকভোরে ভেতর দালানে পা রাখতেই টেবিলখানা আজ ঠক করে চোখে লাগল সুহাসিনীর। ম্যাগো ম্যা কী দশা! অমন ফুটফুটে শ্বেতপাথরের টেবিল একেবারে কালচিটে মেরে গেছে গো! কেউ একটু গতর নাড়িয়ে মোছে না!

ঘুম জড়ানো পায়ে টেবিলের কাছে গেলেন সুহাসিনী। হাত রাখলেন পাথরে। স্নেহে, মমতায়। কত কাল পর এ টেবিল এত ফাঁকা দেখছেন। সারাক্ষণই তো কারুর না কারুর দখলে। সুহাসিনী যখন শুতে গেলেন তখনও, যখন বিছানা ছাড়লেন তখনও। এই দেখো বড় তরফের ঝন্টু বউ-ছেলে নিয়ে মুড়িছোলা খাচ্ছে, অমনি ছোট তরফের নীপু সপরিবারে টোস্ট ওমলেট হাতে বসে গেল। দীপুরা যদি কর্তাগিন্নীতে একপাশে মাংসভাত খেতে বসে, তো অন্য পাশে ভাতের গর্তে ট্যালটেলে মুসুর ডাল ঢালে রন্টু। তারা না উঠতেই মন্টুরা ডিমের ঝোল ভাত। মোদ্দা কথা, শূন্য নেই কখনই। যেমনটি আছে এখন। খাওয়া না থাকলেই বা কী! কখনও রন্টুর বউ গোটা টেবিল ছড়িয়ে রেশনের গমের কাঁকর বাছছে, কখনও আটা ঠেসছে নীপুর বউ। ঝন্টুর কাজের মেয়েটা মাজা বাসনের ডাঁই উপুড় করে দিল, দেখাদেখি দীপুর কাজের মেয়ে ছড়িয়ে দিল ধোওয়া কাপ-ডিশ। জল ঝরাচ্ছে। বেশি বয়সে ছেলে হয়েছে বলে মন্টুর বউয়ের আবার আদিখ্যেতা খুব, যখন তখন ছেলেকে নাড়ুগোপাল সাজিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে টেবিলে। মুতবি তো বাবা ওখানেই মোত, নামিস না লক্ষ্মীসোনা! তা সে নাড়ুগোপাল জল ছেড়েছে কি ছাড়েনি, অমনি ধুন্ধুমার। দীপুর বউ ঝামটে এল, ঝন্টুর বউ ডানা ছড়াল, রন্টুর বউ ফণা তুলল, নীপুর বউ গলা। কথায় কথায় টেবিল চাপড়ে কীর্তন জুড়ছে পাঁচ বউ, দোহারকি দিচ্ছে বরেরা। আহা, কী দৃশ্য!

ভাবতেই বিবমিষা। আলো অন্ধকারে ভুতুড়ে রকমের একা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকাণ্ড টেবিল ছেড়ে বিরক্ত মুখে বারোয়ারি বৈঠকখানা পার হলেন সুহাসিনী। এসে দাঁড়িয়েছেন বড় দালানে। সামনে এক সকাল ফুটছে। পরশু শ্রাবণ সংক্রান্তি, আকাশে এখনও ভারী মেঘ, আলো বড় কম। রাতের দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল, এখনও চারদিক ভেজা ভেজা, প্রশস্ত উঠোনের ছোট বড় ফাটলে জল জমে আছে। গেটের ধারে দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা পামগাছ সিক্ত শরীরে পথ চেয়ে আছে সূর্যের। তা তিনি বোধহয় আজ আর বেরোবেন না, মেঘবন্দি হয়েই থাকবেন সারা দিন। পাখিরা আড়মোড়া ভাঙছে, গলা সাধছে, এবার তাদের নীড় ছাড়ার পালা।

এত ভোরে সুহাসিনী ওঠেন না আজকাল, উঠতে পারেন না। ক্ষমতায় কুলোয় না। রাতভর জেগে জেগে শেষ প্রহরেই চোখ দুটো জড়িয়ে আসে যে। প্রথম রাতেও তন্দ্রা আসে অল্প অল্প, কিন্তু তখন চোখের পাতা এক করে কার বাপের সাধ্যি! বড় তরফের ঝন্টু, মন্টু, রন্টু আর ছোট তরফের দীপু, নীপু, পাঁচ শরিকের ঘরে লাগাতার তাণ্ডব চলছে। ও ঘরে গাঁক গাঁক টিভি, তো ও ঘরে ঝাং ঝাং টেপ। একতলায় কোনও স্বামী স্ত্রীতে বাধল, দোতলায় ছেলেপিলের। ওপরে রন্টুর ঘরে মিয়াবিবির কোন্দল তো বাঁধা রুটিন। ঝন্টুর দুই ছেলে গোটা সন্ধে টো টো করে পড়তে বসবে রাত দশটার পর। পড়া তো নয় যেন দুই ভাই পাল্লা দিয়ে ডাকাত তাড়াচ্ছে। নীপুর বড় মেয়েটা গান শিখছে, তারও রাত না বাড়লে গলায় সুর আসে না। দীপু আবার আর-এক কাঠি বাড়া, সবাই নিবলে তিনি জ্বলে ওঠেন। বোতল কুমারের মোচ্ছবই শুরু হয় মাঝরাতে। হুইস্কি লাও, সোডা লাও, চিৎকার কী! ভি সি আর না ফি সি আর কি যন্ত্র কিনেছে, তাই চালিয়ে বাঁজা বউয়ের সঙ্গে বসে ন্যাংটো মেয়ের লীলা দেখে। আর সে কথা সুহাসিনীকে শুনতে হয় কি না নীপুর মেয়ের কাছে! কী লজ্জা কী লজ্জা! মন্টুটাই যা একটু পদের। শান্তশিষ্ট, বাড়ির সাতে পাঁচে থাকে না, গলা নামিয়ে কথা বলে, কিন্তু তার আবার অন্য ব্যায়রাম। দেশোদ্ধার! রাতদুপুর অবধি পার্টির ছেলেরা ঘরে ঢুকছে, বেরোচ্ছে, জুতোর মশমশ, চটির ফ্যাটফ্যাট, সাইকেলের কিরিরিং কিরিরিং। এত কিছুর ফাঁক গলে নিদ্রাদেবী আসবেন কোন্ পথে!

অগত্যা সুহাসিনীর একটাই কাজ। প্রহর গোনা। এবং প্রহর গোনা। এবং প্রহর গোনা। দূরের শালিমার ইয়ার্ডে মালগাড়ি শান্টিংয়ের গুম গুম শব্দ বাজে হঠাৎ হঠাৎ, কুকুরের পাল এ বাড়ির মানুষদের থেকেও বিশ্রী গলায় ঝগড়া করে রাস্তায়, রাত কাঁপিয়ে দুপদাপ ছুটে যায় লরি, মাথার ওপর দীপুর ঘর থেকে ছিটকে আসে

অশ্লীল শব্দের ফুলকি...যমযন্ত্রণা! এর পর যে সাতটার আগে সুহাসিনীর চোখ খুলবে না, এ আর বিচিত্র কী!

তা শেষ রাতের ওই মলিন ঘুমটুকুও পুরো হল না আজ। আকাশ ফর্সা হওয়ার আগে থেকেই ড্রাম বাজছে। প্রকৃতিতে নয়, পাড়ায়। সঙ্গে পোঁপ্‌পো পোঁপ্‌পো পোঁ বিউগল্‌ ধ্বনি, গটমট জুতোর আওয়াজ। মিত্তিরবাড়ির কাবুল হেঁকে চলেছে, লেফ্‌ট রাইট, লেফট্‌ রাইট, লেফট্‌ রাইট...

সুহাসিনী চোখ কচলালেন। যৎসামান্য ঘুমটুকুই যা সুখ, তাও ঠিকমতো না হলে মাথা কেমন টলমল করে আজকাল। পঁয়ষট্টিতেও সুগার প্রেশার কোনও উপসর্গই নেই তাঁর, তবু করে। বয়সটা যেন হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ে চেপে বসছে। কদিন আগেও দৃষ্টি বেশ পরিষ্কার ছিল, ষাট সত্তর গজ দূরে ওই নারকেল গাছটায় টিয়াপাখির ঝাঁক উড়ে এলে স্পষ্ট দেখতে পেতেন, এখন গেটের মাথায় কি নাচছে, শালিখ না কাক, তাও যেন ঠিকমতো ঠাহর হয় না। ছানি পড়বে? একটা ইন্দ্রিয় বুঝি গেল তবে।

মন্টুদের ঠিকে ঝি এসে গেছে ভোর ভোর। ঝাঁট দিচ্ছে। মন্টুদের ঘরের ধুলোময়লা ঠেলে এনে নীপুর দোরগোড়ায় জড়ো করে দিল। হায় রে মা, নীপুর বউ এখনই বেরোলে কুরুক্ষেত্র বেধে যাবে। সুহাসিনী তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলেন।

—গুড মর্নিং পিসিঠাম্মা।

রন্টুর ছেলে দোতলা থেকে চটাপট নেমে আসছে, ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন সুহাসিনী। ঝকঝকে দাঁত মেলে। নাতির কায়দায় বাও করলেন নাতিকে, মর্নিং। এত ভোরে সেজেগুজে চললি কোথায় রে?

—বারে, আজ স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর না: প্রভাতফেরি আছে।

—ও। ইস্কুলে?

—উঁহু, ক্লাবে। শুনতে পাচ্ছ না, কখন থেকে কাবুলদা হুইসিল দিচ্ছে!

—তাই বল্‌। আমি ভাবছি সকাল থেকে কিসের আবার রাজযজ্ঞি শুরু হল!

টুকাইয়ের পরনে সাদা হাফপ্যান্ট, ধবধবে সাদা শার্ট, গলায় ফাঁসের মতো তেরঙা টাই। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠোনের জলকাদা পার হচ্ছে টুকাই, সাবধানে, অতি সাবধানে।

একতলায় নীপুদের দরজা খুলে গেল। নিজেদের দু'কামরার মহল থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসেছে নীপুর ছোট মেয়ে। টুকাইয়েরই সমবয়সী, সবে ক্লাস থ্রি। উত্তেজিত মুখে চিল্লিয়ে উঠল মিস্টুলি,—এই, তুই স্কুলে যাবি না?

—আগে কাবুলদার ফাংশন শেষ হোক। টুকাইয়েরও সোচ্চার উত্তর।

—তার মানে স্কুলে যাচ্ছিস না?

—যাচ্ছি না তো যাচ্ছি না। তোর কী রে?

—আজ কিন্তু স্কুলে রোল কল হবে। আন্টি বলে দিয়েছে।

টুকাই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গেল—আমি কাল গার্জেনের চিঠি নিয়ে যাব। মা লিখে দেবে বলেছে।

—আন্টি যদি ধরে ফেলে?

—ধুস্। তুইও তো মাসির বিয়েতে গিয়েছিলি, রাঙাজেঠি জ্বর হয়েছে লিখে দিল, আন্টি ধরতে পেরেছে? বলতে বলতে টুকাই ফিরছে পায়ে পায়ে। কাছে এসে গলা নামাল, তুইও স্কুলে যাস্ না। কাবুলদা আজ হেব্‌বি প্যাকেট দিচ্ছে।

মিস্টুলি দু'পা এগোল, কী দেবে রে?

—অনেক কিছু। প্যাটিস্, ফিশচপ, পেস্‌ট্রি, কোল্ডড্রিঙ্কস...

—এত?

—বারে, গোল্ডেন জুবিলি না! সুহাসিনীর দিকে আড়ে তাকিয়ে নিল টুকাই, কাবুলদা বেশি হাঁটাবেও না। ব্যাতাইতলার মোড় পর্যন্ত, ব্যাস্। আর স্কুল গোটা শিবপুর রাউন্ড দেওয়াবে, হাতে ধরাবে টিফিনকেক আর লাড্ডু। কোনটা ভাল?

মিস্টুলি দোনামোনায় পড়ে গেছে। মজা লাগল সুহাসিনীর, হাসছেন মিটিমিটি। নাতি-নাতনিরাই যা এখন মনের আরাম।

দুম করে নীচের ঘরের জানালা খুলে গেল। নীপুর বউ হাঁক পাড়ছে, মিস্টুলি, ঘরে চলে এসো। হাঘুরেপনা করতে হবে না।

সিঁড়ির মুখ থেকে তক্ষুনি ঝঙ্কার উড়ে এল, কি হচ্ছে কি টুকাই? কতদিন না বারণ করেছি গায়ে পড়ে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না!

—আমি বলি নি মা। মিস্টুলি আমায় ডাকল।

—জানি তো। নিজেরা লোভে লক লক, অপরকে বলে হাঘুরে!

—তোর ছেলেকে কিছু বলিনি মণিকা, নিজের মেয়েকে বলেছি। কুঠুরি থেকেই কথা ছুড়ছে নীপুর বউ, তোর গায়ে লাগল কেন?

—কথা ঘুরিও না রাঙাদি। কে কোন্ মনে কী বলে সব বুঝতে পারি।

—সে তো বুঝবিই। তুই হলি গিয়ে বটতলার উকিলের বেটি...

শুরু হল। দত্তবাড়ি জেগে গেছে। এবার বাপবাপান্ত শাপশাপান্ত চাপান-উতোর চলল।

সভয়ে সরে এলেন সুহাসিনী। ভেতর দালানে। সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে

এই তো লাভ। দিনভর গা ম্যাজম্যাজ করবে এখন, পুজোআর্চায় মন বসবে না, সুচিন্তা মাথায় আসবে না, একটা পেঁকো গন্ধ সারাক্ষণ ম ম করবে নাকে। টেবিলে চোখ পড়াটাই যত নষ্টের মূল। যার ঝিরকুটেপনা দেখে চোখ করকর করে, তার পানে চোখ যায় কেন!

চোখেরও বলিহারি, সেই ফিরে ফিরে টেবিলটাকেই দেখে! পায়াগুলোও গেছে! রঙ নেই, পালিশ নেই, ছ'খানা পায়ারই কী করুণ হাল! মাঝের একটা পায়া কেতরে আছে না? কাছে গিয়ে পরখ করলেন সুহাসিনী। যা ভেবেছেন তাই, জোড় খুলে লতলত করছে, কোনও ক্রমে মেঝে আর পাথর ছুঁয়ে আছে পায়া। আলগা চাপ দিলেন সুহাসিনী, ঠেললে যদি স্বস্থানে ফেরে।

মন্টু দাঁত ব্রাশ করতে করতে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে,—উবু হয়ে কী দ্যাখো গো পিসি?

—পায়াটা তো গেছে রে। একটু গজাল পেরেক এনে ঠুকে দিতে পারিস না? একটা মিস্ত্রিও তো ডেকে আনতে পারিস।

—ও টেবিলের কি আর কিছু আছে পিসি! এক পায়া সারালে আর-এক পায়া যাবে।

—সব কটা সারাবি। একসঙ্গে সারাবি।

—তা হলে তো একদিন এস্টিমেটে বসতে হয়। তোমার অন্য ভাইপোদেরও বলে দ্যাখো, সবাই যা বলবে তাই হবে।

দায় এড়ানো কথা। জানে পাঁচ শরিক কখনও একত্র হবে না। দুই শরিকেই বা কী করেছিল, সুহাসিনীর দুই দাদা! প্রাসাদের মতো বাড়ি খসে ভেঙে পড়ছে, বড়দা দেখায় ছোড়দাকে আঙুল, ছোড়দা দেখায় বড়দাকে। যে যার মতো কলি ফেরায় নিজের অন্দরের, বহিরঙ্গে কী রূপ দেখেও দেখে না। তাদেরই তো ছেলেপিলে সব, পৃথক আর কি হবে! হিংসেয় জ্বলে মরে, বিধাতার পরিহাসটুকু বোঝে না। অত বিবাদ, হেঁশেল ভিন্ন, কথা বন্ধ, তবু যেই না ছোট ভাই চিতেয় উঠল, অমনি পিছু নিল বড় ভাই। তিনটে মাস কাটতে না কাটতে। বছর না ঘুরতে বড় গিন্নিও হাঁটা দিয়েছে পরপারে। আর পোড় খেয়ে, মার খেয়ে, ছোট গিন্নির ঠাঁই শেষে মেয়েদের দোরে। এখানে এসে তার তো এখন তুইথুলি মুইথুলি দশা। দীপু বলে, নীচে নীপুর ঘর বড়, ওখানে থাকো। নীপু বলে, ওপরে আলো হাওয়া বেশি, সেখানে যাও। বেচারা ছোট বউ, ননদকে যে একটি দিনের তরে সইতে পারল না, এখন এ বাড়ি এলে তাঁর ঘরই তার আশ্রয়। ভাগ্যে একখানা কামরা সুহাসিনীকে লেখাপড়া করে দিয়ে গিয়েছিলেন বাবা, বালবিধবা মেয়ের

নামে টাকা রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে, তাই না এমন ভাইপোদের অন্নদাস হতে হল না কখনও!

টেবিলটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন সুহাসিনী। হৃদয় নিংড়ে একটা লম্বা শ্বাস গড়িয়ে এল। নিজের জন্য নয়, ছোট বউদির জন্য নয়, বেচারা টেবিলখানার জন্য। কী ছিলি রে তুই, কী হয়েছিস!

এই বুঝি তবে জগতের নিয়ম! এজমালি হয়ে গেলে সাত রাজার ধন এক মানিকও ফেলনা হয়ে যায়। হায় রে।

সাত রাজার ধনই বটে। এমন টেবিল এ অঞ্চলের আর কেউ আর দ্বিতীয়টি দেখেনি আগে। শুধু তারা কেন, তাদের পরিচিত কেউ দেখেছে বলেও শোনা যায় না। যেমন আকার, তেমনই বাহার। প্রকাণ্ড দালানে পড়ে থাকে বলে এর বিশালত্ব মালুম হয় না, আড়ে দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে একখানা ছোটখাটো ঘরের সমান। ছ' ছ'খানা কারুকাজ করা দামি কাঠের ঠ্যাং, ঝকঝকে সাদা পাথরের গা ঘেঁষে লতাপাতার অপরূপ নক্‌শা, ঠিক চৌকোও নয়, গোলও নয়, ডিম-শেপও নয়, টেবিলখানার এ এক আশ্চর্য আকৃতি।

এ টেবিলের সঠিক ঠিকুজিকুষ্ঠিও কারুর জানা নেই। তবে এই শ্বেতপাথরের টেবিলখানা ঘিরে একদা অনেক গল্পকথা চালু ছিল চারদিকে। গোটা তল্লাটে দত্তবাড়ির মার্বেল টেবিল এখনও এক জীবন্ত কিংবদন্তি। কেউ বলে এর বয়স একশো, কেউ বলে তিনশো, আবার কেউ-বা বলে পাঁচশো। কোনও পরিস্থিতিতেই অনুমানটা সত্তর আশির নীচে নামে না, তাতে নাকি এই টেবিলের মর্যাদাহানি হয়। চূড়ান্ত নব্যপন্থীদের মতে কলকাতার শেষ বড়লাট যখন এখান থেকে দিল্লিতে রাজ্যপাট উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনই নাকি অর্ডার দিয়ে বানিয়েছিলেন টেবিলখানা। শেষমেশ ডিজাইনটা গিন্নির পছন্দ না হওয়ায় পেল্লাই ভারী গন্ধমাদন তিনি আর সঙ্গে নিয়ে যাননি, বেচে দিয়ে যান এক পার্শি ব্যবসায়ীকে। সেই পার্শি বণিক, পেস্টনজি না সোরাবজি কী যেন নাম, তিনিও বছর দুয়েকের বেশি ব্যবহার করেননি টেবিল। ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে দেশের পশ্চিম মুলুকে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি, তখনই ঢুকিয়ে দিয়ে যান এক নিলামঘরে, সেখান থেকেই দত্তবাড়িতে পা রেখেছে এ টেবিল।

এ গল্পের শেষটুকুনি নিয়ে কোনও দ্বিমতই নেই, কিন্তু প্রথমটা প্রায় কেউই বিশ্বাস করে না। পাড়ার রোয়াকে, বৃদ্ধদের আড্ডায়, এর ওর বৈঠকখানায় কদিন আগেও সব থেকে চালু গল্পটা ছিল আর-একটু অন্য রকম। টেবিলটা সাহেব,

পার্শি, নিলামঘর হয়েই দত্তবাড়িতে ঢুকেছিল বটে, তবে ও টেবিল নাকি সাবেবদেরও নয়। দিল্লির বাদশা ফারুখশিয়ার নাকি একবার এক জবরদস্ত অসুখে পড়েছিলেন, যাই যাই দশা। এক সাহেব ডাক্তার, ইংরেজই হবে, সে নাকি প্রায় ভেলকি দেখিয়ে যমের দরজা থেকে বাদশাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেই সূত্রেই প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন সাহেব, ওই টেবিলও তার মধ্যে একটি। তারপর ডাক্তারের বংশধরদের হাত ঘুরে ঘুরে কলকাতার নীলামঘরই হয় তার অস্থায়ী আস্তানা।

এই উপাখ্যানটিই অধিকাংশ লোকের মনপসন্দ্। হয়তো নবাব বাদশার গন্ধ আছে বলেই। তবে ফারুখশিয়ারই ওই লা-জবাব মেজখানির প্রথম মালিক কিনা তাই নিয়েও বিস্তর মতবিরোধ আছে। কেউ বলে ফারুখশিয়ারের পূর্বপুরুষ রাজপুতদের কাছ থেকে ভেট পেয়েছিল ওটা। আবার কেউ বা বলে কোন এক ভীল রাজার জঙ্গলমহল থেকে এই মহার্ঘ বস্তুটিকে লুঠে এনেছিল রাজপুতরা। সেই অরণ্যচারী কোত্থেকে এটি পেয়েছিল, নিজে বানিয়েছিল কি না, এমন এক শৌখিন টেবিলে তার কি প্রয়োজন ছিল, তা নিয়ে অবশ্য আর তর্কাতর্কি জমত না বিশেষ, তার আগেই লোকজনের হাই উঠত।

এসব কাহিনী উপকাহিনী সুহাসিনীরও অজানা নয়, বরং আরও বেশিই জানেন। বাইরে প্রচারিত সব গল্পেরই মূল উৎস তো এই দত্তবাড়িই, তারাই না এসব কাহিনী ফেঁদে টেবিলটাকে ঘিরে এক রহস্যের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। এদের মধ্যে সেরা গপ্পোবাজ ছিলেন সুহাসিনীর বাবা। মাত্র দু'বছর শ্বশুরঘর করে সতেরো বছরে বাপের বাড়ি ফিরে আসা বিধবা মেয়ের মন ভোলাতে হঠাৎ হঠাৎ আজব গপ্পো ফাঁদতেন তিনি। একবার বলেছিলেন এ টেবিল নাকি হস্তিনাপুরের রাজসভায় ছিল, এর ওপরেই নাকি পাশা খেলেছিলেন শকুনি আর যুধিষ্ঠির!

ওই আষাঢ়ে কাহিনীও কি পল্লবিত হয়েছিল তল্লাটে? সুহাসিনীর জানা নেই। তবে এও ঠিক, বাবার মুখে গল্প শুনে শুনে একসময়ে তাঁর সত্যি ধারণা জন্মেছিল এই টেবিল বুঝি অজর অমর অক্ষয়।

আজ, এই শেষ বয়সে এসে, সুহাসিনীর মনে বড় ধন্দ জাগে। অজর অমরই যদি হবে, কাঠের পায়া তবে খসে খসে পড়ে কেন? পাথরের নয় লয়ক্ষয় নেই, অনন্তকাল টিকলেও টিকতে পারে, কিন্তু কাঠ? হাতফেরতা হওয়ার কালে পায়া কাঠামো কি বদল হয়েছে বারবার? হতেই পারে। সুহাসিনীর বিয়ের বছরেই তো মেরামত হল একবার, নয় কি? সেবারেই না...।

বাপ রে, সে কী রই রই কাণ্ড! সেও ছিল এক শ্রাবণ মাস, অঘ্রানে সুহাসিনীর বিয়ে, স্থির হল পুজোর আগে সারাই হবে টেবিল। ঠাকুর্দা সাহেব কোম্পানিতে

এত্তেলা পাঠালেন, হ্যাট কোট পরা সাহেব মিস্ত্রি নিয়ে হাজির। দশ-বারো জন মজুর হেঁইয়ো মারি জওয়ানদারি করে বৈঠকখানা থেকে দালানে বার করছে টেবিল, চাগাড় দিয়ে তুলল কষ্টেসৃষ্টে, শেষে দরজা পেরোতে গিয়েই বিপত্তি। দুই মজুর চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল, সামাল দিতে না পেরে বাকিরা ফেলেই দিল টেবিলখানা। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে দু' কোণ ভেঙে টুকরো। ঠাকুর্দার কী আফসোস, সাহেবদের খবর না দিয়ে নিজেরই নাকি মিস্ত্রি লাগানো উচিত ছিল!

সেই থেকেই ও টেবিল পড়ে আছে ভেতর দালানেই। খুঁতো হয়ে। তার গল্প ইতিহাস নিয়েও আর তেমন মাথা ঘামায় না এ-বাড়ির কেউ, ভাঙা টুকরো দুটোর জন্য হাহুতাশ তো কবেই উবে গেছে। দেড়েমুসে ভোগ করছে সবাই, এই না সুখ।

কী অত্যাচার! কী অবহেলা! কী অনাদর!

তারস্বরে মাইক বাজছে। ভোরের কুচকাওয়াজের পর থেকেই। কখনও হিন্দি, কখনও বাংলা, কখনও দেশাত্মবোধক, কখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত। দেশপ্রেমের বান ডেকেছে চারদিকে।

সুহাসিনী সকালের পুজোয় বসেছেন। পুজো মানে তেমন কিছু উপচার সাজিয়ে বসা নয়, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে দু' বেলা দু' দণ্ড নিরালা হওয়া। আজ আসন পাততে একটু দেরিই হয়ে গেল। স্নানে যাবেন, মন্টুর বউ বলল আজ নাকি শুভদিন। কিসের শুভদিন শ্রীহরিই জানেন, ঘরে ঘরে তো কলহের কামাই নেই! নীপু, রন্টু সেই থেকে গজরাচ্ছিল, সবে থামল। খানিক আগে কী মুখখারাপটাই না করল দীপু, কানে আঙুল দিতে হয়। তারে মেলা পাঞ্জাবিতে তার কে না কে ব্লেড মেরে রেখেছে! ঝন্টুর বড় ব্যাটার কারসাজি হলেও হতে পারে, গোঁফ গজাতে না গজাতেই যা ত্যাঁদোড় হয়ে উঠেছে ছোকরা। তার পরও মন্টুর বউয়ের মুখে শুভদিন কথাটা শুনে সুহাসিনীর বুক যে কেন কুনকুনিয়ে ওঠে! স্নানে না গিয়ে ঘর গোছাতে বসলেন সাতসকালে। কী বা আছে ঘরে, একটা ছোট পালঙ্ক, আয়না বসানো ঢাউস কাঠের আলমারি, ছোট একটা সিন্দুক, দুটো মিটসেফ, আর একখানা সাবেকি আলনা। তাই ঝাড়তেই ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা পার। আর-একটু আগে হত, যদি না রাজ্যের লোকের আমোদ দেখতে সতেরোবার ছুটতেন বাইরে।

হ্যাঁ, আমোদ একটা হচ্ছে বটে। দিনটা তো প্রতিবারই আসে, প্রতিবারই যায়, সুহাসিনী তেমনভাবে টের পান কই! এবার যেন জাঁকজমক চোখে আঙুল দিয়ে

খোঁচাচ্ছে। লরির পর লরি চলেছে টিকির টিকির, লরির পিঠে দুলে দুলে গান গাইছে ছেলেমেয়েরা। ব্যান্ড পার্টিই গেল কত. সাতটা আটটা দশটা...গুনে গুনে শেষ হয় না।

গুমগুম কিল পড়ছে দরজায়, ধ্যানে বিঘ্ন ঘটল সুহাসিনীর। হাঁক পাড়লেন, কে রে?

—আমি। শামু।

হঠাৎ ঝন্টুর ছোট পুত্তুর কেন! সুহাসিনী গলা খাঁকারি দিলেন, কি চাই?

—দরজা খোল না। এক্সাইটিং নিউজ।

সেভেনে উঠল ছোঁড়া, খুব ইংরিজি ফটর ফটর করে। ধীরে সুস্থে দরজা খুললেন সুহাসিনী, কি নিউজ শুনি?

শামুর পরনে এখনও স্কুলড্রেস। হাঁপাচ্ছে, তুমি রান্না বসাওনি তো পিসিঠাম্মা?

—আ মোলো যা, এখনও বলে আমি দাঁতে কুটোটি কাটিনি! সুহাসিনী চোখ ঘোরালেন, কেন?

—রান্না বসিও না। আজ তোমার নেমন্তন্ন।

—কোন্ চুলোয়?

—আজ একটাই চুলো জ্বলবে।

কথাটা সুহাসিনীর বোধগম্য হল না, ফ্যাল ফ্যাল তাকাচ্ছেন।

শামু কায়দা করে ঘাড় ঝাঁকাল, আজ সবাই মিলে ফিস্ট হবে। বাবা, বড়কাকা, মেজকাকা সব একসঙ্গে বসে ডিসিশান নিয়েছে। মা তোমায় বলতে বলল। তোমার জন্য আজ স্পেশাল ভেজিটেরিয়ান ডিশ।

সুহাসিনী দপ করে চটে গেলেন, বচ্ছরকার দিনে আমায় নিয়ে মজা হচ্ছে?

—মজা নয় পিসিঠাম্মা, ফ্যাক্ট। বড়কাকা তো একটু আগে খুব চেঁচাচ্ছিল, বাবা গিয়ে প্রোপোজালটা দিতেই গলে জল। ছোটকাকা, রাঙাকাকা সব্বাই জয়েন করছে।

—আর তোর কাকিমারা?

—মিলে গেছে। শামু চোখ টিপল, হাতে হাত ধরে সব রান্না করবে আজ। লম্বা লাইন করে।

সুহাসিনীর তবু বিশ্বাস হয় না। শামুটা অম্লানবদনে ফক্কুড়ি মেরে যেতে পারে। এক্ষুনি হয়তো কোনও বউকে জিজ্ঞেস করতে গেলে ছ্যারছ্যার চারটি কথা শুনতে হবে সুহাসিনীকে।

তখনই মন্টুর মহলের দিকে চোখ গেল। ধোপদুরস্ত পাজামা পাঞ্জাবি পরে

ছেলে কোলে বেরিয়েছে মন্টু। গলা ওঠালেন সুহাসিনী, অ মন্টু, এদিকে শোন্। শামু যা বলছে তা কি সত্যি?

মন্টু হাসিমুখে এগিয়ে এল, কী ব্যাপারে বলো তো?

—আজ নাকি তোরা সবাই এ বাড়িতে ফিস্ট করছিস?

—সবাই বলছে কেন, তুমিও আছ। চাঁদা তুলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া আর কি। ভাবছিলাম, আজকের দিনটা অভিনব উপায়ে সেলিব্রেট করব...দাদা প্রস্তাবটা দিল...

সুহাসিনী প্রায় গলে গেলেন, আমায় কত দিতে হবে?

মন্টু হো হো হেসে উঠল, তোমার কিছু লাগবে না। তুমি আজ গোল্ডেন জুবিলির চিফ গেস্ট।

—কেন, দিই না কিছু?

—উঁহু, সবাই মিলে আমরা ডিসাইড করেছি। দাদা, মেজদা, রন্টু, নীপু...

—তোরা সব্বাই একত্র হয়েছিলি! আহ্লাদে চোখ পিটপিট করছেন সুহাসিনী, টেবিলের কথাখানা তুলেছিলি বাপ?

মন্টুর বুঝতে বুঝি কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপরই হেসে উঠেছে আবার। আরও উচ্চৈঃস্বরে, তুমি কী গো পিসি। আজকের দিনে কেউ অমন সেন্সেটিভ কথা তোলে!

—একবার বললে পারতিস।

—বলবখন। সময়মতো। তাল বুঝে। বলতে বলতে ঘড়ি দেখছে মন্টু, দামুটা এখনও ফিরছে না কেন? আমাকে আবার বেরোতে হবে...

—কোথায় গেছে দামু?

—বাজি কিনতে। আমিই পাঠালাম। গোল্ডেন জুবিলিতে বাড়িতে ফ্ল্যাগ তোলা হবে, একটু পটকা ফাটবে না তা কি হয়! এটা সেরেই আমাকে একবার হাওড়া ময়দান ছুটত হবে। বক্তৃতা আছে। সেখান থেকে একবার বাক্সাড়া ঘুরে...চার পাঁচটা আইটেম রান্না হবে, দেড়টা দুটোর আগে ফিরলেই হল, কি বল পিসি?...এই শামু, তোর দাদাকে দ্যাখ না, কোথায় গেঁজে গেল!

শামু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। পায়ে পায়ে উঠোনে নামল মন্টু। দোমহলা বাড়ির দিকে ফিরে চেঁচাচ্ছে, দাদা, মেজদা, রন্টু, নীপু, কী হল রে তোদের? তাড়াতাড়ি নাম।...মেয়েরা, এসো।

সবার আগে একতলা থেকে বেরিয়ে এল নীপু, নীপুর বউ। সঙ্গে বুলবুলি, সে আজ সালোয়ার-কামিজ ছেড়ে শাড়ি পরেছে। দোতলা থেকে বাজারের থলি

হাতে নেমে আসছে দীপু আর মন্টু, রন্টুর বউ তাদের পিছন পিছন। রন্টু আর দীপুর বউ হাসতে হাসতে সিঁড়ি ভাঙছে, বাকি দুই বউ বেরিয়ে এল মন্টুর ঘর থেকে।

সুহাসিনীর চোখে পলক পড়ছিল না। পিলপিল করে হাস্যমুখে জড়ো হচ্ছে পাঁচ শরিক, এও কি সম্ভব। গেটে একটা ইয়া বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তার ডগায় পতপত নেচে উঠল তেরঙা ঝাণ্ডা। পটকা ফাটছে, শাঁখ বাজছে, উলু দিচ্ছে বউরা...। সুহাসিনী ভোরের দুঃখ ভুলে গেলেন।

পতাকার এত গুণ! নাকি জুবিলির!

নাহ্, সত্যিই আজ শুভদিন।

জব্বর মেনু হয়েছে আজ। বাসমতি চালের ভাত, সোনামুগের ডাল, দিশি ভেটকির ফ্রাই, ইলিশের ভাপা, মুরগির কারি, আমসত্ত্বর চাটনি। শেষ পাতে দইও আছে। ছেলেপিলেদের খাওয়া সারা, কর্তারা এবার বসল। শ্বেতপাথরের টেবিলে। পাঁচ বউ পরিবেশন করছে ঘুরে ঘুরে। সুহাসিনী প্রধান অতিথি হলেও হাত গুটিয়ে বসে নেই, মোড়ায় বসে তদারকি করছেন খাওয়াদাওয়ার।

বেলা বাড়ার পর মেঘ সরে গেছে অনেকটা। সূর্যের হাসিখুশি মুখ দেখা যায় মাঝে মাঝে। রোদ কম, ঝাঁঝও কম। বাষ্পবোঝাই বাতাস বইছে থেকে থেকে, ঘাম জমছে অল্প অল্প, তাপ কম বলে ঘামটুকু মন্দ লাগে না। উঁচু সিলিং-এ ঘুরন্ত পাখার হাওয়ায় আরাম হচ্ছে বেশ।

ফিশফ্রাই-এ কামড় দিয়ে নীপু বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে বসে গেলে পারতে পিসি।

—মরণ! সুহাসিনী মুখ টিপে হাসলেন, আমাকে কোনও দিন তোদের ওই টেবিলে বসতে দেখেছিস?

—আজ বসতে। সারা জীবনে তো মাটিতে বসেই খেয়ে গেলে।

—আমার মাটিই ভাল। আমি ওসব ছোঁয়াছুঁয়ি ম্লেচ্ছপনার মধ্যে নেই। বাপ-দাদার আমলেই টেবিলে বসলুম না...

ঝন্টু বলল, পিসির খাবার তোমরা আলাদা করে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ দাদা। দীপুর বউ উত্তর দিল,—পিসির রান্না আলাদা গ্যাসে হয়েছে। আমিষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

রন্টু মিটিমিটি হাসছে, পিসি আজ কি কি সাঁটাচ্ছে?

নীপুর বউ মুখে আঁচল চাপা দিল, ছানার ডালনা, আলু কাঁচকলার কোপ্তা, নারকেলের পুর দিয়ে পটলের দোল্মা,...

—ও গ্র্যান্ড! করেছ কি পিসি? তোমারই তো আজ কপাল গো।

সুহাসিনীর অন্তরটা তর হয়ে যাচ্ছিল। খাওয়ার লোভে নয়, তার প্রতি সকলেরই এই নজরটুকু দেখে। হোক না ক্ষণিক, তবু এ তো সত্যি বটে। মুহূর্তের জন্য মনে হল এই সুখী সময়ে টেবিলটার কথা তোলেন একবার। তার আগেই ঝন্টু বলল, পিসি, লাস্ট তুমি কবে এমন মেনু খেয়েছ গো?

দীপু অস্ফুটে বলল, তুই খাওয়ার আগে।

ঝন্টু ভুরু কুঁচকে তাকাল, কি বললি?

দীপু খ্যাক খ্যাক হাসল, বলছি, তুই যবে লাস্ট এত ভাল মেন্যু খেয়েছিস, তার আগে।

—তুই কিন্তু আমায় টন্ট্ করলি দীপু।

নীপু ফস করে ফুট কেটে উঠল, ওমা, তুমি টন্টও বোঝ?

রন্টু বলল, অমন ভাবে কথা বলছিস কেন রে? আমরা কি ভুখ্খার পার্টি, খেতে পাই না? নাকি কনট্রিবিউশান কম দিয়েছি?

দীপু বলল, কনট্রিবিউশান দেখাস্ না রন্টু। তোরা তিনজন, দাদার ফ্যামিলি চারজন, তোদেরও যা কনট্রিবিউশান, আমাদের দুজনেরও তাই।

রান্নাঘরের দরজা থেকে মন্টুর বউ নাক গলাল, তার জন্যই তো আপনার পাতে বড় পেটিটা পড়েছে মেজদা। মেজদি কি ওটা এমনি এমনি আলাদা করে সরিয়ে রেখেছিল?

নীপু মন্টুকে বলল, কী ভাষা রে বউয়ের! লঘুগুরু জ্ঞান মুছে গেল!

মন্টু কড়া গলায় বলল, নিজের দাদাকে জিজ্ঞেস কর, একশো টাকা চাঁদা দিয়ে সে কিছু আমাদের কিনে নেয়নি।

—না, তোমরাই কিনেছ। ঝামটে উঠল দীপুর বউ, তাকিয়ে তাকিয়ে কার পাতে কী পড়ল তাই দেখা হচ্ছে! জন্মে কোনও দিন চল্লিশ টাকা কিলোর চাল খেয়েছ! আমাদের কল্যাণে তো জুটল। এখন হাত শুঁকে শুঁকে বছর চালাও।

ঝন্টুর বউ খেঁকিয়ে উঠল, চোপ। এমন চাল আমার ঘরের ঝি-চাকরে খায়।

—হ্যাঁ। নীপুর বউ ভেংচে উঠেছে, আমরা তো চাঁদে থাকি, কার উনুনে কি বসে দেখতে পাই না। মেঝে থেকে মুড়ি কুড়িয়ে টিফিন বাক্সে ভরে কে?

সুহাসিনী প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। সংবিৎ ফিরতে চিৎকার করে উঠলেন, অ্যাই, কি হচ্ছে কি? থামো থামো, এমন একটা দিন কেউ ঝগড়া করে নষ্ট করে!

ঝন্টু গর্জে উঠল, দিন মারিও না পিসি। ওই মন্টুটার জন্য আজ হারামীদের সঙ্গে এক পাতে বসতে হল।

নীপু হুল ফোটাল, তোমার যেন নোলা কম হ্যাহ্!

—তবে রে শালা। থালা ঠেলে উঠে পড়েছে ঝন্টু। ছুটে গিয়ে ঘেঁটি চেপে ধরেছে নীপুর। দীপু দাঁড়িয়ে উঠে এল লাথিতে চেয়ার ফেলে দিল, দৌড়ে এসে হেঁচকা টান দিল ঝন্টুকে, পলকে পাঞ্জাবি ছিঁড়ে ফালা ফালা।

তিন মিনিটে দালান রণক্ষেত্র হয়ে গেল।

ফাঁকা হয়ে গেছে টেবিল। শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে থাকা লোকজনও। যার যার থালা বাটি গ্লাস নেমে গেছে কলতলায়, পাঁচ অংশে ভাগ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সাদা টেবিল জুড়ে এখন শুধু আধখাওয়া মাংসের টুকরো, মাছের কাঁটা, চাটনির মণ্ড, ডেলা ডেলা ঝাল ঝোল মাখা ভাত। লাল পিঁপড়ে উঠছে সার বেঁধে, প্রায় ছেয়ে ফেলেছে টেবিলটা। আঁশ আঁশ দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে দালানের বাতাস।

বাথরুম থেকে বালতি টেনে আনলেন সুহাসিনী, জল ভরা। খালি পেটে মোচড় দিচ্ছে, ন্যাতা ভিজিয়ে মুছতে শুরু করলেন টেবিলটাকে। প্রাণপণে নাকে কাপড় চেপে রেখেছেন, তবু গুলিয়ে ওঠে গা। তার মধ্যেই নজরে পড়ছে টেবিলময় চুলের মতো সরু সরু দাগ। অসংখ্য। পাথরও কি ফাটতে শুরু করল!

দামু বুলবুলি উঁকি দিচ্ছে বারোয়ারি বৈঠকখানা থেকে। কৌতূহল চাপতে না পেরে দালানে বেরিয়ে এল টুকাই মিস্টুলি শামু। যে পিসিঠাম্মা জন্মে কোনও দিন এঁটো টেবিলে হাত ছোঁয়ায় না, সে কিনা পাথরে ন্যাতা বোলাচ্ছে! এ যে বড় আজব দৃশ্য!

দরদর ঘামছেন সুহাসিনী। একা হাতে আর পারছেন না। অতিকায় টেবিল ক্রমশ বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠছে।

ক্লান্ত স্বরে সুহাসিনী ডাকলেন, দেখিস কি বাছারা? আয়। তোরা অন্তত হাত লাগা।

অনুভব

ডালের হাতা বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলেন প্রতিমা। এখনও নির্মাল্যর শুক্তোপর্ব চলছে। পাতে লেগে থাকা ঝোলটুকু কাঁচিয়ে নিচ্ছেন নির্মাল্য, এক মনে আঙুল চাটছেন।

এক মনে, না আনমনে? এইবার বেয়াইমশাইয়ের ধরনধারণ অন্যরকম, লক্ষ করছেন প্রতিমা। বড় শান্ত চুপচাপ ধরনের হয়ে গেছেন নির্মাল্য। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় প্রাক্তন ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার যেন এখন অতীতের মলিন ছায়া। আগের মতো গমগম হাসি নেই, হঠাৎ হঠাৎ রসিকতা নেই, তিনবার ডাকলে একবার সাড়া পাওয়া যায়, পাঁচ দশ মিনিট আগের কথা বেমালুম ভুলে যান, সাধারণ প্রশ্ন করলে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকেন। বুড়ো বয়সে বউ মরে গেলে পুরুষমানুষের কি এই দশাই হয়?

প্রতিমা গলা খাঁকারি দিয়ে প্রশ্ন করলেন,—শুক্তোটা ভাল হয়েছে বেয়াইমশাই?

নির্মাল্য নড়েচড়ে উঠলেন,—অতি উত্তম। আহা, যেন অমৃত।

—দেব আর একটু?

—না, থাক। ভাল জিনিস অল্পই ভাল। বেশি খেলে ভালর স্বাদ মরে যায়।

উলটোদিকের চেয়ারে সিতাংশু ডালের প্রতীক্ষায় ভাত ভেঙে বসে। টেরচা চোখে বেয়াইকে দেখতে দেখতে তিনি বলে উঠলেন,—এত ভাল লাগল? আমার তো মনে হল তেতো একটু বেশি হয়ে গেছে।

—তাই কি? না না। একেবারে মাপা তেতো, মাপা নুন, মাপা মিষ্টি...

—সবই মাপা? সিতাংশু বাঁকা হাসলেন,—তা হলে বোধহয় আমারই জিভের দোষ।

বটেই তো, বটেই তো। সারাটা জীবন যে লোক বউয়ের ত্রুটি খুঁজে বেড়ান তাঁর আর এ ছাড়া কীই বা মনে হবে! সাধে কি প্রতিমা রান্নাঘরে যাওয়া ছেড়েছেন! এহ্, পোস্ত একেবারে আলুনি করে ফেলেছ, বাঁধাকপিতে মণখানেক চিনি ঢালার কী দরকার ছিল, নাদা নাদা আলু দিলেই কি তরকারি ভাল হয়—এই তো সব মন্তব্যের ছিরি! কতকাল পর মাত্র কটা দিনের জন্য ছেলের শ্বশুর এসেছেন বাড়িতে, পোলাও মাংস কালিয়া কাবাব নয়, রোজ একটা কি দুটো নিরামিষ পদ স্বহস্তে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন প্রতিমা। সামান্য নারকেল কুমড়ি কি মোচার ঘণ্ট কি শুক্তুনি, তাই সোনা মুখ করে খেয়ে স্ত্রীহারা মানুষটা এক-আধটা প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করছেন, অমনি টিপ্পনী শুরু হয়ে গেল!

প্রতিমা হড়াস করে স্বামীর পাতে ডাল ঢেলে দিলেন। গোমড়া মুখে বললেন,—বেগুনভাজা দেব?

—প্রাণ চাইলে দেবে।

—তোমার তো আবার শতেক প্যাখনা। লম্বা ফালি চলবে না, কালো হয়ে গেলে মুখ ভ্যাটকাবে...। সিতাংশুর থালায় অবহেলাভরে ভাজা বেগুন ফেলে আবার নির্মাল্যর প্রতি মনোযোগী হলেন প্রতিমা। কানে লেগে থাকা ক্ষণপূর্বের স্তুতির রেশটুকু ফেরাতে চাইছেন। মুখ হাসি হাসি করে বললেন,—আপনার আবার বেশি বেশি। ওই কচু ঘেঁচু শুক্তোকে কেউ অমৃত বলে না।

—আমি বলি। নির্মাল্যর সরল উত্তর, আপনার বেয়ান চলে যাওয়ার পর থেকে এ সব রান্না আর জোটে কই!

—কোথায় বেয়ানের রান্না, কোথায় আমার!

—অমন করে বলছেন কেন? আপনার বেয়ানের হাত একরকম ছিল, আপনার আর একরকম। দুটোই ভাল, তবে দুরকম।

—হ্যাঁ, একজনেরটা চিনি, অন্যজনেরটা গুড়। দুটোই মিষ্টি, কী বলেন?

কড়া চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন প্রতিমা। টুকুস চিমটি কেটে সিতাংশু নির্বিকার, হ্যা হ্যা হাসছেন। সামনের মানুষটা তাঁর ব্যঙ্গে ব্যথিত না উদাস, সে দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘরে এসে সিতাংশুকে ধরলেন প্রতিমা,—তোমার কী আক্কেল গো? অভাগা মানুষটাকে অমন হুল ফোটাও কেন?

সিতাংশু হাই তুলতে তুলতে দিবানিদ্রাকে আহ্বান জানাচ্ছেন। অলসভাবে বললেন,—খারাপ কী বলেছি? আগেও তো কতবার এ বাড়ি এসেছেন, এমন গদগদ প্রশংসা তো কখনও শুনিনি! কেন, তখন বউ পাশে থাকত বলে?

—কী ছি, কী ভাষা! বেচারার বউ মারা গেছে এখনও বছর ঘোরেনি...

—তো? তার জন্য তোমার রান্না নিয়ে আদিখ্যেতা মেনে নিতে হবে?

প্রতিমা চিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠলেন,—আমার রান্না নিয়ে দুটো ভাল কথা বলা মানে আদিখ্যেতা? নিজের মুখে মধু নেই বলে...

—মধুবাক্যেই গলে গেলে গিন্নী? সিতাংশু বিছানায় গড়ালেন,—শোনো, নির্মাল্য দস্তিদার মহা ধূর্ত চিজ। ওটা তোমার প্রশংসা নয়, ঘুরিয়ে নিজের ছেলের বউয়ের নিন্দে করা। আরে বাবা, সে বেটি আজকালকার মেয়ে, কেন বসে বসে শ্বশুরের জন্য শুক্তো ঘণ্ট রান্না করতে যাবে? ওঁর নিজের মেয়ে রাঁধে? জন্মে কোনওদিন শ্বশুর শাশুড়িকে তাঁদের পছন্দের পদ করে খাইয়েছে?

কী প্যাঁচ, কী প্যাঁচ! জিলিপির ঠাকুরদাদা অমৃতি! এমন প্যাঁচোয়া লোককে সামলে কী করে যে চল্লিশটা বছর ঘর করলেন প্রতিমা! এ দিকে কুট কুট করে ছেলের বউ-এর নিন্দে করবেন, ও দিকে তার সামনে একেবারে আদর্শ শ্বশুরটি। বাবুসোনা হওয়ার পর চাকরি করা নিয়ে নূপুরের সঙ্গে প্রতিমার যখন খটাখটি বেধে গেল, অমনি উনি রামমোহন বিদ্যাসাগর সেজে গেলেন। লেখাপড়া-জানা মেয়ে, ঘরে বসে শুধু সংসার আর বাচ্চা সামলাবে নাকি! করবে, নিশ্চয়ই চাকরি করবে। বাবুসোনাকে দুম করে বোর্ডিং স্কুলে পাঠানোর বন্দোবস্ত করে ফেলল নূপুর, বেচারা প্রতিমার নাতির জন্য মন পোড়ে, একা একা দিন কাটতেই চায় না। দোষের মধ্যে দোষ, ফস করে একদিন নূপুরকে বলে ফেলেছিলেন, একটা মাত্র ছেলেকে বাড়ি থেকে বিদায় না করে দিলে কি চলছিল না! বাপ রে, সঙ্গে সঙ্গে কর্তার কী মেজাজ! ও ছেলের মা, ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যা ভাল বুজেছে তাই করেছে, তুমি কথা বলার কে হে!

এই বেয়াইমশায়ের কথাই ধরা যাক না। পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন, দুর্গাপুরে অনেক ডাক্তারবদ্যি করেছেন, আসানসোলে গিয়ে বড় অর্থোপেডিক দেখিয়ে এসেছেন, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না, মেয়ে বাবাকে কলকাতায় এনে স্পেশালিস্ট দেখাবে—এ তো ভাল কথা। কিন্তু প্রতিমাকে আগে একবার জানাতে কী কষ্ট ছিল? প্রতিমা জানলেন কখন? না, বেয়াইমশাই কলকাতায় পা দেওয়ার পর। এর জন্য একবার অভিমান প্রকাশ করতেই কর্তার কী ধমক! বলি, বাপটা কার! তোমার, না নূপুরের? তার বাপকে ডাক্তার দেখানোর আগে তোমার অনুমতি নিতে হবে! সেই লোক ঘরের কোণে বসে এখন ছেলের বউয়ের কুচ্ছো গাইছে! প্রতিমা যদি একবার মুখ ফুটে নূপুরকে কিছু রাঁধতে বলেন, অমনি তো খিঁচিয়ে উঠবেন! সারাদিন অফিসে খাটাখুটি করে মেয়েটা, আবার হেঁশেলেও ঢুকবে! লোক বটে একখানা! একজনকে দেখলেই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন হয়ে যায়।

প্রতিমা মনে মনে জুতসই জবাব তৈরি করছিলেন, আবার সিতাংশুর গলা কানে উড়ে এল,—কী ধ্যান করছ বসে বসে? বেয়াইয়ের সার্টিফিকেটটা কোথায় ঝোলাবে? ওটাকে মাদুলি করে পরে থেকো।...আপাতত একটু গড়িয়ে নাও। অনেকক্ষণ রান্নাঘরে কাটিয়েছ, এর পর তো আবার কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা করে তড়পাবে।

প্রতিমা ঝেঁঝে উঠলেন,—হ্যাঁ বেয়াইমশাই পাশের ঘরে, আর আমরা এখানে জোড়ে শুয়ে নিদ্রা দিই! লজ্জাশরম তো কিছু নেই! ছোঃ।

—লজ্জাশরম? আমরা দুর্গাপুর গেলে বেয়াই-বেয়ান বুঝি সারাক্ষণ আমাদের মুখের সামনে মুখ লাগিয়ে বসে থাকতেন?

—ভুলে যেও না তখন বেয়ান ছিলেন।

—তবে আর কী! যাও, বেয়াইয়ের সামনে গিয়ে তা তাথিয়া তা থিয়া নাচো।

—নিজে ঘুমোও না। আমাকে নিয়ে প্যাচাল পাড়ছ কেন?

ড্রেসিংটেবিল থেকে চশমা নিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাটের কোণটিতে এসে বসলেন প্রতিমা। উলটোচ্ছেন এ পাতা সে পাতা, হেডিংগুলো দেখছেন। হিমালয়ের কোন এক শৃঙ্গে উঠেছে বাংলার কয়েকটি মেয়ে। বাহ্ বাহ্। সরষের তেলের দাম আবার চড়ল। কোনও মানে হয়! প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল আত্মহত্যা। মরণ, বেঁচেছিলি কেন অ্যাদ্দিন! বধূহত্যার দায়ে শাশুড়ি হাজতে। সব্বোনাশ, কোন প্রতিমার কপাল পুড়ল! প্রতিমা ঝুঁকলেন কাগজে, মন দিয়ে খবরটা পড়ছেন। চশমার পাওয়ারটা ঠিক নেই, ঘরের অল্প আলোয় ভাল মতো ঠাহর হচ্ছে না লেখাগুলো। উঠে আলো জ্বালতে গিয়েও নিরস্ত হলেন। চোখে সামান্যতম আলো পড়লেই ঘুম ভেঙে যাবে সিতাংশুর, অনর্থ শুরু করে দেবেন।

কাগজ হাতে ঘর থেকে বেরতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লেন প্রতিমা। ফরর ফরর নাক ডাকছে সিতাংশুর, দ্যাখ না দ্যাখ গভীর ঘুমে চলে গেছেন মানুষটা। কার্তিকের শেষ, উত্তরের জানলা দিয়ে শিরশিরে বাতাস ঢুকছে, প্রতিমা জানলার পাল্লাটা টেনে দিলেন। মাথার ওপর ফুল স্পিডে ঘুরন্ত ফ্যান পুট পুট দু পয়েন্টে কমিয়ে বেরিয়ে এসেছেন বারান্দায়।

পুবমুখো বারান্দায় খানদুয়েক বেতের চেয়ার, ছোট একটা টেবিল। অতনু আর নূপুরের শৌখিন বসার আয়োজন। এক ধারে সিতাংশুর ইজিচেয়ারও আছে। হেমন্তের দুপুরে এ বারান্দা ভারী আরামের।

একটা চেয়ার টেনে বসতে গিয়ে হঠাৎই নীচের কাঁচা উঠোন মতো জায়গাটায় প্রতিমার দৃষ্টি আটকে গেল। নির্মাল্য। উবু হয়ে বসে নিরীক্ষণ করছেন কী যেন। কখন নেমে গেলেন দোতলা থেকে?

প্রতিমা গলা ওঠালেন,—ওখানে কী করছেন বেয়াইমশাই?

নির্মাল্য ঘাড় তুললেন,—আপনার বাগান দেখছি।

—কোথায় বাগান! সবই তো আগাছা।

—কেন, কটা ফুলের চারাও তো বেরিয়েছে।

—তাই বুঝি?

প্রতিমার মন প্রসন্ন হয়ে গেল। এ বাড়ির কেউই তেমন গাছ অন্ত প্রাণ নয়. একমাত্র তাঁরই যা এক সময়ে অল্পস্বল্প উৎসাহ ছিল। টগর শিউলি গন্ধরাজের চারা লাগিয়েছিলেন কয়েকটা। গাছগুলোয় এখনও ফুল ফোটে, তবে আর তেমন যত্নআত্তি করা হয় না। সে শক্তিও নেই, সে উদ্যমও নেই। এখন শুধু ফি বছর পুজোর পর কিছু মরসুমি ফুলের বীজ এনে ছড়িয়ে দেন উঠোনের ওদিকটায়। পুরনো অভ্যেসের মতো। অযত্নে অবহেলায় বেশিরভাগই সূর্যের মুখ দেখতে পায় না, দুটো চারটে গাঁদা বেঁচে যায় ক্বচিৎ কখনও। হিলহিলে শরীর নিয়ে লিকলিক বেড়ে ওঠে, নবীন সোনালি ফুলে উঠোন আলো হয়ে যায়। বেশ লাগে দেখতে। এ বছরও তবে ফুটবে কয়েকটা?

পায়ে পায়ে প্রতিমা একতলায় নেমে এলেন। নির্মাল্যর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অভিভাবকের সুরে বললেন,—দুপুরে না শুয়ে এসব হচ্ছে?

নির্মাল্য যেন শুনতেই পেলেন না। আপন মনে বললেন,—চারাগুলোর এই হাল কেন? মাটি না তৈরি করলে হয়!

—ও সব ঝঞ্ঝাটে কে যায়! প্রতিমা ঠোঁট ওলটালেন,—নিজে থেকে যা হয়, হোক না।

—তা বললে হয়, পৃথিবীতে নতুন প্রাণ আসছে, তাদের একটু খাতিরদারি করতে হবে না?

প্রতিমার বুকে টুং করে বাজল কথাটা। অচেনা পাখির ডাকের মতো। কোমল দুপুরটার মতো। হাসলেন,—কী করতে হবে শুনি?

—খুরপি-টুরপি কিছু একটা দিন। মাটি ঝুরো করি, আগাছা সাফ করি...

—খুরপি কোথায় পাব?

—নেই? তা হলে একটা লোহার শিক গোছের কিছু...

সেকেন্ডের জন্য প্রতিমা ভাবলেন, আছে কি? হুঁউঁ, আছে তো! বাথরুমে। চৌবাচ্চার মুখ চেপে আটকানোর জন্য। আনতে গিয়ে খুঁজে পেলেন না। বাসন্তীর মা কোথায় যে রেখেছে!

রান্নাঘর হাতড়ে শেষে স্টিলের খুন্তিটা নিয়ে এলেন প্রতিমা। সঙ্গে একখানা কাটারিও। গভীর মনোযোগে মাটি খোঁড়ায় নেমে পড়েছেন নির্মাল্য। দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা মাটি গুঁড়ো হয়ে গেল। প্রতিমাও কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন, হাতে ঘষে ঘষে ঝুরো করছেন মাটি। সেই মাটি ফুল গাছের গোড়ায় চেপে চেপে দিচ্ছেন নির্মাল্য, কাটারি দিয়ে ছেঁটে ছেঁটে দিচ্ছেন আগাছা।

কাজ করতে করতে কথা চলছে দুজনের। গাছের কথা। ফুলের কথা। এলোমেলো কথা।

নির্মাল্য—এ তো বেশ ভাল জাতের গাঁদা। ফুল প্রায় টেনিস বলের সাইজে হবে।

প্রতিমা—কই হয়! আমি তো এইটুকু টুকুই দেখি।

নির্মাল্য—ফুলের জন্য খাটতে হবে। সার দিতে হবে, জল দিতে হবে। জানেন তো, গাছ কক্ষনো বিট্রে করে না। আপনি গাছের কথা ভাবুন, গাছও আপনার কথা ভাববে।

প্রতিমা—ছিলেন তো ইঞ্জিনিয়ার, গাছাগাছালির খবর এত জানলেন কী করে? নেশাটা কি নতুন?

নির্মাল্য—নেশা বলছেন? গাছ কত ভাল সঙ্গী জানেন?

প্রতিমা—তা বটে। যা ইচ্ছে কথা শোনাতে পারেন, জবাবটি দেবে না।

নির্মাল্য কাটারি চালানো থামিয়ে বিচিত্র চোখে তাকালেন প্রতিমার দিকে। চশমার আড়ালে মণিদুটো যেন ঝিকঝিক করে উঠল। হাসি, অথচ যেন হাসি নয়। অন্যমনস্ক স্বরে বললেন,—নীরব থেকেও তো অনেক কথা বলা যায়। আপনার বেয়ানকে তো চিনতেন, দিনে রাতে কটা কথা বলত সে?...আমি তো একাই বকে মরতাম।

কাছেই ট্রেনলাইনে ঝমঝম শব্দ বাজিয়ে একটা ট্রেন শহর থেকে শহরতলির দিকে চলে গেল। উত্তর থেকে দক্ষিণে। শীতের হাওয়ার মতো।

প্রতিমা অস্ফুটে বললেন,—বেয়ান বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। অসময়ে।

—মৃত্যুর কি সময় অসময় আছে? নির্মাল্য ছোট্ট শ্বাস ফেললেন,—পৃথিবীতে তার কাল ফুরিয়েছিল, সো শি হ্যাড টু ডিপার্ট। আফসোস শুধু একটাই। চিকিৎসা করানোর সুযোগ দিল না। টিভি দেখতে দেখতে একটা উঃ শব্দ করল, ব্যস্, দি এন্ড। সেরিব্রাল হয়েও তো কতজন বেঁচে যায়। যায় না, বলুন?

প্রতিমা অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কথার মোড় ফেরাতে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন,—এহে, আপনার সর্বাঙ্গ যে একেবারে মাটিতে মাখামাখি হয়ে গেল!

নির্মাল্য কাটারি রেখে উঠে দাঁড়ালেন। হাত ঝাড়ছেন, পাঞ্জাবি ঝাড়ছেন, হাতের

পিঠ দিয়ে কপাল মুছছেন। বাড়ির এ দিকটা থেকে অনেকক্ষণ রোদ সরে গেছে, তবু ঘেমেছেন বেশ। শেষ কার্তিকের দুপুরেও।

মানুষটাকে দেখে প্রতিমার ভারী মায়া জাগছিল। কেমন আলাভোলা ধরনের হয়ে গেছেন, আত্মমগ্ন। আঁচলে আলগা হাত মুছে নিয়ে নির্মাল্যর পাঞ্জাবির পিঠ ঝেড়ে দিলেন প্রতিমা।

তখনই দোতলায় চোখ চলে গেল।

সিতাংশু।

চারটের সময় চা না দিলে সিতাংশুর দিবানিদ্রা ভাঙে না, আজ উঠে পড়েছেন যে বড়!

সন্ধে নামার মুখে মুখে ফিটফাট বাবুটি সেজে সিতাংশু তৈরি। ঘর থেকেই হাঁক দিলেন,—বেয়াইমশাই, রেডি তো?

নির্মাল্য দোতলার বারান্দায়, সিতাংশুর ইজিচেয়ারে। বসে বসেই সাড়া দিলেন,—আজ আর বেরোব না ভাবছি।

—সে কী! ক্লাবে যাবেন না?

—ইচ্ছে করছে না।

—আরে চলুন চলুন, চব্বিশ ডিল খেলেই ফিরে আসব। সিতাংশু ছড়ি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন,—সুরেন পরিমলদের সঙ্গে তো আপনার ভাল ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে। দেখবেন, গল্প শুরু করতে না করতেই সন্ধে কাবার।

—আজ ছেড়ে দিন বেয়াইমশাই। কাল ডাক্তারের কাছে যাব, আজ একটু রেস্ট নিই।

প্রতিমা ঘরে সন্ধে দিচ্ছিলেন। ঠাকুরের সামনে ধুপ দোলাতে দোলাতে গলা ওঠালেন,—ওঁর যখন ইচ্ছে করছে না, জোর করছ কেন? তুমি তাসুড়ে মানুষ, তুমি ঘুরে এসো।

মুখে বিদঘুটে এক ধ্বনি তুলে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেলেন সিতাংশু।

এ অঞ্চলে মশা খুব। গোটা জায়গাটা এক সময়ে জলাভূমি ছিল। এখন অবশ্য অগুন্তি বাড়ি হয়ে গেছে। তবু জলাভূমির স্মৃতি ভুলতে দেয় না মশারা, সন্ধে হলেও হানা দেয় ঝাঁকে ঝাঁকে।

দোতলার ঘরগুলোতে মসকিউটো রিপেলেন্ট জ্বালিয়ে জানালা দরজা সব ভেজিয়ে দিলেন প্রতিমা। বারান্দায় এসে বাতি জ্বেলে দিলেন,—এক কাপ চা খাবেন নাকি বেয়াইমশাই?

নির্মাল্যর উত্তর নেই। সামনের তরল আঁধারে দৃষ্টি হারিয়ে আছে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে প্রতিমা সিঁড়ির দিকে এগোলেন। বাসন্তীর মা বিকেলের রান্না করতে এসে গেছে, দু কাপ চা দিয়ে যেতে বললেন তাকে। ফিরে চেয়ারে বসেছেন।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—শরীরটা কি খারাপ লাগছে বেয়াইমশাই?

নির্মাল্যর মৃদু স্বর শোনা গেল,—নাহ্, ঠিকই আছি।

—পিঠের ব্যাথাটা আবার হচ্ছে না তো?

—সামান্য। বলার মতো কিছু নয়।

প্রতিমা অনুযোগের সুরে বললেন,—মিছিমিছি তখন মাটি কোপাতে গেলেন, অমন ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করা আপনার একদম উচিত নয়।

—দূর, ও জন্য কিছু হয়নি। বরং গাছের পরিচর্যা করলেই আমি বেশ থাকি। নির্মাল্যর দুই হাত ইজিচেয়ারের দুই হাতলে,—আমার যন্ত্রণাটার মূল অনেক গভীরে। প্ল্যাণ্টে কাজ করার সময়ে একবার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। বছর পঁচিশ আগে। লোহার সিঁড়ির সাত আট ধাপ ওপর থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।

—ও মা, কী সব্বোনেশে কথা! আগে শুনিনি তো?

—না, চোট তখন তেমন লাগেনি কিছু। হাড়গোড়ও ভাঙেনি, রক্তপাতও হয়নি...তবে তারপর থেকে ঠায় বসে থাকলেই...রিটায়ারমেণ্টের পর থেকে তো হাঁটাচলা কমেই গেছে। বসেই থাকি। আর সেই সুযোগ বুঝেই ব্যথা আবার চড়াও হয়েছে।

—বসে থেকেই যখন ব্যায়রাম, বসে রইলেন কেন? ওঁর সঙ্গে হেঁটে এলেই পারতেন।

—তাস পাশা আমার ভাল লাগে না বেয়ান। জন্মে কখনও খেলিনি তো। স্পেড হার্ট নো ট্রাম্প্ শুনলে কেমন চমকে চমকে উঠি। নিজেকে বেশ ইডিয়টিক লাগে। তবে হ্যাঁ, বেয়াইমশাইয়ের বন্ধুরা সজ্জন ব্যক্তি, গল্পগুজব করাই যায়। কিন্তু মুশকিল হল, ওঁদের টপিক একটাই। পলিটিক্স। মিস্ত্রি মজুর খাটানো মানুষ তো, ভোঁতাবুদ্ধি। ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধির শাস্ত্রটি আমার পছন্দ হয় না।

শেষ বাক্যটির মর্মার্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না প্রতিমা। অপাঙ্গে দেখলেন, বেয়াইমশাই একটু যেন কাত হয়ে গেছেন, মুখ চোখ কুঁচকোনো। ব্যথাটা যত কম বলছেন তত লঘু নয় বোধহয়।

নরম স্বরে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলেন,—পিঠের ঠিক কোনখানে হচ্ছে ব্যাথাটা?

—শিরদাঁড়ার ডান দিকে। বেয়ে বেয়ে কাঁধ অবধি উঠলেই চিত্তির, একেবারে বিছানায় আছড়ে ফেলে দেবে।

—আগে কি এতটা বাড়াবাড়ি ছিল?

—ছিল না। আবার ছিলও। আপনার বেয়ান গরম তেল কী সব মিশিয়ে মালিশ করে দিত, বাড়তে পারত না।

—কী মালিশ? নূপুর জানে?

—নাহ্। ওসব ছিল আপনার বেয়ানের নিজস্ব তুকতাক।

—আমার একটা বেদনার মলম আছে। মালিশ করতে হয় না, আলগা বোলালেই কাজ হয়। দেব?

হ্যাঁ না কিছুই শোনা গেল না। চরাচরে এখন গাঢ় অন্ধকার। রাস্তার বাতি জ্বলে গেছে। মিহি কুয়াশায় চারপাশের বাড়ি আলো কেমন অস্পষ্ট দেখায়। প্রবল প্রতিযোগী দুই রিকশা তীক্ষ্ণ হর্ণ বাজাতে বাজাতে সামনে দিয়ে ছুটে গেল। হাওয়া দিচ্ছে মাঝে মাঝে। এলোমেলো, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

বাসন্তীর মা চা রেখে গেছে। আঁচল গায়ে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে কাপে চুমুক দিলেন প্রতিমা। আলগা বললেন,—এ বছর শীতটা ভালই পড়বে মনে হয়। সবে নভেম্বরের দশ তারিখ, এখনই বাতাস কী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে!

নির্মাল্য বললেন,—হুঁ।

—আপনাদের ওদিকে তো অনেক বেশি শীত পড়ে।

—হ্যাঁ, ডিসেম্বরে বেশ টেম্পারেচার নেমে যায়। কথাটা বলেই নির্মাল্য একটুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন,—আপনার বেয়ান বড্ড শীতকাতুরে ছিল। দুটো মাস তো একেবারে জবুথবু হয়ে থাকত। প্রতি বছরই বলত, এ শীতটা আর কাটবে না। গত বছর কথাটা ফলে গেল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না সেরিব্রালের সঙ্গে শীতের কী সম্পর্ক! হয়তো নির্মাল্য বলবেন, মৃত্যুভয়ই সেরিব্রাল টেনে এনেছে! কোনও কথা বলাই এখন বিপদ। নির্মাল্যর সব কথাই এখন ঘুরেফিরে স্ত্রীতে চলে যায়।

কথা ঘোরানোর জন্য প্রতিমা বলে উঠলেন,—তা আপনি এখন একটা পাতলা পাঞ্জাবি পরে আছেন কেন? গায়ে একটা চাদর আলোয়ান কিছু জড়ান।

—কিছু লাগবে না। ঠাণ্ডা আমার বেশ লাগে।

—লাগুক। তবু একটা কিছু গায়ে দিন। হিম পড়ছে। এ সময়টাই অসুখবিসুখ হয় বেশি।

ইজিচেয়ার আবার নীরব।

প্রতিমা চা শেষ করে উঠে পড়লেন। নির্মাল্যর ঘরে গিয়ে চাদর আনতে কেমন বাধো বাধো ঠেকল, এসেছেন নিজেদের ঘরে। সিতাংশুর তুষের চাদরখানা হাতে নিয়ে এক সেকেন্ড ভাবলেন কী যেন। তারপর ড্রেসিংটেবিলের দেরাজ থেকে মলমটাও নিয়ে ফিরে এলেন বারান্দায়।

টিউব আরামকেদারার হাতলে রেখে বললেন,—লাগিয়ে নিন। চাদরটা তারপর জড়িয়ে নেবেন গায়ে।

কথা শেষ হতে না হতেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ছড়ি হাতে আবির্ভূত হলেন সিতাংশু।

প্রতিমা অবাক হয়ে বললেন,—এর মধ্যে তোমার চব্বিশ ডিল হয়ে গেল?

—ধুস, কেউ আসেনি। ছড়ি টেবিলে শুইয়ে চেয়ারে বসলেন সিতাংশু,—একা একা কতক্ষণ মাছি মারব?

—আশ্চর্য! তোমার তাসবন্ধুরা ডুব মেরেছে! সূর্য আজ কোনদিকে উঠেছিল গো?

সিতাংশু দুম করে চটে গেলেন,—কেন, তারা কি একদিন বাড়িতে রেস্ট নিতে পারে না?

—তুমি না বলো, তাস খেলাই তোমাদের বিশ্রাম? প্রতিমা খোঁচালেন।

সিতাংশু গুম হয়ে গেলেন।

মুখ খুললেন সেই রাতে। শোওয়ার সময়ে। মশারি গুঁজতে গুঁজতে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন,—টিউব শেষ?

প্রতিমা গ্লাস উঁচু করে জল খাচ্ছিলেন। হালকা বিষম খেলেন,—কিসের টিউব?

—ন্যাকা সেজো না। আমার কি চোখ নেই? গোটা মলমটাই কি বেয়াইয়ের পিঠে ঘষা হয়ে গেল?

—গোটা মলম কোথায়? একটুখানি তো পড়ে ছিল।

—বললেই হল? পুজোর পর ওটা কেনা হয়েছে। পাক্কা দু মাস চলে, আমার হিসেব আছে।

—কী ছোট মন গো তোমার!

—হ্যাঁহ্, আমারই তো ছোট মন! ন্যাজাল ড্রপের শিশি খুলে নাসিকাগহ্বরে ফোঁটা ফোঁটা তরল ঢালছেন সিতাংশু। জোরে নাক টানলেন কয়েকবার। সঙ্গে সঙ্গে মুখটাও বিকৃত হয়ে গেল,—নিজের মন তো খুব বড়। আমি মানুষটা ঠাণ্ডায় হিহি করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেলাম, তাকে একটা শাল কম্ফর্টার দেওয়ার কথা মনে পড়ল না, আর তিনি আমারই ইজিচেয়ারে শুয়ে আমার চাদরে ওম নিচ্ছেন! দুর্ভাগা অভাগা হওয়ায় ভারী মজা, অ্যাঁ?

রাগে ঘেন্নায় প্রতিমার সর্বাঙ্গ রি রি করে উঠল। এক পা ঘাটে বাড়িয়ে বসে আছেন, এখনও কুচুটেপনা হিংসুটেপনা গেল না! বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল প্রতিমার, এখনও তাঁকে সন্দেহ করা! ছি ছি ছি ছি।

বিছানায় এসে বেড সুইচ নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন প্রতিমা। অন্ধকারে দাঁতে দাঁত ঘষছেন। এই জন্যই দুপুরে বারান্দা থেকে উঁকি মারছিল? তাসের আসর থেকে ফিরে এসেছেন? টিকটিকিপনা?

প্রাণ থাকতে এই মানুষটার সঙ্গে আর কথা বলবেন না প্রতিমা।

পরদিন রাত আটটা নাগাদ ডাক্তার দেখিয়ে ফিরলেন নির্মাল্য। মেয়ে জামাই-এর সঙ্গে। মেয়ের ডাক্তারও তেমন কিছু আশার কথা শোনায়নি। ক'টা বাথার ওষুধ লিখে দিয়েছে, সঙ্গে ফিজিওথেরাপির নির্দেশ। আর টেস্ট দিয়েছে এককাঁড়ি। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সবেরই একবার পরীক্ষা চায় ডাক্তার। সমস্ত করে টরে আবার মাসখানেক পর হাজির হতে হবে তাঁর চেম্বারে, তখন তিনি উপযুক্ত বিধান দেবেন!

বাড়ি এসে নির্মাল্য খানিকক্ষণ মনমরা হয়ে বসে রইলেন।

নূপুর অতনু নানা রঙ্গরসিকতা জুড়ে তাঁকে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করছে, তাও তাঁর মুখে হাসি নেই। অবশেষে ম্লান মুখে ঘোষণা করলেন, কালই ভোরে তিনি দুর্গাপুর ফিরতে চান। বাড়ির জন্য তাঁর মন কেমন করছে।

প্রতিমা ভেতর থেকে সিঁটিয়ে গেলেন। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ সংশয় উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। কাল রাতে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ কি কানে গেছে নির্মাল্যর? যেতেই পারে। বেআক্কেলে লোকটার তো মাত্রাজ্ঞান নেই, সব কথাই উঁচু পর্দায় বলতে ভালবাসে। নাকি সিতাংশুর ব্যবহারে আহত হয়েছেন নির্মাল্য? এও সম্ভব। সিতাংশুর যা চ্যাটাং চ্যাটাং কথার বহর। কিংবা নির্মাল্য নজর করেছেন সিতাংশু প্রতিমার বাক্যবিনিময় বন্ধ হয়ে গেছে? বেয়াইমশাই নিজেকে যতই ভোঁতামস্তিষ্ক বলুন, তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর। আলাভোলা হতে পারেন, শিশু তো নন। কুটুমের কাছে মানসম্মান কিছু রইল না। কী লজ্জা, কী লজ্জা।

অনেক রাত অবধি প্রতিমা দু চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। পাশের মানুষটা দিব্যি সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, নাক ডাকছে ফরর ফুস। প্রতিমার হাত নিষপিষ করছে। ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে সিতাংশুকে। এক্ষুনি ও ঘরে গিয়ে বেয়াইমশায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুক।

কিন্তু কিছুই পারলেন না প্রতিমা। শেষ ট্রেনের ভোঁ চোখে নিদালি বুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কাকভোরে ছোটখাটো হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল বাড়িতে। উঠে পড়েছেন প্রতিমা, জেগে উঠেছেন সিতাংশু, তৈরি হয়ে নিচ্ছে নূপুর। চা হচ্ছে, মালপত্র গোছগাছ চলছে। বাথরুমে দরজা খোলা-বন্ধ হচ্ছে ঘন ঘন। অতনু ট্যাক্সি ডেকে আনল। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে স্টেশন রওনা হলেন নির্মাল্য।

প্রতিমা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। আলো ফুটে গেছে বেশ, ঘন কুয়াশার পর্দা সরিয়ে ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে পৃথিবী। কাগজঅলার সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শোনা যায় মাঝে মাঝে। বিকট শব্দ করে মোড়ের বুথে দুধের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

সহসা ভীষণ জোর নাড়া খেয়ে গেলেন প্রতিমা। নীচের উঠোনে সিতাংশু। মগে করে জল দিচ্ছেন ফুল গাছের চারায়! গাছের গোড়াগুলো খোঁচাচ্ছেন কাঠি দিয়ে, আবার চেপে চেপে দিচ্ছেন মাটি।

প্রতিমা ফিক করে হেসে ফেললেন। ঈর্ষার উত্তাপই বুঝি বেঁচে থাকাটা আজও রঙিন করে দেয়। পাগল, লোকটা একেবারে পাগল।

বিপ্রতীপ

সাতসকালে খাওয়া সেরে এ ঘর ও ঘর পায়চারি করছিলেন শিবতোষ। মেয়ে বউ-এর তাড়নায় শুয়েওছিলেন একটুখানি, ভাতঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসতেই তড়াং করে উঠে পড়েছেন। তিনটে বেজে গেল না তো? ঘুরছেন ফিরছেন আর ঘড়ি দেখছেন শিবতোষ। উফ্, দুপুর যেন আজ নড়তেই চায় না! সবে এখন দুটো বাজতে পাঁচ!

শিবতোষ একবার ব্যস্তভাবে মেয়েকে বললেন, আমার ধুতি পাঞ্জাবি বার করে রেখেছিস তো?

মিতালি খাটে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিল। সামনে পার্ট ওয়ান পরীক্ষা, তবু দুপুরে পড়ার বই উলটানো তার ধাতে নেই। বই বুকে রেখে চোখ ঠোঁট টিপে হাসল, গরদের পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করে রেখেছি।

নীলিমা বারান্দায় বসে র‍্যাশনের গম বাছছিলেন। এ সপ্তাহে এত মাটি দিয়েছে গমে! মেয়ের কথায় তাঁর হাত থেমে গেল, গরদের পাঞ্জাবির সঙ্গে নকশাপাড় ধুতিও বার করে দিস। ওই যে তোর দিদির বিয়ের সময়ে যেটা বাবাকে দিদির শ্বশুরবাড়ি থেকে দিয়েছিল।

শিবতোষ ঠাট্টাটা বুঝলেন না, বললেন, না না, এই গরমে গরদ পরব না। মিতু, তুই বরং আমার আদ্দির পাঞ্জাবিটা বার করে দে।

নীলিমা আবার ফুট কাটলেন, একটু সেন্ট ফেন্টও মেখে নিও। বড়লোকের বাড়ি যাচ্ছ, গা দিয়ে ঘামের গন্ধ বেরলে তারা কিন্তু নাক সিঁটকোবে।

শিবতোষ এতক্ষণে বিদ্রূপটা ধরেছেন। চুপ করে গেলেন। সারাটা জীবন যাদের হেঁসেল ঘরে কাটে তারা কী বুঝবে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মহিমা! প্রিয় ছাত্রকে জীবনে উচ্চ প্রতিষ্ঠিত দেখলে কতটাই বা আনন্দ হতে পারে শিক্ষকের!

মিতালি উঠে আলমারি থেকে পাঞ্জাবি বার করে দিল। বেশ কয়েক বছরের পুরনো, অবসর নেওয়ার সময় স্কুল থেকে পেয়েছিলেন পাঞ্জাবিটা। বিদায় উপহার। সামাজিক অনুষ্ঠান ছাড়া শিবতোষ আদ্দি বা গরদ পরেন না। খদ্দরই তাঁর বারো মাসের সঙ্গী। সামাজিক অনুষ্ঠান না হলেও আজ একটা বিশেষ দিন তো বটেই। আজ এটাই মানাবে।

মিতালি বই নিয়ে আবার বিছানায় ফিরেছে, এত তাড়াতাড়ি বেরনোর কী আছে? তুমি আরেকটু বিশ্রাম নিলে পারতে বাবা। ট্রেন তো সেই তিনটে চল্লিশে, সওয়া তিনটের পর বেরলেও চলবে। এই রোদ্দুরে অতটা পথ ভাঙা!

দুপুর রোদে অতটা পথ শিবতোষ মাঝে মাঝে ভাঙেন। ভাঙতে হয়। কখনও ডি আই অফিস, কখনও প্রভিডেন্ড ফান্ড দপ্তর। আট বছর হয়ে গেল আজও পেনশনের ফাইল ঘোমটা খুলল না। এল আই সি-র একটা পলিসি ম্যাচিওর করাতে বড় মেয়ের বিয়েটা দিয়েছিলেন, পি এফ-এর টাকা হাতে এলে ছোট মেয়ের জন্য দুশ্চিন্তা কমত। ঘরদোরের হালতও খারাপ হচ্ছে দিন দিন। কত দিন যে কলি পড়েনি বাড়িটায়! শুধু টিউশনির টাকায় কত ছিদ্র সামলাবেন শিবতোষ? আজকাল সময় অন্যরকম, স্কুলের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে খুব বেশি ছাত্রও পাওয়া যায় না। তাও ভাল, ছেলে এখনও বাবা মাকে মনে রেখেছে। শিলিগুড়ি থেকে টাকা পাঠায় নিয়মিত। বউ বাচ্চার খরচ সামলে। দুশো তিনশো যখন যা পারে।

শিবদোষ আনমনে বললেন, এই তো পথ! কী আর এমন দূর!

বাড়ি থেকে স্টেশন হাঁটাপথে দশ মিনিট। তিনটে চল্লিশের ট্রেন ঠিকঠাক এলে মাঝেরহাট পৌঁছতে মিনিট পনেরো। সেখান থেকে বাসে নিউআলিপুর আর কতটুকুই বা? তবে সেভাবে ভাবতে গেলে দূরও বটে। গাড়ি যদি সময় মতো না আসে, তাহলেই হল। ছুটির দিন, আজ এমনিতেই ট্রেন কম। ট্রেন না পেলে তখন তীর্থের কাকের মতো বসে থাকো!

শিবতোষ মনে মনে আবারও উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। আজকাল নিয়মানুবর্তিতা শব্দটাই উঠে গেছে রেল কোম্পানির অভিধান থেকে। আছেই বা কোথায়? স্কুল কলেজ অফিস সংসার রাজনীতি সর্বত্রই অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা। যুগটাই সারাক্ষণ পালাই পালাই করছে। সাড়ে চারটে পাঁচটায় কুশলের বাড়ি পৌঁছুবেন বলেছেন, একটু নয় আগেই বেরলেন আজ।

কুশলের মুখ মনে পড়তেই শিবতোষের দেহে আনন্দের ধারা বহে গেল। কুশলেরও সময় জ্ঞান কম ছিল, প্রেয়ারে রোজ দেরি করত কিন্তু মাথাটা বড় সাফ ছিল ছেলেটার। জটিল অঙ্ক দিয়ে শিবতোষ ক্লাসে অল্প জিরোচ্ছেন, ছেলেরা

মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে, এক মিনিটে কুশল খাড়া—হয়ে গেছে স্যার। শিবতোষ তখনই বুঝেছিলেন ছেলেটা অনেকদূর যাবে।

গেছেও। অনেক অনেক উঁচুতে উঠেছে কুশল। সেদিন ডালহাউসিতে দেখা না হয়ে গেলে হয়তো জানতেও পারতেন না শিবতোষ। কত ছেলে যে কত দিকে ছড়িয়ে গেছে!

রাইটার্স থেকে বেরিয়ে শিবতোষ তখন ধর্মতলার দিকে হাঁটছেন। এডুকেশন সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করার একটা ডেট পেয়েছিলেন, সেক্রেটারি সাহেব অফিসেই আসেননি। মন বেশ অবসন্নই ছিল। মিশন রো'র ফুটপাতে হঠাৎই কুশলের সঙ্গে দেখা। অফিস থেকে বেরিয়ে কুশল গাড়ির দিকে যাচ্ছিল। স্যুট প্যাণ্ট টাই পরা কেতাদুরস্ত চেহারা। চোখে বিদেশি সানগ্লাস। পনেরো বছর পর দেখা, তবু চিনতে ঠিক এক মুহূর্ত সময় লেগেছিল শিবতোষের। কুশলও দেখেছে তাঁকে, স্যার আপনি?

—তুমি কুশল তো?

—হ্যাঁ স্যার।

কুশলের পিছনে কুশলের বেয়ারা। তার হাতে কুশলের ব্রিফকেস।

কুশল বেয়ারাকে নির্দেশ দিল—গাড়িতে তুলে দাও সব। বলেই শিবতোষের দিকে ফিরেছে, আপনি ভাল আছেন তো স্যার?

—আছি একরকম। তোমার খবর কী? সেই যে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলে, আর তো তোমার কোনও খবরই পাইনি।

—এখান থেকে এম. এস-সি করে স্যার বাইরে গেছিলাম। কমপিউটার নিয়ে পড়তে।

—বাহ্ বাহ্। স্টেটসে বুঝি?

—হ্যাঁ স্যার। ক্যালটেকে ছিলাম ছ'বছর। ম্যানেজমেন্টের কোর্সও করেছিলাম। এখন দেশে ফিরে চাকরি।

শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময় শিবতোষের মুখচোখে,—কোথায়? কোন কোম্পানিতে?

—একটা আমেরিকান ফার্মে।

—ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্ক?

—ওই রকমই আর কি? কুশল হালকা হাসছিল, আপনি এদিকে কোথায়?

—আর বোলো না, পেনশনটা আটকে আছে। আট বছর। কত চেষ্টাচরিত্র করে এডুকেশন সেক্রেটারির সঙ্গে একটা ডেট করলাম, গিয়ে শুনি তিনি আজ ছুটি নিয়েছেন।

—এডুকেশন সেক্রেটারি কে এখন? তিমিরদা না?

—তিমির আচার্য। তুমি চেনো?

—তিমিরদা আমাদের ক্লাবের মেম্বার। পরশুও তো অনেকক্ষণ আড্ডা মারলাম। সানগ্লাস খুলে হাতে ধরল কুশল, বলব নাকি স্যার আপনার কেসটা?

—বলবে? খুশিতে বুক নেচে উঠেছিল শিবতোষের—তাহলে খুবই ভাল হয়। বৃথাই শুধু ঘুরে ঘুরে মরছি। পেনশন পি এফ কিছুই এখনও পেলাম না।

—না না, এ ভারী অন্যায়। ঠিক আছে, আমি দেখছি।

শিবতোষ সেই মুহূর্তে লজ্জা পেয়েছিলেন একটু। নিজের কাহিনী শোনাতে গিয়ে কুশলের বাড়ি ঘরদোর সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি তখনও। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেছিলেন—বিয়ে থা করেছ তো কুশল?

কুশল মাথা চুলকেছিল,—হ্যাঁ স্যার। বছর ছয়েক।

—ছেলে পুলে?

—একটি। ছেলে। সবে নার্সারিতে ভর্তি হয়েছে।

—ভাল। খুউব ভাল। শিবতোষ যতটা পুলকিত, ততটাই উচ্ছ্বসিত। তাঁদের রামরতন বিদ্যামন্দিরে সাংঘাতিক মেধাবী ছাত্র কোনও দিন আসেনি বড় একটা। বেশিরভাগেরই মান অতি সাধারণ। সাধারণমানের রেজাল্ট। নব্বইটা যদি পরীক্ষায় বসে, তো দশটা ফার্স্ট ডিভিশন যাবে কি যাবে না। বেশির ভাগ ছেলেরই পড়াশুনোর মাথা নেই, মনও নেই। তবু তার মধ্যেই দু-একটা অসাধারণ স্ফুলিঙ্গ শিবতোষরা পেয়েছেন বইকি। কুশলদের মতো।

শিবতোষ কুশলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। একটু মোটা হয়েছে ছেলেটা। পেটে, ঘাড়ে, গালে, চোখে চর্বি আসন গাড়ছে। চওড়া কপাল। ঝকঝকে চোখ। চিবুকের ভাঁজে একটা আলাদা ব্যক্তিত্বের ছাপ। কুশল সফল। শিবতোষের গলা স্নেহে জড়িয়ে আসছিল,—কী রেজাল্টটাই না তুমি করেছিলে মাধ্যমিকে!

তোমার বাবা চেয়েছিলেন তুমি হায়ারসেকেন্ডারি কোনও নাম করা স্কুল থেকে করো, তুমি আমাদের ছেড়ে গেলে না।

—আপনার মনে আছে স্যার?

—ছিল না। এখন সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

—সবই আপনাদের আশীর্বাদ স্যার। আসুন না স্যার আমার বাড়িতে একদিন। শিবতোষ সম্পূর্ণ গলে গেলেন। বিদ্যালয় মানুষের বুনিয়াদ গড়ে দেয়। বুনিয়াদের ওপর বেড়ে ওঠে ইমারত। একতলা। দুতলা। দশতলা। পঁচিশতলা। অভ্রংলেহী অট্টালিকা যখন দাঁড়িয়ে থাকে সদর্পে, তখন কজন আর মনে রাখে ভিত গড়ার কারিগরদের?

কুশল মনে রেখেছে। কুশল মহান। শিবতোষ পাশের ঘরে গিয়ে জামাকাপড় বদলে এলেন। আদ্দির পাঞ্জাবি পরেছেন, ধবধবে সরু পাড় ধুতি। শীর্ণকায় বৃদ্ধ শরীর অভাবে ক্ষত বিক্ষত হলেও এখনও ব্যক্তিত্বে উন্নত। তুলনায় নীলিমাই বরং বেশি অশক্ত হয়েছেন। গোলগাল দেহটাতে তাঁর নিত্য অসুখ। যন্ত্রণা। বাত। কফ। পিত্ত। শিবতোষ স্ত্রীকে বললেন, খুউব তো সকাল থেকে টিকিরি মারছ আমাকে, ছেলেটার সঙ্গে আজ দেখা হলে আমার থেকে তোমাদেরই উপকার হবে বেশি। নীলিমার ঘুম ঝাড়া শেষ, ফাটল ধরা সিমেন্টের মেঝেতে গড়াচ্ছেন তিনি। পাশ ফিরে বললেন,—এখন আর কাকে দিয়ে কী উপকার হবে বুঝি না বাপু। স্কুল আর ছাত্র নিয়ে সারাজীবন তো হেদিয়ে মরলে, কী পেলে শেষে? তখন তো খুব আদর্শ দেখিয়ে টিউশানি করতে না। সেই ধরলে, শেষ বয়সে ধরলে! দ্যাখো আরও কী কপালে আছে?

—মাত্র আট বছরেই এত ভেঙ্গে পড়লে? শিবতোষ হাসছেন মৃদু,—আমার মতো কত মাস্টার পেনশন পাওয়ার আগে হেজে পচে মরে গেল তার খবর রাখো? জান না তো গ্রামের স্কুলগুলোর কী অবস্থা! কদিন আগে হেতমপুরে এক মাস্টার বাহাত্তর বছর বয়সে গলায় দড়ি দিয়ে মরল। খেতে না পেয়ে।

নীলিমা শুকনো চোখে তাকালেন,—তোমার ওই ছেলেটা কিছু করতে পারবে বলছ?

—বলল তো করবে। নিজে থেকেই বলল।

মিতালি আবার উঠে বসেছে, তোমার বই দু'টো আমি রঙিন কাগজে সুন্দর করে প্যাক করে দিয়েছি বাবা। নিতে ভুল না।

কুশলকে উপহার দেবেন বলে কালই দুটো বই কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনে এনেছেন শিবতোষ। হেমিংওয়ের ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সি, আর একটা সঞ্চয়িতা। প্রথমদিন প্রিয় ছাত্রের বাড়ি যাবেন, একেবারে খালি হাতে তো যাওয়া যায় না।

মিতালি বলেছিল,—এমা, এই বই দুটো কিনলে কেন? এতো একদম কমন বই। সব বাড়িতে থাকে। বরং দুটো ক্যাসেট দিতে পারতে। সেতার। সরোদ।

নীলিমা বলেছিলেন,—যাওয়ার আগে একটু মিষ্টি কিনে নিও। তোমার এসব সাংসারিক বুদ্ধি কম, মিষ্টিটা বউ-এর হাতে দেবে।

—না বাবা, মিষ্টি নিয়ে যেও না। বড়লোকদের বাড়ি মিষ্টি নিয়ে গিয়ে কি হবে? তোমার ছাত্রর একটা ছেলে আছে বলছিলে না? বাচ্চাটার জন্য বরং মিল্ক চকোলেট নিয়ে যেও।

শিবতোষ ঘড়ি দেখলেন। তিনটে দশ। এবার বেরিয়ে পড়া যায়। কে জানে

হয়তো স্টেশনে গিয়ে দেখবেন দুটো পঁচিশের গাড়ি ঢুকছে সবে। হয়তো শিবতোষের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবে ঝমঝম। তারপর শুরু হবে তিনটে চল্লিশের লুকোচুরি খেলা। সারা দুপুর। সারা বিকেল।

চৈত্র শেষের সূর্য পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করেছে। প্রখর উত্তাপে ঝলসে যাচ্ছে পৃথিবী। শিবতোষ রাস্তায় বেরিয়ে ছাতা খুললেন। অন্য হাতে ধরে আছেন উপহারের প্যাকেট। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছেন শিবতোষ। ধুলো উড়িয়ে গরম বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ছে গায়ে। রাস্তাঘাট প্রায় জনহীন। একা পথে হাঁটতে হাঁটতে শিবতোষ এতক্ষণ পর কেমন একটু অন্যমনস্ক যেন। কুশলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে গাঢ় এক তৃপ্তির ঘোরে ছিলেন। যেন কুশল নয়, তিনি নিজেই সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন তরতর। অনেকটা। কিন্তু এত আবেগতাড়িত হওয়ার কি দরকার ছিল? হলেনই যদি, তাহলে এমন কাঙালপনা কিসের?

শিবতোষ নিজের মনে মাথা নাড়লেন। কাঙালপনা ভাবছেন কেন? কুশল যদি নিজে থেকেই শিক্ষকের জন্য কিছু করতে চায় সে তো এক ধরনের গুরুদক্ষিণা। অত বড় পোস্টে চাকরি করেও কুশল কী নিরহঙ্কার। ভদ্র। বিনয়ী। এই বিনয়, ভদ্রতা, শিক্ষা শিবতোষরাই তো বপন করেছেন। একটু একটু করে। বিনিময়ে এটুকুও করা কি কুশলের কর্তব্য নয়?

ট্রেন লেট ছিল না। বাস পেতেও সময় লাগেনি। সাড়ে চারটের আগেই শিবতোষ কুশলের ঠিকানায় হাজির। আকাশছোঁয়া বহুতল হর্ম্যের অষ্টম তলায় কুশলের বাস। লিফটম্যান পলকের আগে শিবতোষকে পৌঁছে দিল সেখানে।

শিবতোষ বেলে হাত রাখলেন। ছুটির দিন। কুশল কি এখন বিশ্রাম নিচ্ছে? আরেকটু পরে এলে কি ভাল হত?

প্যান্ট শার্ট পরা এক কিশোর দরজা খুলেছে।

—কুশল দাশগুপ্ত আছেন?

ছেলেটি অপাঙ্গে শিবতোষকে দেখে নিল,—আসুন।

বাইরে থেকে দেখে ফ্ল্যাটের পরিমাপটা আন্দাজ করা যায় না। একটুখানি চওড়া প্যাসেজ পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরলে অতিকায় ড্রয়িংরুম। প্রায় ক্রিকেট মাঠের মতো। আগাগোড়া কাশ্মীরি কার্পেটে মোড়া। পা রাখলেই গোড়ালি ডুবে যায়। বাইরে এত প্রচণ্ড তাপ এখানে তার লেশমাত্র নেই। নীলচে আলোছায়া মাখা ঘর যান্ত্রিক মায়ায় মেরুশীতল।

চোখ ঝলসানো আলো থেকে এসে শিবতোষ প্রথমটা কিছু ভালমতো দেখতে পাচ্ছিলেন না। চোখ সয়ে আসতে সুরম্য কক্ষ উদ্ভাসিত ক্রমশ। আসবাবে বাহারে বিলাসে বৈভবে স্বর্গের বিভা।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল,—আপনার কি আসার কথা ছিল? কী নাম বলব?

শিবতোষ সপ্রতিভ হতে চাইলেন,—নাম লাগবে না। কুশলকে বলো তার মাস্টারমশাই এসেছে।

—বসুন।

শিবতোষ বসলেন না। দাঁড়িয়েই রয়েছেন। কুশলের বাবা কী চাকরি করতেন যেন? মনে নেই। তবে তেমন বড় কিছু নয়। নিতান্ত মধ্যবিত্ত মানুষ। রামরতন স্কুলে কেন তিনি ভর্তি করেছিলেন ছেলেকে? হ্যাঁ, এটা মনে পড়েছে। কুচবিহার না কোথথেকে যেন বদলি হয়ে এলেন, বছরের মাঝখানে। কোনও ভাল স্কুলে জায়গা হল না, অগত্যা শেষে রামরতন বিদ্যামন্দির। কুশলের মতো ছাত্র আরও কটা ছিল? একটা ছিল দেবাশিস! তিনটে লেটার পেয়েছিল। শিবতোষের রিটায়ামেন্টের ঠিক আগের বছর। একজন পূর্ণেন্দ! এইটিনথ্ হয়েছিল মাধ্যমিকে। উচ্চমাধ্যমিকে অন্য স্কুলে চলে গেল। আর? আর? দেবাশিস পূর্ণেন্দুরাও কি এখন কুশলের মতো সাফল্যের চূড়ায়?

একটি মেয়ে ড্রয়িংরুমে এসে দাঁড়িয়েছে। শিবতোষের বড় মেয়ের সমবয়সী প্রায়। তবে গীতালির মতো শীর্ণ নয়, চেহারায় বেশ সম্পন্ন স্বাস্থ্যের ঝলক। শিবতোষের চোখ কম আলোতে সয়ে গেছে, তিনি নিবিড় চোখে মেয়েটিকে দেখছিলেন। কাঁধ অব্দি কোঁকড়ানো চুল। কপালের দু'পাশে তরঙ্গের মতো অলকচূর্ণ। নাক চোখ কাটা কাটা। ঠোঁটে থুতনিতে আদরিণী ভাব। পরনে জাপানি কিমোনো।

পরিচয় জানার দরকার ছিল না, তবু বোকার মতো শিবতোষ প্রশ্ন করে ফেললেন, তুমি, মানে আপনি কুশলের স্ত্রী?

মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল, আমার নাম লোপামুদ্রা। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।

শিবতোষ হাসিমুখে সোফায় শরীর ডোবালেন,—আমি একটু কুশলের কাছে এসেছিলাম।

—বলুন কী দরকার?

শিবতোষ ইতস্তত করলেন, কুশল বাড়ি নেই?

—না। বেরিয়েছে একটু। অফিসের কাজে।

—ফিরতে দেরি হবে?

—হ্যাঁ। কিছু বলতে হবে? আপনি আমাকে বলে যান আমি বলে দেব।

শিবতোষ হতাশ। নিশ্বাস চেপে নিজেকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কাজের মানুষ, হঠাৎ কোনও জরুরি কাজে বেরিয়ে যেতেই পারে। এত দায়িত্বের চাকরি,

সবসময় কি কথা দিয়ে কথা রাখা যায়! এই তো, ছুটির দিনেও বেরতে হয়েছে বেচারাকে!

শিবতোষ ঢোঁক গিলে বললেন, না, এমনিই এসেছিলাম। তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে।

—তাই বুঝি? একই হাসি ধরা আছে লোপামুদ্রার ঠোঁটে।

—আপনি শরবত খাবেন? চা?

বেরনোর আগে নীলিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—ফিরছ কখন? দেখো, রাত করো না। ছাত্রর জন্য যা ব্যাকুল দশা!

মিতালি হাসছিল ফিকফিক,—রাতই হবে মা। বাবার কুশল কি বাবাকে না খাইয়ে ছাড়বে? নতুন বউমা পাবে, নাতি পাবে...

শিবতোষ সজ্ঞানে মিথ্যে কথা বললেন,—না থাক, আমি চা শরবত খাই না। তা মা তোমাদের ছেলেকে দেখছি না তো?

—দেখবেন? বুম্‌বাআআ...লোপামুদ্রা মেপে গলা ওঠাল,—বুম্‌বা একবার এদিকে এসো তো।

ডাক শুনেই ছুটে এসেছে বুম্‌বা। দেবশিশুর মতো ফুটফুটে ছেলে। একমাথা রেশমি চুল। টোপা টোপা গাল।

—এসো এসো। শিবতোষ শিশুটিকে দু'হাতে কাছে টানলেন,—তোমার ভাল নাম কী?

—ঋত্বিক দাশগুপ্ত।

—বাহ্, খুবই সুন্দর নাম। বলো তো ঋত্বিক মানে কী?

বুম্‌বা মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল তাকাল।

শিবতোষ বললেন,—ঋত্বিক মানে যজ্ঞের পুরোহিত। তুমি ঋত্বিক হতে পারবে তো? বিশাল পৃথিবীর যজ্ঞশালায়? বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন, এই নাও চকোলেট। তোমার জন্য এনেছি।

ছোট্ট ছোট্ট হাতে মিল্কি চকোলেটের প্যাকেট সাপটে ধরল বুম্‌বা, থ্যাংক ইউ।

শিবতোষ রঙিন প্যাকেট এগিয়ে দিলেন লোপামুদ্রার দিকে,—এটা তোমার জন্য মা।

লোপামুদ্রা ঈষৎ লজ্জা পেল যেন। ধন্যবাদ জানিয়ে প্যাকেট রেখে দিল কাচের টেবিলের নীচে। আলতো ভাবে বলল,—একটু অন্তত শরবত খান। কুশল ফিরে এলে কী মনে করবে...

—শরবত নয়, তুমি বরং একটু জল দাও। শিবতোষ আবারও ঢোঁক গিললেন।

—বসুন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বুম্বা এখনও বড় বড় চোখে দেখছে শিবতোষকে। একবার পিছন ঘুরে ভেতর দিকটা দেখে নিল। তারপর ফিসফিস প্রশ্ন জুড়েছে,—তুমি বুঝি বাপির মাস্টারমশাই?

—হুঁউউ। তুমি কী করে জানলে?

—বারে, বাপি তো গিয়ে মাকে বলল, আমার স্কুলের একজন টিচার এসেছে। বুম্বা শিবতোষের কানের কাছে মুখ নিয়ে এল,—তুমি বুঝি বাপিকে খুব বকো?

পাঁজরায় ধাক্কাটা শিবতোষ বহু কষ্টে সামলেছেন। বললেন,—কই, নাতো!

—তাহলে বাপি কেন মাকে বলছিল, যাও যাও, তুমি গিয়ে তাড়াতাড়ি কাটাও? আমি সামনে যাব না!

বেশি যন্ত্রণায় দুঃখবোধ মরে যায়। শিবতোষের মুখ থেকে হাসি বেরিয়ে এল। বুম্বার মতো করেই বুম্বার কানের কাছে মুখ রাখলেন, কী করছে তোমার বাপি?

—বাপি গসিপ করছে। বুম্বা দিব্যি গুছিয়ে কথা বলে,—ওই ওদিকের গেস্টরুমে। আব্রাহাম আঙ্কল আছে, রায়জ্যেঠু আছে। জানো আজ তুমি এসেছ বলে বাপি মার সঙ্গে তিন দিন পরে কথা বলল! ক্লাবে গিয়ে দুজনের খুব ঝগড়া হয়েছিল তো! রুনা আন্টিকে নিয়ে।

শিশু বকবক করে চলেছে অবিরাম। বোধহয় একটাই ধৈর্যশীল শ্রোতা পেয়ে। শিবতোষের হাসি মরে আসছিল। ছেলেটি জলের গ্লাস রেখে চলে যাচ্ছিল, অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন তাকে,—মেমসাহেবকে ডাকো। কথা আছে।

লোপামুদ্রা ফিরছে ড্রয়িংরুমে। ভুরুতে ভাঁজ তার।

শিবতোষ ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কুশলক বোলো ওর বন্ধুকে আমার পেনশনের কথা বলতে হবে না।

—বলবার কথা আছে বুঝি?

—ছিল। পরে ভেবে দেখলাম, মাস্টারমশাই-এর জন্য ওকালতি করতে যাবে, যদি কাজটা না হয়, তাতে ওরই অসম্মান। আমি কি ছাত্রের অসম্মান চাইতে পারি?

এবার সিঁড়ি ধরে নামছেন শিবতোষ। সাততলা। ছতলা। পাঁচতলা। পার্কি স্পেসে পৌঁছে হাঁপাচ্ছেন ভীষণ। ঘামে সপসপ আদ্দির পাঞ্জাবি লেপটে আছে গায়ে। কুশলের ফ্ল্যাটে ঢুকতেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে ঝাপটা মেরেছিল। গন্ধটা কি সুরার?

রাস্তায় বেরিয়ে শিবতোষের হঠাৎই কেমন গা গুলিয়ে উঠল। নর্দমার ধারে উবু হয়ে বসে হড়হড় করে বমি করে ফেললেন শিবতোষ।

ট্রেন প্রায় ফাঁকা। কামরার একেবারে শেষ প্রান্তে জানালার ধারে বসেছেন শিবতোষ। সারা বিকেল, সারা সন্ধে মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় এলোপাথাড়ি ঘুরেছেন বৃদ্ধ শিক্ষক। এবার ফেরার পালা।

শেষ বসন্তের মধুর হাওয়ায় শিবতোষের শরীর জুড়িয়ে আসছিল। মাথার ঝিমঝিম ভাব অনেক কম।

বেস ব্রিজ পার হতেই কামরা অন্ধকার হয়ে গেল। বাইরের অন্ধকার ভেতরের অন্ধকার একাকার। অকস্মাৎ চাপা গলায় কতগুলো ছেলের চিৎকার শুনলেন শিবতোষ। আঁধারেও টের পাচ্ছেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা গুটিকতক মহিলা পুরুষ আতঙ্কে শিহরিত।

শিবতোষের উলটোদিকে বসা ভদ্রলোকের মুখে টর্চ ফেলল দুটো ছেলে,—যা মালকড়ি আছে বার কর।

লোকটা ভয়ে ভয়ে মানিব্যাগ দিয়ে দিল। হাতের আংটি ঘড়ি।

সামনের দিক থেকে এক মহিলা আর্ত চিৎকার করছে,—আমি দেব না, কিছুতেই আমার গয়না দেব না।

শিবতোষের মুখের ওপর জোরালো টর্চের আলো পড়ল। জ্বলেই নিবে গেল বাতি। কর্কশ কণ্ঠ ধমকে উঠল,—আপনি কেন এ গাড়িতে স্যার? হ্যাহ্। কী ঝামেলা মাইরি। বলেই ছেলেটা ছিটকে গেছে দরজার দিকে। দু-চারটে ছেলের উত্তেজিত কথাবার্তা কানে এল শিবতোষের। স্পষ্ট বোঝা যায় না, মনে হয় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে ছেলেগুলো।

পরের স্টেশনে গাড়ির গতি কমতেই দ্রুত নেমে গেছে ছেলেগুলো। জানালা দিয়ে সামনের লোকটার, আংটি ঘড়ি পার্স ছুড়ে দিল। কটু স্বরে নোংরা গালাগাল ছুড়ল একটা,—কার মুখ দেখে উঠেছিলাম মাইরি। শালা দিনটাই নষ্ট করে দিল। ধান্দার ট্রেনে কেন যে থাকে এসব লোক!

উপস্থিত যাত্রীরা হতভম্ব। নতুন কিছু যাত্রী উঠল শেষ গাড়িটাতে।

ট্রেন ছাড়তে একটা একটা করে মুখ খুলছে,—কী দাদু? ছিনতাই পার্টি উঠেছিল?

—ধরতে পারলেন না হারামজাদাদের? যত্ত সব অ্যান্টিসোশাল!

সামনের লোকটা পার্স পকেটে ভরছে। আংটি আঙুলে গলিয়ে শিবতোষকে প্রশ্ন করল,—আপনার চেনা বুঝি?

শিবতোষ অন্ধকারে বিমল হাসলেন। পরিষ্কার স্বরে বললেন,—আমার ছাত্র। আমাকে দেখে লজ্জা পেয়েছে।

অন্ধকারে হাওয়া আরও শীতল এখন। শিবতোষ চোখ বুজলেন।

মধ্যবিত্ত

বাড়ি ফিরে ধরাচুড়ো ছাড়ছিল শুভেন্দু। বুধবারটায় বড় কাহিল দশা হয় তার। কলেজ ছুটির পর তিন ব্যাচ টিউশনি থাকে, দুটো অনার্সের ব্যাচ। শুধু নোট দিলেই হয় না, জনা পনেরো ছেলের সঙ্গে বকতেও হয় বহুক্ষণ। মাথা পুরো মহাশূন্য হয়ে যায়। তারপর মিনিট পঞ্চাশ শহরতলির ট্রেন উজিয়ে যাদবপুর, নেমে গদগদে ভিড় ঠেলে চার-পাঁচ মিনিট হাঁটা। এরপর কি আর শরীর চলে।

অর্চনা ড্রয়িংরুমে। কেবল্ টিভির সিনেমায় মগ্ন। ঝিমলির মাস্টারমশাই এসেছেন, মেয়ে পড়ছে পাশের ঘরে, শব্দ তাই কমানো আছে টিভিতে। তবু মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ বাজনা শোনা যায়, গানের কলিও।

পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে সরস্বতী। নতুন কাজের মেয়ে। রাতদিনের ফাইফরমাশ খাটার জন্য মাসখানেক হল জোগাড় করা গেছে শালীর দৌলতে। রায়দিঘি না রায়চক কোথায় যেন বাড়ি। বছর দশ-এগারো বয়স মেয়েটার, শ্যামলা রং, মুখখানি ভারি ফুটফুটে।

শুভেন্দু হ্যাংগারে শার্ট টাঙাতে টাঙাতে বলল—কীরে, কিছু বলবি?

—তুমি চা খাবে মামা?

—কে করবে? তুই?

মেয়েটা ফিক করে হাসল,—আমি চা করতে শিখে গেছি।

—বাহ্, তুই তো খুব কাজের হয়ে গেলি রে!

—আমি গ্যাস জ্বালানোও শিখে গেছি। নেবাতেও পারি।

সরস্বতীর লাজুক উচ্ছ্বাসে মজা পেল শুভেন্দু। দিব্যি বুলি ফুটে গেছে মেয়েটার।

মনে হচ্ছে এবার অর্চনার কপাল ভাল, মেয়েটা বোধহয় টিকেই গেল। ওফ্, প্রথম কদিন এই মেয়ে নিয়েও যা ভোগান্তি গেছে। সকাল নেই, সন্ধে নেই—সারাক্ষণ দরজার আড়ালে গিয়ে ফ্যাচফ্যাচ কান্না। খেতে দিলে কাঁদে, শুতে বললে কাঁদে, টিভি দেখতে ডাকলেও কাঁদে, সে এক যমযন্ত্রণা! অর্চনা তো এক সময়ে ঠিকই করে ফেলেছিল মেজদির বাড়িতে ফিরিয়েই দিয়ে আসবে সরস্বতীকে। যার নাড়িছেঁড়া ধন সে এসে বাবা ফেরত নিয়ে যাক দেশে। সুখের চেয়ে স্বাস্ত ভাল।

নাহ্, শহরের জলবাতাসের গুণ আছে।

শুভেন্দু আলগোছে ঘড়ি দেখল। নটা বাজতে দশ। দশটার টিভি সিরিয়াল শেষ না হলে খেতে বসা হবে না। এখন এক কাপ চা খাওয়াই যায়। স্মিতমুখে বলল,—ঠিক আছে কর্। দেখিস্ গ্যাস সাবধানে জ্বালাস্।

সরস্বতী প্রায় উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছিল, কী মনে করে তাকে ডাকল শুভেন্দু। বলল,—দিদির মাস্টারমশাইকে জলখাবার দেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ। মামি অফিস থেকে ফেরার সময়ে মিষ্টি এনেছিল।

মিষ্টি! বেয়াল্লিশ বছরের অল্প ভুঁড়ি হওয়া পেটে আল্‌গা হাত বোলাল শুভেন্দু। এক মুহূর্ত ভেবে বলল,—হ্যাঁরে সরস্বতী, তুই ওমলেট বানাতে পারিস্?

—ওমলেট!

—হ্যাঁ-আ—ডিমভাজা!

বোকা বোকা মুখে দু'দিকে ঘাড় নাড়ল সরস্বতী।

—এত সিম্পল কাজটা এখনও শিখিসনি! শুভেন্দুর মুখে আফসোসের শব্দ,...খুব সোজা রে। ডিমটাকে ফাটিয়ে...গুলে...একটু নুন দিয়ে ভাজতে হয়। সস্‌প্যানে এক চিমটি তেল দিয়ে নিবি, তেল গরম হলে ডিম ছাড়বি...সঙ্গে একটু পেঁয়াজকুচি লঙ্কাকুচিও দিতে পারিস্...না দিলেও চলে...

সরস্বতী মন দিয়ে শুনছে, কিন্তু কিছু বুঝছে বলে মনে হয় না। শুভেন্দু হেসে ফেলল,—থাক, তুই আমাকে বরং দুটো বিস্কুট দিস্।

—মিস্টি বিস্কুট না নোন্তা বিস্কুট?

—নোনতা।

সরস্বতী চলে যাচ্ছিল, আবার তাকে ডেকেছে শুভেন্দু,—আমার তোয়ালেটা ওই বাথরুমে আছে তো রে?

এক পলক ভেবে সরস্বতী বলল,—না তো! যমুনামাসি কেচে দিয়েছিল, বারান্দায় শুকোতে দিয়েছি। এনে দেব?

—উঁহু। চা করার আগে ওটা একটু বাথরুমে রেখে দিয়ে যা, কেমন?

নব্বই ডিগ্রি ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল সরস্বতী।

বৈশাখ চলছে। প্রখর বৈশাখ। রাত নটাতেও দিনের তাত মরেনি। শুভেন্দুর গা হাত পা চিটপিট করছিল। ক'দিন ধরে হিউমিডিটিও বেড়েছে বটে, পাখার হাওয়াও গায়ে লাগে না। সারাক্ষণ বিজবিজে ঘাম। প্রতি গ্রীষ্মে নিয়ম করে ঘামাচি বেরোয় শুভেন্দুর, চুলকে চুলকে গা লাল হয়ে যায়। ভাগ্য ভাল, এ বছর আক্রমণটা শুরু হয়নি।

শুভেন্দু স্নানে গেল।

বছর তিনেক হল ফ্ল্যাটটা কেনা হয়েছে। বড় নয়, আবার খুব ছোটও নয়, মাঝারি মাপের। সিঁড়ি প্যাসেজ সব ধরে সাতশো ষাট। টু রুম ড্রয়িং ডাইনিং। তিনজনের সংসারে এর বেশি আর কী লাগে! ঘর দুটো মোটামুটি বড়ই। বাপ মার তেরো বারো, মেয়ের বারো-বারো। বসার জায়গাটা নিয়ে একটু মন-খুঁতখুঁত আছে অর্চনার, আরেকটু ছড়ানো হলে যেন ভাল হত। তা সব কি আর মনের মতো হয়! ডাইনিং স্পেস্‌টা বেশ কায়দার—এল্‌ শেপের। বসার জায়গা থেকে খাবার টেবিল দেখা যায় না, বাড়ির একটা আব্রু থাকে। ব্যালকনিটাও যথেষ্ট চওড়া, লাইন দিয়ে সেখানে টব রেখেছে অর্চনা। বাথরুম দুটো। শুভেন্দুর ঘরের লাগোয়াটা বড্ড ছোট, তৃপ্তি করে স্নান করা যায় না—রাতবিরেতে শুধু কাজে লাগে। মাথার ওপর শাওয়ার থেকে বৃষ্টিধারা ঝরবে, হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিটি রোমকূপে শুষে নেওয়া যাবে জলকণা, তবেই না সুখ।

স্নানের পর ঘাড়ে গলায় হালকা পাউডার থুপে অর্চনার পাশে এসে বসল শুভেন্দু। নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল,—মাস্টারমশাই আজ কখন এসেছেন?

রঙিন পর্দায় বিরহের দৃশ্য চলছে। মহীশূরের বৃন্দাবন গার্ডেনে গান গেয়ে গেয়ে কাঁদছে নায়িকা, একই গানের পরের লাইন মুম্বই-এর জুহু বিচে বসে গাইছে নায়ক, যুগল অশ্রুতে পর্দা প্রায় ভিজে যায়-যায়।

অর্চনা বিরহ থেকে চোখ সরাল না, বলল,—পৌনে আটটা।

—অনেকক্ষণ পড়াচ্ছেন তো আজ?

—দেড় ঘণ্টা তো পড়ানোরই কথা!

—হুম, তা ঠিক। তবে এই তো সবে নতুন ক্লাস শুরু হল...

অর্চনা ঘুরে তাকাল,—ঝিমলির এখন ক্লাস নাইন, স্যার। গোড়ার দিকে লুজ্‌ দিলে পুরো মাধ্যমিক ঝরঝরে হয়ে যাবে।

সরস্বতী চা-বিস্কুট নিয়ে এসেছে। কাচবসানো বেতের সেণ্টার টেবিলে কাপ প্লেট রাখল সাবধানে।

অর্চনা ভুরু কোঁচকাল,—কীরে, মামাকেই শুধু চা দিলি? আমাকে দিবি না?

ছোট্ট করে হাসল সরস্বতী,—তোমারও করেছি। আনছি।

চা খাচ্ছে দু'জনে। সরস্বতী টিভির একদম সামনেটায় গিয়ে বসল মেঝেতে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে আছে পর্দার দিকে। চোখ স্থির।

পিছন থেকে শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলল—কী দেখছিস রে সরস্বতী?

—টিবি।

—টিভি তো বুঝলাম, টিভিতে কী দেখছিস্?

সরস্বতী শরীর মোচড়াল,—টিবি।

হাহা হেসে উঠল শুভেন্দু। অর্চনা বলল,—খুব টিভি দেখার নেশা হয়েছে মেয়ের!

শুভেন্দু বলল,—বেশ চাম্পুও হয়ে উঠেছে।

—কীরকম?

—দেখলে না, বলতে হল না, ঠিক দু'কাপ চা করে ফেলেছে! বুঝে গেছে মামা চা খেলেই মামি খাবে।

—অথবা মামি খেলে মামা! অর্চনা ঠোঁট টিপে হাসল,—এসব দেখতে তো ভাল লাগে, শেখাতে কম পরিশ্রম করতে হয়!

শুভেন্দু ফুট কাটল,—সে তো পরিশ্রম হাল্‌কা করার জন্য পরিশ্রম!

—তাই একটু চেষ্টা করে দ্যাখো না, বুঝবে গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা কত কঠিন!

—হয়ে যাবে। এক মাসে যথেষ্ট প্রগ্রেস হয়েছে।

—এক মাসে মেয়েটার চেহারাটাও কত চকচকে হয়ে গেছে, দেখেছ?

—হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। পেটভরে খেতে পাচ্ছে, ভালমন্দ খাওয়া...তেল মাখছে, সাবান মাখছে...। দেশে কি আর এসব জুটত?

—মেজদি বলছিল, পরের বোনটাকেও নাকি ওর মা কাজে লাগিয়ে দেবে। একটা ভাল বাড়ি খুঁজছে।

—ভাবো একবার! কতটা হেলপ্‌লেস্ অবস্থায় পড়লে একটা মা তার বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের লোকের বাড়ি খাটার জন্য পাঠায়! চা শেষ করে শুভেন্দু সিগারেট খুঁজছে। ডাকল সরস্বতীকে,—অ্যাই, ঘর থেকে আমার সিগারেট-দেশলাইটা এনে দে তো!

দৌড়ে ঘর থেকে সিগারেট-দেশলাই এনে দিল সরস্বতী।

অর্চনা বলল—যা, কাপডিশগুলো নিয়ে যা, ধুয়ে রাখ্। দেখিস্ বাবা, ভাঙিস্ না।

অতি সন্তর্পণে কাপডিশ নিয়ে চলে যাচ্ছে সরস্বতী. সেদিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরাল শুভেন্দু। ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—তোমাকে বলি না মাঝে মাঝে, আমরা হলাম গিয়ে প্রিভিলেজড্ ক্লাস! সুন্দর ফ্ল্যাটট্যাট হাঁকিয়ে বসে আছি, মেয়েকে নামী স্কুলে পড়াচ্ছি, বছরে দু'বার পুরী সিমলা ঘুরছি...আমাদের একটা মেয়ের পেছনে খরচা কত বলো? হাজারের ওপর! আর এই মেয়ে, অ্যাট দিস্ টেন্ডার এজ, আর্নিং ফর দ্য ফ্যামিলি! এই যে ডিস্ক্রিপেন্সিটা তৈরি হচ্ছে, এটা কি সোসাইটির পক্ষে ভাল? কোনও সমাজ এভাবে টিকতে পারে না।

—এর জন্য দায়ী আমাদের ইকনমিক সিস্টেম।

—ইকনমিক সিস্টেমই বলো, আর পলিটিকাল সিস্টেমই বলো—সব একদিন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে যাবে। দেশের এইট্টি পারসেন্ট লোক পভারটি লাইনের নীচে থাকবে, আর কুড়ি পারসেন্ট লোক বসে বসে পোলাও মাংস খাবে—এটা কোন কাজের কথা?

ঝিমলির মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন। মাস্টারমশাইকে এগিয়ে দিয়ে তড়াং করে টিভির সামনে এসেছে ঝিমলি—ইশ, তোমরা চ্যানেল ঘোরাওনি এখনও? আদ্যিকালের একটা ফিল্ম্ দেখছ বসে বসে? বলেই টক টক সেন্টার ঘোরাচ্ছে। মনোরম এক শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে এসে থামল—এক্ষুনি এখানে সিরিয়ালটা শুরু হবে!

অর্চনা হাঁক দিল—সরস্বতী, ফ্রিজ থেকে তরকারিগুলো বার করে ফ্যাল্।

রান্নাঘর থেকে মিহি গলায় উত্তর এল, রেখেছি মামি।

—গুড। যখন বলব, তখন খাবার গরম করে ফেলবি।

ঝিমলি শুভেন্দুর পাশে এসে বসেছে।

শুভেন্দু মেয়ের চুল ঘেঁটে দিল—পড়তে-পড়তেও তোর মাথায় সিরিয়াল ঘোরে নাকি?

—এই সিরিয়ালটা খুব ভাল বাবা। কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। ঝিমলি পা দোলাচ্ছে,—জানো বাবা, আমাদের স্কুলে একটা নতুন প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। লিটেরেসি ক্যাম্পেন।

—বাহ্ এ তো খুব ভাল জিনিস!

—আমাদের মটো হয়েছে ইচ্ ওয়ান টিচ্ ওয়ান।

—তুই স্টুডেন্ট পাবি কোথায়? সাঁড়াশি নিয়ে ধরতে বেরোবি?

হাসিতে লুটিয়ে পড়ল ঝিমলি,—ওমা, তা কেন! আমার তো কত সুবিধে। স্টুডেন্ট ঘরেই রয়েছে। সরস্বতী অ আ ক খ কিচ্ছু জানে না—ওকেই পড়াব।

অর্চনা প্রশ্ন করল,—এর জন্য তোদের নম্বর আছে?

—না, নম্বর নেই। তবে স্কুল থেকে একটা সার্টিফিকেট দেবে।

অর্চনা সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল,—স্কুল কী করে বুঝবে তুই সত্যি সত্যি পড়িয়েছিস্?

—আমাকে প্রুফ দিতে হবে। সরস্বতী লিটারেট হয়ে গেলে স্কুলে নিয়ে গিয়ে ওকে দেখাতে হবে, স্কুল ওর পরীক্ষা নেবে। বলতে বলতে গলা তুলেছে ঝিমলি,—অ্যাই সরস্বতী, এদিকে শুনে যা!

সরস্বতী গুটি গুটি পায়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

ঝিমলি বলল,—কীরে, তোর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে না?

সরস্বতী ঘাড় নাড়ল।

—কাল থেকেই কিন্তু পড়তে বসতে হবে।

আবার ঢক করে ঘাড় নাড়ল সরস্বতী।

ঝিমলি বলল,—বাবা, আমাকে কাল কিছু টাকা দিও তো। ওর জন্য কয়েকটা এলিমেন্ট্রি বই কিনতে হবে।

স্লেট পেনসিল খাতাও।

মেয়ের কথা শুনতে শুনতে মুগ্ধ হচ্ছিল শুভেন্দু। গর্বিত দৃষ্টিতে অর্চনার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল এই না হলে আমার মেয়ে! নগণ্য ওই গরীব মেয়েটাকে লেখাপড়া শেখানোর কথা মনে এসেছে ঝিমলির, এর থেকেই বোঝা যায় ঝিমলির মধ্যে মানবিক গুণের বিকাশ হচ্ছে ঠিক ঠিক।

দরাজ গলায় শুভেন্দু বলল,—কত টাকা লাগবে তোর, নিয়ে নিস!

দুই

খাতার ডাঁই নিয়ে বসেছে শুভেন্দু। বি এ পরীক্ষার খাতা। গরমের ছুটির মধ্যেই ইউনিভার্সিটি পাঠিয়ে দিয়েছিল, এখনও দেখা হয়ে ওঠেনি। হেড এগ্‌জামিনার তাড়া লাগাচ্ছেন, সামনের সপ্তাহের মধ্যেই খাতা জমা দিতে হবে। তিনশো খাতার জঙ্গল সাফ করতে তিন দিন কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছে শুভেন্দু।

একগোছা খাতা শেষ করে শুভেন্দু আড়মোড়া ভাঙল একটা। ঘড়ি দেখল। চারটে পনেরো। তার মানে দুপুরের ঘুম দিয়ে উঠে এক ঘণ্টায় মাত্র সাতটা খাতা দেখা হল। খুবই মন্দ গতি। এভাবে চললে পরশুর মধ্যে এই পাহাড় নামবে? মনে হয় না!

আরেকটা বাণ্ডিল খুলল শুভেন্দু। চালশে চশমা খুলে বাইরের দিকে তাকাল। বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই, ঝমঝম্ ঝমঝম্। আষাঢ় মাসটা শুখা গিয়ে এবার গোটা বর্ষা যেন শ্রাবণে এসে চাক বেঁধেছে। বিকেল হলেই এখন ঘন আঁধার, তাকালেই মাথা ধরে যায়।

চশমা আবার চোখে লাগিয়ে শুভেন্দু খাতায় ঝুঁকল। একটা হাঁকও পাড়ল সঙ্গে সঙ্গে,—সরস্বতী, অ্যাই সরস্বতী? কীরে, আমায় চা দিবি না?

চিকন গলার জবাব ভেসে এল,—দিচ্ছি মামা। এই অঙ্কটা করে নিই।

খাতায় লাল পেনসিল চালাতে চালাতে শুভেন্দু চেঁচাল,—পাঁচ মিনিট পরে অঙ্ক কষলে তোমার মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আগে আমায় চা দাও।

তিন মিনিটে চা এসে গেল। খাটের পাশে চা রেখে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে সরস্বতী, দেখছে মামাকে।

খাতার ওপর চশমা রেখে শুভেন্দু চায়ে চুমুক দিল। হাল্‌কা গলায় জিজ্ঞাসা করল,—কি দেখছিস রে?

ঝট করে খাতায় বসানো নম্বরের দিকে আঙুল দেখাল সরস্বতী। শুভেন্দু হাসল,—পড়তে পারিস্‌ ওটা? বল্‌ তো কত?

—সেভেন।

ঝিমলির বাংলা ভাল আসে না, সব কিছুই ইংরেজিতে শেখাচ্ছে। ভাল, রায়দিঘির মেয়ে কনভেন্টে এডুকেশান পাচ্ছে।

শুভেন্দু আরেকটা নম্বরের দিকে আঙুল দেখাল,—এটা কত?

—সিক্স।

শুভেন্দু পরীক্ষকের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল,—দুটো যোগ করলে কত হয়?

—সেভেন প্লাস্‌ সিক্স? মাথা চুলকোতে চুলকোতে কড় গুনছে সরস্বতী। ভীতু মুখে বলল,—থার্টিন।

—তুই তো যোগ শিখে ফেলেছিস রে।

সরস্বতী অধোবদন।

শুভেন্দু মুহূর্তের জন্য ভাবল, মেয়েটাকে দিয়ে পরীক্ষার খাতার নম্বর যোগ করিয়ে নিলে কেমন হয়! নিজেরও সময় বাঁচবে, মেয়েটাও যোগে আরও পক্ক হয়ে উঠবে! ঝিমলি মেয়েটার পিছনে খাটছে খুব, মেয়েটারও বেশ মাথা আছে, শুভেন্দুরও কি ঝিমলিকে একটু সাহায্য করা উচিত নয়। থাক, বেশি ভুলভাল করলে খাতা স্ক্রুটিনির সময়ে কথা উঠবে।

কাপ প্লেট মেয়েটার হাতে দিয়ে শুভেন্দু বলল,—তুই কিন্তু কাজে গণ্ডগোল করে ফেলছিস্‌ সরস্বতী!

—কেন মামা?

—বলেছি না তোকে খাতা দেখার সময়ে আমার ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা চাই! আমি কখন ঘুম থেকে উঠেছি?

সরস্বতী আবার অধোবদন।

—ঘড়ি দেখে রাখ্। ঠিক আবার এক ঘণ্টা পর।

ঘড়ি দেখানোটা অর্চনা শিখিয়েছে! দেওয়ালের কোয়ার্টজ্ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সরস্বতী বলল,—এখন চারটে পঁচিশ। তার মানে আবার পাঁচটা পঁচিশে চা খাবে, তাই তো?

—ইয়েস। সাড়ে পাঁচটা যেন না হয়।

ঘাড় হেলিয়ে চলে যাচ্ছিল সরস্বতী, ডাকল শুভেন্দু,—অ্যাই, তুই আমাকে বিকেলে জলখাবার খাওয়াবি না?

—দিদি ইস্কুল থেকে আসুক, দইচিঁড়ে মেখে দেব।

—অ্যাহ্, দইচিঁড়ে! শুভেন্দু সিগারেট ধরাল,—আর কিছু নেই ঘরে?

—ফেনচ টোস্ট খাবে মামা? সরস্বতীর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—ওই যে ডিমে ডুবিয়ে পাঁউরুটি ভাজে...আমি শিখে গেছি।

শুভেন্দু বিস্মিত চোখে দেখল সরস্বতীকে। ভুরু নাচাল,—তোকে তো কালটিভেট করতে হচ্ছে রে! আর কী শিখেছিস্?

সরস্বতী লজ্জায় নুয়ে গেছে। শরীর মুচড়োতে মুচড়োতে একের পর এক তার শিক্ষার বর্ণনা করে চলেছে। সে এখন ডাল সাঁতলাতে পারে, বেগুন পোড়াতে পারে, এ থেকে জেড্ অব্দি লিখতে পারে, পেঁয়াজকুচি আর পোস্তদানা দিয়ে আলুসেদ্ধ মাখতে পারে, ওয়ান থেকে হানড্রেড গুনতে পারে, রুটি সেঁকতে পারে, যোগ করতে পারে, আলু পটল ডিম মাছ সব ভাজতে পারে, আ'কার ইকার উকার পড়তে পারে, মামি যেখানে যা সাজিয়ে রাখে সেরকমটি বজায় রেখে ঝাড়াঝুড়ি করতে পারে। শুধু এখনও সে ঝোল তরকারিটা রাঁধতে পারে না, যুক্তাক্ষর পড়তে পারে না, বিয়োগটা করতে শেখেনি, এই যা!

ফিরিস্তি শুনে শুভেন্দু থ। মাত্র তিন মাসে এত উন্নতি! শিক্ষার সুযোগ পেলে এই সব মেয়েও কী তরতর করে এগোতে পারে! টিউটরের তো গুণ আছেই, তবে এই মেয়ের নেওয়ার ক্ষমতাও কম নয়!

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বলল,—এমন দিনে কী খেতে ভাল লাগে জানিস? মুড়ি আর গরম গরম তেলেভাজা—আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজি...

সরস্বতীর মুখ শুকিয়ে গেল। নত মুখে বলল,—আমি তো ওগুলো শিখিনি মামা।

—দূর, তুই ভাজবি কেন? দোকান থেকে কিনে আনবি। চিনিস্ দোকান?

—হ্যাঁ, ওই তো চায়ের দোকানের পাশে ভাজে। নিয়ে আসব?

—গুছিয়ে আনতে পারবি তো? সেদিন আমার সিগারেট আনতে গিয়ে কুড়ি পয়সা কম এনেছিলি!

—দাও না তুমি, আমি ঠিক পারব।

রান্নাঘরে কাপডিশ রেখে দৌড়ে ফিরে এসেছে সরস্বতী। মন দিয়ে শুভেন্দুর অর্ডার নোট করে নিল মস্তিষ্কে, তারপর ছাতা নিয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে গেল।

শুভেন্দু সরস্বতীয় যাওয়াটা দেখছিল। ঝিমলির পুরনো একটা ছোট হয়ে যাওয়া সালোয়ার কামিজ পরেছে মেয়েটা, পিছন থেকে কী বড়সড়টাই না লাগছে! কে বলবে মাস চারেক আগেও এই মেয়ে অপুষ্টিতে শীর্ণ প্যাংলাসে মেরে ছিল।

পল্‌কা গর্ব নিয়ে চোখে চশমা লাগাল শুভেন্দু, ডুবল খাতায়। উফ্, এখনও এত পাহাড়! পাসকোর্সের তো খাতা, চোখ বোলাতে বোলাতে গড় বসিয়ে যাবে নাকি! খাতা দেখতে ইউনিভার্সিটি যা টাকা দেয়, এক ব্যাচ অনার্স পড়ালে এক মাসে সেই টাকা চলে আসে। তার ওপর ইউনিভার্সিটির ধারে কারবার, ছাত্ররা দেয় নগদ। এত পরিশ্রমের কোনও মানে হয়!

একটা খাতাও পুরো দেখা হল না, হুটোপুটি করে এসে গেছে ঝিমলি। সর্বাঙ্গ বর্ষাতিতে মোড়া, মাথায় ঘোমটাটুপি। জল ঝরছে অঝোরে।

টুপি রেন্‌কোট খুলে খাবার টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিল ঝিমলি। চেঁচাচ্ছে,—বাবা, তুমি এখন সরস্বতীকে দোকানে পাঠালে?

—কেন, কী হয়েছে তাতে?

—ওর এখনও অঙ্ক শেষ হয়নি!

—ফিরে এসে করবে।

—বারে, তাহলে আজকের টাস্ক দেব কখন?

—সন্ধেবেলা দিস্।

—সন্ধেবেলা ওকে ইংলিশ পড়তে হবে। স্পেলিং শেখাচ্ছি এখন। ঝিমলির স্বরে বিরক্তি,—উফ্, তুমি যে কী করো না! এভাবে পড়লে ওর পড়াশুনো এগোবে?

শুভেন্দু একটা আহত হল। গম্ভীর স্বরে বলল,—যথেষ্ট পড়ছে। তুমি ওকে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। তোমার নিজের ক্লাস টেস্টের নম্বর কম হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল আছে?

বিস্মিত মুখে দরজায় এল ঝিমলি,—সে তো আমার জ্বর হয়েছিল, তাই।

—এর আগেও তুমি জ্বর নিয়ে এর থেকে ভাল টেস্ট দিয়েছ। শুভেন্দু একটু নরম হল,—ওকে নিজের মতো করে পড়তে দাও। ও এখনই যা শিখেছে, ওদের ফ্যামিলিতে ক'জন তা শেখে!

—চান্স পায় না, তাই শিখতে পারে না।

—কেন চান্স পায় না?

—গরীব বলে।

—ইয়েস। ওই কথাটি মাথায় রেখো। ওদের খেটে খেতে হয়। শুয়ে বসে পড়াশুনোর মতো লাক্সারি অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা ওদের নেই।

—কেন নেই বাবা?

—এ তো অনেক জটিল সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপার। তুমি বুঝবে না।

—বুঝিয়ে বলো।

শুভেন্দু লেকচারের ঢঙে গলা ঝাড়ল,—এই সমজে দু'ধরনের মানুষ আছে। এক দল হল শোষক, আর এক দল হল শোষিত। যারা শোষক তারা শুধু শোষিতদের রক্ত চুষছে। এই সরস্বতী বা ওদের মতো যারা আছে, তারা সব হল শোষিত ক্লাস।

ঝিমলির মুখে যেন ছায়া পড়ল। উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল,—শোষক কারা বাবা? আমরা?

—দূর, আমরা কেন হতে যাব! শুভেন্দু হোঁচট খেল,—তারা হচ্ছে ভীষণ বড়লোক, তাদের চোখে দেখা যায় না। আমরা হচ্ছি পেটি মিডল্ ক্লাস—মধ্যবিত্ত।

ঝিমলি বুঝি নিশ্চিন্ত হল খানিকটা। হাসিমুখে বলল—তাহলে ওদের শিক্ষিত করতে আমাদের অসুবিধে কোথায়?

—ওভাবে হয় না রে। এর জন্য বিপ্লব দরকার। রেভলিউশন। তখন সব কিছু বদলে যাবে। শুভেন্দু আঙুল তুলল,—ভিজে জুতো পরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে। যা, জামাকাপড় বদলে আয়. সরস্বতী গরম গরম তেলেভাজা আনছে, যা জমবে না বিকেলটা...!

ঠোঙাভর্তি তেলেভাজা নিয়ে ফিরল সরস্বতী। সর্ষের তেল দিয়ে পরিপাটি করে মুড়ি মাখল, শুভেন্দুর পছন্দমতো পেঁয়াজ শশা কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দিল মুড়িতে। রান্নাঘরের শিশিতে বাদাম থাকে, খোসা ছাড়িয়ে বাদামও মিশিয়ে দিয়েছে।

ঝিমলি সোফায় বসে মুড়ি তেলেভাজা খাচ্ছে, সরস্বতী ঠোঙা নিয়ে বসেছে তার পায়ের কাছে। অঙ্ক কষছে।

শুভেন্দুর খাতা দেখায় মন বসছিল না। একটা দুটো মুড়ি ছুঁড়ছে মুখে। বুকে কী যেন একটা খচখচ করছিল শুভেন্দুর। বুকে না মস্তিষ্কে? আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। সরস্বতীকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না। তিতকুটে মেজাজে খাতা দেখতে গিয়ে তিন-তিনটে ছেলে ফেল করে গেল। কী যে সব লেখে

ছাইপাঁশ! ইতিহাসের একটা বেসিক সেন্স পর্যন্ত নেই! কোন্ কলেজের খাতা কে জানে?

ঘোর বর্ষায় সিক্ত হয়ে ফিরল অর্চনা। বাজপাখির চোখে জরিপ করল ঘরদোর, সরস্বতীকে দিয়ে শুকনো জামাকাপড় আনাল ঘর থেকে, পোশাক বদলে বাথরুম থেকে মাথা মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল। বর্ষা তার ভারী পছন্দের ঋতু, পাখির মেজাজে বসল শুভেন্দুর পাশে। লঘু স্বরে বলল—কিগো, তোমার আর কদ্দূর?

পাশে পড়ে থাকা বাণ্ডিল টেরচা চোখে দেখে নিল শুভেন্দু,—শ'দুই হবে।

—কেন যে আগে থেকে দ্যাখো না! রোজ দশ-বিশটা করে দেখলেও তো চাপ অনেক কমে যায়!

শুভেন্দু বলতে পারত, কলেজ টিউশনি সেরে এসে শরীরে শক্তি থাকে না। বলল না। পাল্টা প্রশ্ন করল—চেকটা জমা করেছ? হাউসবিল্ডিং লোনের?

অর্চনা চিরুনি বোলাচ্ছে মাথায়—না, আজ দেওয়া হয়নি। অফিসে কাজ ছিল। লোকজনও আজ কম এসেছিল...

—এ কি ইরেসপন্সিবিলিটি! শুভেন্দু হঠাৎ তেতে গেল—আজ লাস্ট ডেট ছিল না? এরপর ওরা যদি এক্সট্রা ইণ্টারেস্ট চার্জ করে?

—বারে, আমার একদিন অফিসে কাজ থাকতে পারে না? বলছি তো কাল দিয়ে দেব!

—সরকারি অফিসে আর কাজ দেখিয়ো না। পাঁচ মিনিটের জন্য বেরোবে, অফিস থেকে পাঁচ পা গিয়ে চেকটা দিয়ে আসবে, তাতেও গড়িমসি! তোমাকে দায়িত্ব দেওয়াটাই ভুল হয়েছে!

—নিজে গেলেই পারতে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ না ফুলিয়ে তাও একটা সংসারের কাজ হত।

নাকের পাটা ফুলে গেল শুভেন্দুর। আরেকটা ছেলে উনত্রিশে আটকে গেল। পাশের খাতার স্তূপ দেখিয়ে বলল, ঘুমোচ্ছিলাম! তাহলে এত খাতা শেষ করল কে? ছুটি কি আমি মুখ দেখতে নিয়েছি?

—ন্যাকামোর কথা বলো না। ন মাস তো ছুটিই থাকে, তার ওপর আবার খাতা দেখার বাহানায় ছুটি নেওয়ার ঢঙ্। খাতা তো ফেলে দিয়ে গেছে সামারে, অ্যাদ্দিন বসে বসে আঙুল চুষছিলে কেন?

অনেক জবাবই ঠোঁটের ডগায় ছিল শুভেন্দুর। অর্ধেক গ্রীষ্মের ছুটি তো তার মেয়ে বউ নিয়ে নৈনিতাল আলমোড়া কৌশানি রাণীক্ষেত ঘুরতে ঘুরতেই কেটে গেল! তারপরও কম ফ্যাচাং গেছে! দাদার মেয়ের পাকা দেখা। ছোট শালার

জন্য পাত্রী দেখতে দুর্গাপুর ছোটা। অর্চনার তলপেটে একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়নো—এই টেস্ট, ওই টেস্ট। এগুলো কি কাজ নয়? ছুটি না পচিয়ে, তার বদলে তিনটে দিন প্রাপ্য সি এল নিয়ে এই বিশাল জঞ্জাল সাফ করছে শুভেন্দু, তাতেও অর্চনার গাত্রদাহ?

শুভেন্দু হুঙ্কার দিয়ে উঠল—অ্যাই সরস্বতী...

পড়িমরি করে ছুটে এসেছে মেয়েটা। সভয়ে দেখছে মামা-মামিকে।

শুভেন্দু কড়া গলায় বলল—আমাকে আবার কটার সময়ে চা দেওয়ার কথা ছিল?

ঘড়ি দেখে মাথা নামাল সরস্বতী—ভুল হয়ে গেছে মামা। দিদি বলল, আগে অঙ্ক করে দেখাতে...

—অঙ্কের নিকুচি করেছে। যাও, চা করো গিয়ে। মামি অফিস থেকে ফিরেছে, তাকে কে জলখাবার দেবে, অ্যাঁ?

ঘাড় ঝুলিয়ে চলে গেল সরস্বতী। পিছন পিছন অর্চনাও রান্নাঘরে গেছে, রাত্রের আটা মাখা হয়নি বলে সেও খুব বকছে মেয়েটাকে। শুভেন্দু শুনতে পাচ্ছিল।

আবার খাতা দেখায় মন দিল শুভেন্দু। হঠাৎই কিসের ছায়া পড়ল গায়ে! অথবা পড়ল না, শুভেন্দুর মনে হল পড়ছে।

শুভেন্দু চমকে তাকাল। দরজায় ঝিমলি। কেমন একটা চোখে যেন দেখছে বাবাকে!

দু চোখের ভর্ৎসনাতে কী বলতে চায় ঝিমলি!

তিন

পুজোর ছুটির পর সবে কলেজ খুলেছে। কলেজ কোচিং সেরে শুভেন্দু বাড়ি ফিরে দেখল অর্চনা মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে ড্রয়িংরুমে। টিভি বন্ধ। ঝিমলি মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়ছে। সরস্বতীকে দেখা যায় রান্নাঘরে।

শুভেন্দুর মেজাজটা বেশ শরিফ আজ, চার মাসের এরিয়ার ডি এ করকরে তেরোশো টাকা হাতে পেয়েছে। ইউনিভার্সিটির রেজাল্টও বেরিয়েছে কাল, শুভেন্দুর প্রাইভেটের সব কটা ছেলেই ভালভাবে অনার্স পেয়ে গেছে। কলেজের রেজাল্ট অবশ্য তেমন ভাল নয়, কী আর করা যাবে! একে যৌথ দায়িত্ব, তায় এত ছুটিছাটা, কলেজে সিলেবাস শেষ করাই বড় কঠিন!

খুশি খুশি মেজাজে শুভেন্দু প্রশ্ন করল—অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছ কেন? অফিসে আজ লাল দাগ খেয়েছ নাকি?

আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে অর্চনা, শুভেন্দুর পিছু পিছু ঘরে উঠে এল। ভার গলায় বলল—একটা বিপদ হয়েছে।

—বিপদ! কী বিপদ? শুভেন্দু ঝটিতি চিন্তা করার চেষ্টা করল। অর্চনার অফিসে মাঝে একবার ট্রান্সফারের ধুয়ো উঠেছিল, সেটাই ঘটে গেল নাকি? তাহলে তো আবার লোকজনকে ধরতে হয়। রাইটার্সে শুভেন্দুর এক স্কুলের বন্ধু এখন ডেপুটি সেক্রেটারি, তার কাছেই...।

অর্চনা কথা বলছে না, গুম হয়ে খাটের প্রান্তে বসেছে। শুভেন্দু বলল—বিপদটা কী বলবে তো?

অর্চনা হঠাৎ খিঁচিয়ে উঠল—আরও মেয়েকে আহ্লাদ দাও!

—ঝিমলি! শুভেন্দু আরও চিন্তায় পড়ল—ঝিমলি কী করল...

—কী করেনি? আজ সরস্বতীকে নিজের স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, সাক্ষরতা প্রকল্প কেমন চলছে তা দেখাতে।

—তো?

—তোমার সরস্বতী সেখানে নিজের প্রতিভা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে। গরীবদের মধ্যে এমন ব্রিলিয়ান্ট মেয়ে নাকি আগে আন্টিরা দেখেনি!

শুভেন্দু ফ্যালফ্যাল তাকাল—এতে বিপদের কী হল? ঝিমলি ওকে পড়িয়েছে, এ তো ঝিমলিরই ক্রেডিট।

—এটুকু হলে তো কথা ছিল না। তোমার মেয়ে এখন প্ল্যান করেছে সরস্বতীকে স্কুলে ভর্তি করবে। ওদের স্কুলের মিশনারিরা গরীবদের জন্য সন্ধেবেলা কী এক ফ্রি এডুকেশান সেন্টার করেছে, সেখানে পড়তে পাঠাবে সরস্বতীকে। শুনে সরস্বতীও লাফাচ্ছে—ও মামি, আমি পড়াশুনো শিখব! আমি একবার শুধু সংসারের অসুবিধের কথা বলতে গেছিলাম, ঝিমলির কী মেজাজ! সরস্বতীর যখন অত ব্রেন, ওকে দিয়ে আর সংসারের কাজ করানো চলবে না!

শুভেন্দু বলল—বাহ্, তাহলে সংসারের কাজটা করবে কে?

—তোমার মেয়ে অত বুঝলে তো হয়েই গেল। বলে, অন্য লোক রেখে নাও, সরস্বতী শুধু পড়বে।

শুভেন্দু একটু হেসে বলল—তার মানে সরস্বতীকে আমাদের পুষ্যি করে নিতে হবে, তাই তো?

—মানে তো সেরকমই দাঁড়ায়। কত কষ্ট করে মেয়েটাকে কাজকর্ম শেখালাম, মনের মতো করে তৈরি করলাম...

—দাঁড়াও দাঁড়াও। আগেই উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আমি কথা বলে দেখছি ঝিমলির সঙ্গে। বুঝিয়ে বলছি।

নাহ, বুঝিয়েও লাভ হল না কোনও। ঝিমলি নিজেই নাইট স্কুলে নাম লিখিয়ে দিয়ে এসেছে সরস্বতীর, গরীব সরস্বতীকে সে প্রকৃত শিক্ষিত করে তুলবেই। ঝিমলির বিশ্বাস—তার বাবা-মাও এ কাজে নিরুৎসাহিত করবে না তাকে। একটা মাত্র সরস্বতীকে শুভেন্দুরা কী পারে না লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে?

রাত্রে অর্চনা ঠাণ্ডা স্বরে বলল—কিগো, কী করবে ঠিক করলে?

শুভেন্দু চিন্তিত মুখে বলল—কিছু একটা তো করতেই হবে। ঝিমলিটা এত বাড়াবাড়ি করে ফেলবে কে জানত!

—সরস্বতীকেই ধমকে-ধামকে ঠিক করব?

—না না, সেটা খুব অমানবিক কাজ হয়ে যায়।

—তাহলে আর কি! আমিই অফিস থেকে ফিরে খেটে মরি, আর কাজের লোক পায়ের ওপর পা তুলে দিগ্‌গজ হোক!

—আহ্। শুভেন্দু বিরক্ত হল,—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

চার

সরস্বতীর মা এসেছে সরস্বতীকে নিয়ে যেতে। এ বাড়িতে আর তাকে কাজে রাখবে না, অন্য কোন বাবুর বাড়িতে আরও নাকি পঞ্চাশ টাকা বেশি মাইনেতে কাজে লাগাবে মেয়েকে।

যাওয়ার আগে সরস্বতী কাঁদল খুব। ঝিমলি ছলছল চোখে ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইল, স্কুলে গেল না।

শুভেন্দু আর অর্চনা চুপ। সরস্বতীর মাকে ডেকে পাঠানো ছাড়া আর কিই বা উপায় ছিল শুভেন্দু অর্চনার! মেজদিই কোন বান্ধবীর বাড়িতে সরস্বতীর জন্য নতুন কাজের ব্যবস্থা করেছে। শুভেন্দুর জন্য শীগ্‌গীরই এক বয়স্ক মহিলাকে পাঠিয়ে দেবে।

এ সব কথা তো আর ঝিমলি'কে জানতে দেওয়া যায় না। সরস্বতী নামের ওই ছোট্ট গরীব মেয়েটাকেও মুখের ওপর বলা যায় না কিছু।

মধ্যবিত্ত হওয়ার কী যে জ্বালা!

রামধনু রং

মাত্র তিন মিনিটের জন্য বাথরুমে গিয়েছিল তপতী। দুপুর থেকে গজগজ করছে মনোর মা। ঝাঁঝরিতে নাকি জল আটকে থাকছে, তার সরেজমিন করতে। তার মধ্যেই পাপু ঘর থেকে উধাও।

এক সেকেন্ডও কি চোখের আড়াল করার উপায় নেই! হরিণ-পায়ে তপতী প্যাসেজে এল। যা ভয় পেয়েছে তাই, সামনে বেতের মোড়া গড়াগড়ি খাচ্ছে, ফ্ল্যাটের দরজা হাট। ছিটকিনিতে এখনও হাত পায় না পাপু, তাই মোড়া টেনে...।

গেল কোথায়!

তপতীর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে গেছে? মনে হয় না। সাড়ে চারটে বাজে, রিন্টি মিন্টির টিউটর এসেছে এখন, ওখানে গিয়ে পাপুর এ সময়ে খুব সুবিধে হবে না। দোতলা তিনতলায় পাপুর কোনও সমবয়সী নেই, চারতলায় গেলেও যেতে পারে। ভাবতে ভাবতে বিল্ডিং-এর সামনের ছোট্ট লনেও একবার উঁকি দিয়ে নিল তপতী। ফালি জায়গাটা শুনশান, প্রথম ফাল্গুনের নরম রোদ্দুর একা একাই খেলা করছে ঘাসবিহীন লনে। ছাদে যায় নি তো? মনে হতেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। যেতে পারে। ইদানীং পাপুর খুব ছাদে যাওয়ার পা হয়েছে। আট ফ্ল্যাটের আটখানা অ্যান্টেনা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, সিমেন্টের ট্যাংকের ওপর উঠে যায়, কার্নিশ ধরে বিপজ্জনক ভাবে ঝোঁকে নীচের দিকে।

ভাবতে বুকটা আরও গুমগুম। দরজা টেনে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে তপতী। ছাদে পৌঁছে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আছে বটে ছেলে, তবে কোনও অপকর্ম করছে না। ঠিক মধ্যিখানটায় দাঁড়িয়ে দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

তপতী দম নিল একটু। কড়া গলায় ডাকল,—পাপু?

তিন বছর পাঁচ মাসের পাপু প্রাজ্ঞ ভঙ্গিতে মাকে দেখল একবার। আবার চোখ আকাশের দিকে। তপতী গলা চড়াল,—ব্যাপার কী তোর? পুট করে পালিয়ে এসেছিস যে? কত দিন না বলেছি যখন তখন ছাদে উঠবি না?

—তুমি তো পড়াচ্ছিলে না, ঝাঁঝরি দেখতে গেছিলে।

—অমনি তুই দৌড় লাগাবি! কাল তোর ইণ্টারভিউ না?

এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা সমুপস্থিত জেনেও তেমন কোন ভাবান্তর হল না পাপুর। প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা হাত বার করে আকাশের দিকে আঙুল তুলল,—দ্যাখো মা, ঘুড়িটা কী সুন্দর হাওয়ায় ভাসছে!

ভুল করে আকাশের দিকে চোখ চলে গেল তপতীর। নীল আকাশে একটা একলা ঘুড়ি দোল দোল দুলছে, অনেকটা উঁচুতে। দেখতে বেশ লাগে। কিন্তু এখন কি ঘুড়ি দেখার সময়!

মুহূর্তে সচেতন তপতী চোখ নামাল,—ভাসুক। তুমি নীচে চলো।

—ঘুড়ি হাওয়ায় ভাসে কেন মা?

বিজ্ঞানের প্রশ্ন। এই প্রশ্ন কি অতটুকু ছেলেকে কাল জিজ্ঞেস করবে? মনে হয় না। তপতী কাছে এসে ছেলের ঘেঁটি ধরল,—অবাধ্য হোয়ো না পাপু, পড়বে চলো।

মার সঙ্গে এক পা দুপা এগোল পাপু। ঘুরে ঘুরে দেখছে ঘুড়িটাকে,—ওটা কী ঘুড়ি মা?

আবার ভুল করে তাকিয়ে ফেলেছে তপতী। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না ঘুড়িটাকে, নীলের প্রেক্ষাপটে শুধু রঙটুকু বোঝা যায়। লাল আর কালো। কী যেন নাম ওটার? পেটকাট্টি? চৌখুপি? ময়ূরপঙ্খি? চাঁদিয়াল? জয়হিন্দ? দাদা ঘুড়ি ওড়ানোর পোকা ছিল, অজস্র নাম মুখস্থ আছে তপতীর। বলে দেবে একটা?

না। ছেলেকে এখন ঘুড়ির নাম শেখানো মানেই তার ইহকাল পরকাল ঝরঝরে করে দেওয়া। গম্ভীর গলায় তপতী বলল,—নাম জেনে কাজ নেই। ঘুড়ির ইংরিজি কী মনে আছে তো?

পাপু ঘাড় নাড়ল,—কাইট।

—স্পেলিং কী?

—কে আই টি কাইট।

—মারব এক থাপ্পড়। কাজের জিনিস মনে থাকে না, শুধু অকাজে মন! শেষের ই'টা কে বলবে?

পাপু লজ্জিত মুখে হাসল,—হ্যাঁ হ্যাঁ। কে আই টি ই।

—কাইট মানে আরেকটা কী হয়?

নার্ভাস মুখে মার দিকে এক ঝলক তাকাল পাপু। তারপরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—চিল, মা?

—হ্যাঁ। তপতীর মুখের পেশি সামান্য শিথিল হল,—আর বাজপাখির ইংরিজি কী?

—হক।

—স্পেলিং?

—এইচ এ ডব্লু কে।

তপতী প্রসন্ন হল। নাহ্, ছেলের মাথা আছে। মন দিলেই শিখতে পারে। সেণ্ট পিটারস স্কুল চড়ুই-এর ইংরিজি জিজ্ঞাসা করে দিশেহারা করে দিয়েছিল পাপুকে, এবার সেটি হচ্ছে না। গুনে গুনে এবার পনেরোটা পাখির নাম মুখস্থ করিয়েছে ছেলেকে, দেখাই যাচ্ছে মনে আছে সব।

ছেলের হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগোল তপতী। নামতে নামতে বাকিগুলো ঝালিয়ে নেবে কিনা ভাবছে, পাপু দুম করে প্রশ্ন করে বসল—কোন কাইটটা আগে মা?

—মানে?

—মানে চিল কাইটটা আগে, না ঘুড়ি কাইটটা আগে?

আজব প্রশ্ন! তপতী ধমক দিল,—তা জেনে তোমার কী হবে?

—বলো না মা।

একটু ভেবে নিয়ে তপতী বলল,—চিল কাইটটা আগে।

—কেন?

—চিল অনেক আগে থেকে আকাশে ওড়ে। ঘুড়ি অনেক পরে এসেছে।

—তাহলে ঘুড়িকে চিল বলে না কেন?

—ফের বাজে প্রশ্ন! চুপচাপ নামো। চড়ুই-এর ইংরিজি মনে আছে?

—স্‌সস্‌স্প্যারো।

—টিয়া?

—প্যারট।

—পায়রা?

—পিপিপিপিপিজন্।

সামনে তিনতলার ব্যানার্জিবাবু। সঙ্গে চেনে বাঁধা ইয়া অ্যালসেশিয়ান। প্রকাণ্ড

এই প্রাণীটিকে দেখলেই তপতীর হৃৎকম্প হয়, প্রশ্ন ভুলে ল্যান্ডিং-এর কোণে দাঁতমুখ সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাপুর ভয়ডরের বালাই নেই, দিব্যি হাত বোলাচ্ছে অ্যালসেশিয়ানের গায়ে। লেজ নাড়ছে জন্তুটা।

কুকুর-কাম-নেকড়ে উঠে যেতে স্বচ্ছন্দ হল তপতী। ফাঁক পেয়ে পাপুই প্রশ্নবাণ হেনেছে,—জিমিকে অ্যালসেশিয়ান বলে কেন মা?

প্রশ্নটা দরকারি না অদরকারি তপতী ঝপ্ করে বুঝে উঠতে পারল না। গত সপ্তাহে ড্যাফোডিল হাউসের দিদিমণিরা জন্তুজানোয়ার দিয়েই না ঘায়েল করেছিল পাপুকে? ভাবিত হল তপতী। কোন্ রাইন নদীর পশ্চিমে কোথায় এক অ্যালসেশিয়া নামের প্রদেশ আছে, সেখান থেকেই এই বর্ণসঙ্কর কুকুরের উদ্ভব,—এত তথ্য তপতীর জ্ঞানের চৌহদ্দির মধ্যে পড়ে না। যদি প্রশ্নটা করে বসে কাল? সামনের ফ্ল্যাটের সংঘমিত্রার প্রচুর জ্ঞান, সে দিশি কুকুরকে মংগ্রেল বলে ডাকে, সে কি বলতে পারবে উত্তরটা?

ভাবতে ভাবতেই দ্বিতীয় আক্রমণ,—অ্যালসেশিয়ান স্পেলিং কি মা?

দুটোই এস্? না একটা এস একটা টি? পাসকোর্সে বি-এ পাশ তপতী কূল না পেয়ে ছেলেকে দাবড়ে উঠল,—অত বড় কুকুরের স্পেলিং তোমায় জিজ্ঞেস করবে না।

পাপু কী বুঝল কে জানে, আপাতত চুপ। হয়তো মনে মনে আরও কূট প্রশ্ন ভাঁজছে। মাকেই ঘায়েল করার জন্য। তপতী অবশ্য সে সময়টুকু দিল না ছেলেকে, হিড়হিড় করে টেনে এনে ফ্ল্যাটের দরজা লক করেছে। মনোর মাকে চা করতে বলে বিছানায় এসে বসল। সামনে বাবু হয়ে পাপু। এখনও কত রিভিশান বাকি। দেওয়াল দরজা জানালা পর্দার ইংরিজি পাখিপড়া করাতে হবে, সব রকম রং চেনাতে হবে ছেলেকে। নিউ লাইট হাই স্কুলে টেবিলের রঙটা ঠিক বলতে পারে নি পাপু, গুলিয়ে ফেলেছিল। বাদামিকে ব্রাউন না বলে কালো। সোজা উল্টো দুদিক থেকে ওয়ান টু গোনাও শেখাতে হবে ভাল করে, মুখস্থ রাইমগুলো আওড়াতে হবে বার বার। যেন না আটকায়, যেন একটুও না তোতলায় ছেলে। তিনটে স্কুল ফসকে গেছে, হোলি অ্যাকাডেমি এখন শেষ ভরসা। এখানেও না হলে...

না হলে কী হবে ভাবতে পারে না তপতী, রক্ত হিম হয়ে আসে।

খাটময় রাশি রাশি পশুপাখির ছবি। উট ভাল্লুক হাতি গণ্ডার জলহস্তী কাঠবিড়ালি। ঈগল টিয়া শকুন বুলবুলি ময়না। তপতী নতুন করে পড়ল ছেলেকে নিয়ে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পরখ করছে ছেলের স্মৃতিশক্তি। টপাটপ জবাব দিয়ে চলেছে ছেলে, চোখে মুখে আলো জ্বলে উঠছে তপতীর, ভুল হলে শুধরে দিচ্ছে হাসিমুখে।

হঠাৎ ফুড়ুৎ করে উঠে গেল পাপু। খোলা জানালা দিয়ে ঝুঁকে কী যেন দেখছে।

তপতী চোখ পাকাল,—কী হল?

—কী সুন্দর একটা পাখি ডেকে উঠল না মা?

—তুই এখন পাখি দেখতে উঠে গেলি!

—ওটা কী পাখি গো মা?

—জানি না। এখানে বইয়ে অনেক পাখি আছে, এসে দ্যাখ্ না।

পাপু তবু অনড়। বাইরে পাঁচিলের গায়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ আছে, সদ্য পাতা এসেছে গাছে, ফুলও। সেদিকে ঘাড় উঁচু করে বলল,—কী সুন্দর ফুল হয়েছে মা গাছটায়! রেড।

তপতী অসহিষ্ণু গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—পাপুউউ!

গা মুচড়ে মার দিকে তাকাল পাপু,—গাছটায় এতদিন ফুল ছিল না কেন মা?

উফ্, কী অমনোযোগ, কী অমনোযোগ! আর পারা যায় না।

তপতী উঠে দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

দুই

কদিন ধরেই অফিস থেকে ফিরতে রাত হচ্ছে স্বপনের। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি, ইয়ার এন্ডিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে, সাড়ে আটটা নটার আগে বাড়ি ঢুকতে পারে না কোনওদিন।

আজ সাড়ে নটা বেজে গেল।

ফিরে দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে পাপু। এখনও রাতের বিছানা করা হয়নি, বেড কভারের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে পাপুর বিদ্যাচর্চার সরঞ্জাম, তার মাঝেই হাত পা মেলে চিৎপাত ছেলে।

জামা ছাড়তে ছাড়তে স্বপন বলল,—কী, পাপু একদম তৈরি?

তপতী ছেলের শার্টপ্যান্ট ইস্ত্রি করছিল। ক্লান্ত স্বামীর দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভাবে হাসল,—মনে তো হয়। সারাক্ষণ ছেলে নিয়ে তো কম খাটছি না। বাপের বাড়ি পর্যন্ত যাই না কত দিন।

—এবার যেও। কাল তো তোমার পরীক্ষা শেষ।

—আমার বলছ কেন? তোমার নয়?

—স্বপন হেসে বলল,—পরিশ্রমটা তুমি করছ, আমার পরীক্ষা বললে তুমি মানবে কেন?

—তবু উদ্বেগ তো দুজনেরই। নয় কি?

তা বটে। তিন মাস ধরে স্বপনেরও কি কম টেনশন যাচ্ছে? ভাল একটা স্কুলে জীবন শুরু করে দিতে পারলে ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে আর ভাবতে হবে না। কত লোককে ধরা হল। বন্ধুবান্ধব, অফিসের লোক, তপতীর জামাইবাবু, নিজের পিসতুতো ভাই, পাড়ার চেনা জানা, কেউ কোনও কম্মে লাগল না। পুরনো এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে সেন্ট পিটার্সের প্রিন্সিপালের পরিচয় আছে শুনে, তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল স্বপন, বন্ধু করে দেবে বলে কথাও দিয়েছিল, তার পরও লিস্টে ছেলের নাম নেই। ডোনেশান দিলে ড্যাফোডিল হাউসে ভর্তি করা যাবে খবর পেয়ে একদিন অফিস কামাই করে দৌড়ল, টাকার অঙ্ক শুনে কান লাল করে পালিয়ে আসার পথ পায় না। তিরিশ হাজার! ভাবা যায়!

জামা প্যাণ্ট বদলে স্বপন বাথরুমে গেল। অন্য দিন মুখ হাত ধুয়ে একটু টিভির সামনে বসে, আজ সোজা খাবার টেবিলে।

খেতে খেতে কথা হচ্ছে দুজনের। রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে স্বপন বলল,—কাগজপত্র সব গুছিয়ে রেখেছ তো? কাল কিন্তু সাড়ে সাতটার মধ্যে হোলি অ্যাকাডেমিতে পৌঁছতে হবে।

তপতী মাথা দোলাল,—জানি।

—জানো তো সবই। তখন আবার তাড়াহুড়োর সময়ে বোলো না এটা নেওয়া হল না, ওটা ভুলে গেছি।

—কবে আমার কী ভুল হয়? কেলো করলে তুমিই করবে।

—আমি! স্বপনের খাওয়া থেমে গেল।

—হ্যাঁগো, হ্যাঁ, তুমি। মনে নেই ড্যাফোডিল হাউসে কী করেছিলে? জিজ্ঞেস করল তোমার স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম ছিল কিনা, কেবলুসের মতো বলে দিলে, না তো!

—ভুলটা কী বলেছি? আমাদের বরদা চরণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল থোড়াই ইংলিশ মিডিয়াম ছিল!

—বরদাচরণ নামটা বলার কী দরকার ছিল? বলতে পারতে বি সি মেমোরিয়াল। দ্যাখো নি আমি কেমন কায়দা করে টি এস গার্লস স্কুল বললাম!

—তা ঠিক। বরদা চরণের পর তোমার তারাসুন্দরীর নাম শুনলে ইণ্টারভিউ বোর্ডে দিদিমণিদের কোঁচকানো নাক আর সোজা হত না।

—কথাটা মাথায় রেখো। দয়া করে মিডিয়ামের প্রশ্ন তুললে কাল এড়িয়ে যেও।

স্বপন কথা বাড়াল না। টেরচা চোখে দেখল স্ত্রীকে। কেমন যেন দূরমনস্ক,

আত্মমগ্ন হয়ে আছে তপতী। খুঁটছে রুটি, মুখে তুলছে না। সাত বছরের পুরনো স্ত্রীকেও এই মুহূর্তে কেমন যেন অচেনা লাগে। ছেলেকে নামী দামী স্কুলে পড়াতে হবে, হেনতেন, এত সব উচ্চাশা ছিল না স্বপনের। একটু একটু করে তার চোখে মোহের কাজল লাগিয়ে দিয়েছে তপতী। আর পাঁচটা ভাইবোনের সঙ্গে তারা হেঁচিপেচি করে বড় হয়েছে বলে তাদের একমাত্র সন্তানও তাই হবে! এই প্রচণ্ড গতির যুগে শুধু একটা ভাল স্কুলে ভর্তি হতে পারল না বলে অবয়বহীন গড্ডলিকায় তলিয়ে যাবে পাপু, এই ভাবনাতেই কী টেনশান! এই টেনশানও তপতীরই দান, এই টেনশানে তাদের সোনালি সুখের স্বপ্ন লেগে আছে।

খাওয়া শেষ করে বেসিনে মুখ ধুতে গেল স্বপন। অনেকক্ষণ ধরে সে কুলকুচি করে। অভ্যেস। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে বলল,—পাপুকে পড়ানোর ঝামেলাটা তুমি না নিলেই পারতে।

—ঝামেলা কীসের? তপতী তরকারির বাটি ঢাকছে।

—না, মানে...প্রফেশনাল একটা টিউটর অ্যাপয়েন্ট করলে...দেখতেই তো পাচ্ছ ছেলে আগের তিনটে জায়গায় নিজেকে ভালমতো শো করতে পারল না...

—সে তো রেখেছিলে একটা। চার মাসেও ছেলেকে এ বি সি ডি শেখাতে পারল না! একদিন আসে, তিনদিন আসে না...

—আহা, সে তো বাচ্চা মেয়ে। একটা ভারিক্কি গোছের কাউকে রাখলে...

—খুঁড়ো না তো বেশি। আমি জানি আমার কী দায়িত্ব আছে। বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি কিনে এমনিই পড়াশুনো করছি?

ফ্রিজ খুলে দাঁড়িয়ে গেছে তপতী। ঠাণ্ডা ধোঁয়া আসছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। তাতেও যেন শীতল হল না। উষ্ণ স্বরে বলল,—ট্যাড়োশ হচ্ছ তুমি। যদি এখানেও ছেলে চান্স না পায় তবে তুমি দায়ী থাকবে।

—কেন? আমি কী করলাম?

—গ্র্যাজুয়েশানের সার্টিফিকেটটা জোগাড় করেছ? তপতী শব্দ করে ফ্রিজ বন্ধ করল।

স্বপন ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে সিগারেট ধরিয়েছে। হালকা গলায় বলল,

—দূর, অ্যাদ্দিন পরে ও আর কলেজে পড়ে আছে নাকি! কবে ইউনিভার্সিটিতে ফিরে গেছে।

—ইউনিভার্সিটিতেই অ্যাপ্লাই করতে পারতে।

—বহুত ঝামেলা। স্বপন টিভিটা খুলে দিল। একটু বুঝি বা অন্যমনস্ক হতে চাইল।

—ঝামেলা বোলো না, বলো তোমার গেঁতোমি।

—আরে বাবা, মার্কশিট তো আছে।

—নিউ লাইট কিন্তু তোমার সার্টিফিকেটই দেখতে চেয়েছিল।

—তারা চেয়েছিল বলে এরাও দেখতে চাইবে তার মানে আছে?

—যদি চায়?

—তখন দেখা যাবে। স্বপন আলগা হাসল,—তোমারটা আছে, ওতেই হবে।

—আমার একারটা দেখতে চাইলে তো হয়েই যেত। সব স্কুলই বাবা মা দুজনের কোয়ালিফিকেশান দেখতে চায়। তপতী দুম করে রেগে গেল,—আসল কথা হল, ছেলের জন্য তোমার ভাবনা নেই। সংঘমিত্রার বরকে দেখেছ? দুই মেয়ের পড়ার চিন্তায় সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকে। তাকে দেখেও তো শিক্ষা নিতে পারো।

কার সঙ্গে কার তুলনা! সংঘমিত্রার বর কলেজে পড়ায়, বছরে আট মাস ছুটি, মেয়েদের নিয়ে সে চব্বিশ ঘণ্টা কেন, আটচল্লিশ ঘণ্টা আহ্লাদিপনা করতে পারে। স্বপনকে খেটে খেতে হয়, মালিক হুকুম করলে ছুটির দিনেও ছুটতে হয় অফিসে। বিরক্ত মুখে টিভি বন্ধ করে দিল স্বপন। রাগ রাগ গলায় বলল,—আমি ছেলের জন্য ভাবি না?

—ভাবো? তাহলে একবার ছেড়ে সাতবার দৌড়তে ইউনিভার্সিটিতে।

—ওটাই শুধু ছেলের জন্য ভাবনা? অন্য কাজ কাজ নয়? আমি ছেলের জন্য কিচ্ছু করি না? ছেলের ভর্তির ফর্মের জন্য রাত জেগে স্কুলে স্কুলে লাইন দিয়েছে কে? অফিস ফেলে বেহালা ছুটেছি, চুঁচুড়া ছুটেছি, লেক টাউন ছুটেছি, সে কার জন্য? এই যে মাঝে মাঝেই ছেলের ইন্টারভিউ বলে অফিস ডুব দিচ্ছি, মালিকরা আমায় ছেড়ে কথা বলছে?

ঘর থমথমে হয়ে গেছে।

পাশে এসে বসল তপতী। একটু চুপ থেকে বলল,—আহা, অত রেগে যাচ্ছ কেন? উদ্বেগে কি আমার মাথার ঠিক আছে? কী বলতে কী বলে ফেলি!

—বলবে না। মনে রেখো সেন্ট পিটার্স, ড্যাফোডিল সর্বত্র ছেলের লিস্টে নাম আছে কিনা দেখতে আমিই ছুটে গেছি, তুমি নয়। বোর্ডে ছেলের নাম না দেখে কম দুঃখ হয়েছে আমার!

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যিখানে দুঃখ শব্দটা যেন পাক খাচ্ছে। ফাল্গুনের বাতাস বুঝি ভারী হয়ে গেল। মাথার ওপর তিন পয়েন্টে ঘুরছে ফ্যান, মনে হচ্ছে আরেকটু জোরে ঘুরলে ভাল হয়।

স্বপনের পিঠে আলগা হাত রাখল তপতী। ছোঁয়াটা কী স্নিগ্ধ, কী নরম, উত্তাপময়! স্বপনের মনটা ক্রমশ জুড়িয়ে এল। তবু যেন কোথায় একটা কাঁটা খচখচ করছে। কাল পারবে তো ছেলে?

মাথার ভেতর থেকে ঘুরঘুরে পোকাটাকে বার করে দিতে চাইল স্বপন। চোখ বুজে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছে হোলি অ্যাকাডেমি স্কুলের দীর্ঘ করিডোরে। ইয়া ইয়া থাম, ঝকঝকে বারান্দা, উঁচু উঁচু সিলিং। কী পবিত্র আবহাওয়া! মাথা নুয়ে আসে শ্রদ্ধায়।

পলকের জন্য নিজের স্কুল বিল্ডিংটা স্বপনের চোখের সামনে দুলে উঠল। ক্যাটকেটে সাদা শ্রীহীন এক দোতলা বাড়ি, ছোট ছোট্ট জানলা নিচু নিচু দরজা, ভাঙাচোরা বেঞ্চ, মলিন দেওয়াল। কী দীনহীন!

তিন

টেবিলের তিন দিক ঘিরে বসে আছেন পাঁচ শিক্ষিকা। উঁহু, শিক্ষিকা নয়, শিক্ষিকার বেশে পাপুর পাঁচ ভাগ্যনিয়ন্তা। একজন প্রৌঢ়া, বাকিরা তিরিশ থেকে চল্লিশের কোঠায়। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলে আবেদনপত্রের স্তূপ, পেপারওয়েট, জল ভর্তি ঢাকা দেওয়া কাচের গ্লাস। প্রৌঢ়া বসেছেন মধ্যমণি হয়ে, সামনে তাঁর লম্বাটে এক জাবদা খাতা।

তপতীর বুকে গমকল চলতে শুরু করেছে। ঝাড়া পৌনে দু ঘণ্টা বসে থাকার পর অবশেষে এসেছে ডাক। ঘরে ঢুকেই মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল ছেলের হাত। সাহস সঞ্চয় করছে। পিছনে স্বপন, তার ঠোঁটে ঝুলছে এক চিলতে ভীরু হাসি।

তপতী ছেলের কব্‌জিতে মৃদু চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে রোবটের মতো মাথা দুলিয়েছে পাপু,—গুড মর্নিং ম্যাডাম।

প্রৌঢ়ার মুখে মিটিমিটি হাসি,—কাম হিয়ার মাই চাইল্ড।

পাপু একবার মুখ তুলে মা বাবাকে দেখল। তারপর নির্দ্বিধায় প্রৌঢ়ার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্মিত মুখে প্রৌঢ়া প্রথম প্রশ্ন করলেন,—ইওর নেম?

পাপু ক্ষুদে মিলিটারির মতো টান টান,—মাই নেম ইজ মাস্টার ঋতবান পাল।

—ফাইন। ফাদারস্ নেম?

—মাই ফাদারস্ নেম ইজ মিস্টার স্বপন কুমার পাল।

স্পষ্ট উচ্চারণ করছে ছেলে। বুকে একটু বল এল তপতীর। ড্যাফোডিল হাউসে এই উত্তরটাই ভুলে মুলে একসা হয়েছিল পাপু।

নিচু স্বরে পাশের গোলাপি শাড়ি পরা শিক্ষিকাকে কী যেন বললেন মহিলা। গোলাপি শাড়ি দ্রুত পাপুর ফর্মে চোখ বোলালেন। এক জায়গায় থামল চোখ, আঙুল দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছেন।

হাসতে গিয়ে হাসলেন না প্রৌঢ়া। গম্ভীর মুখে তপতী স্বপনের দিকে তাকালেন,—বি সিটেড প্লিজ।

দেওয়ালের ধারে পাতা চেয়ারে বসল তপতী। চেয়ার টানতে গিয়ে স্বপন একটা আলগা হোঁচট খেল, সামলে নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তপতী রুষ্ট চোখে আড়ে দেখল স্বামীকে, নিমেষে মুখে এঁটে নিয়েছে ইলাস্টিক হাসি। কোন দিক থেকে প্রশ্ন শুরু করবে পাপুকে? পশু? পাখি? রঙ? কাউন্টিং! রাইমস্? বোঝা যাচ্ছে না। টেবিলের রঙ ঘন সবুজ, পারবে পাপু। পর্দার রঙ মেটে মেটে, হে ঈশ্বর ওটা যেন না ধরে। পশুর মধ্যে যেন বাইসনটা জিজ্ঞেস না করে, সকালেও পাপু বাফেলোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছিল।

বাঁদিকের চেয়ার থেকে নীল শাড়ি নড়ে চড়ে উঠেছেন। ইংরিজি ছেড়ে বাংলায় প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা ঋতবান, তোমার বাবার সঙ্গে আর কে এসেছেন?

—মাই মাদার।

—তুমি বাংলাতেই বলো।

—মা।

—তোমার দাদু আছেন? মার বাবা?

—হ্যাঁ, সোদপুরে থাকে। পাপু দারুণ স্বচ্ছন্দ হয়েছে,—দাদু দিদা মামা মামি সব্বাই আছে।

—তোমার ঠাকুর্দা নেই? বাবার বাবা?

—আছে তো। দাদাভাই। জয়নগরে থাকে।

তপতী সামান্য ছটফট করে উঠল। বেশি কথা বলছে পাপু, এত বলার দরকার কী!

ডানদিকের চেয়ার থেকে তখনই প্রশ্ন ছুঁড়েছেন সাদা শাড়ি,—আচ্ছা ঋতবান, তোমার দাদু তোমার দাদাভায়ের কে হন?

পশু নয়, পাখি নয়, ছড়া নয়, এ আবার কেমন ধারার প্রশ্ন! তপতীর মুখ আপনাআপনি হাঁ হয়ে গেল।

পাপু এতটুকু ঘাবড়ায়নি। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—কে আবার! বন্ধু!

ফিক করে হাসলেন সাদা শাড়ি,—শুধু বন্ধু?

—খুব বন্ধু।

—এবার বলো তো ঋতবান, তোমার বাবা তোমার সোদপুরের দাদুর কে হন?

তপতীর চোখ জ্বালা করে উঠল। এত শক্ত উত্তর কি দিতে পারে পাপু!

পাপুর কোনও হিলদোল নেই। এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে বলল,—বাবাজীবন।

ঘরশুদ্ধু সকলে শব্দ করে হেসে উঠেছে। প্রৌঢ়া হাসতে হাসতে ঝুঁকলেন,—আর তোমার বাবা তোমার মার কে হন?

—বড়দা।

—কেন?

—বারে, বাবা মার থেকে বড় না!

অট্টহাসিতে ছত্রখান হয়ে গেছে ঘর, পাঁচ পরীক্ষকের হাসি আর থামে না। তপতীর সব আশা দপ করে নিবে গেল। সব শূন্য। সব ফাঁকা'

চার

ফ্ল্যাটে ঢুকে ঝেঁঝে উঠল স্বপন, চক্রান্ত, চক্রান্ত। ওইটুকু ছেলেকে ওসব উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করার মানে কী?

তপতী ঝনঝন করে উঠল, আসল কথা বুঝলে না? কাটানোর ধান্দা। ভেতর থেকে সব নেওয়া হয়ে গেছে।

—সে তো ঘরে ঢুকেই বুঝে গেছি। ভাবভঙ্গি দেখলে না, হাসাহাসি করছিল! আমরা যেন ক্লাউন।

—সে তারা যা খুশি ভাবুক, এখন আমাদের ছেলেটার কী হবে?

—পাড়ার নার্সারিতে ভর্তি করতে হবে, আর কি।

তপতী ধপ করে বসে পড়ল,—এতদিন ধরে এত কিছু শেখালাম. কিচ্ছু জিজ্ঞেস করল না।

বাইরে উড়ো মেঘে বৃষ্টি হচ্ছে একটা। ঝলমল করছে রোদ্দুর, তার মধ্যে রুপোর কুচির মতো উড়ছে জলকণা। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল স্বপন। কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে এল,—আমাদের কপালটাই খারাপ।

তপতীর চোয়াল শক্ত হল,—আমি ছাড়ব না। আজ থেকেই আমি আবার ছেলেকে নিয়ে পড়ছি। সমস্ত জ্ঞাতিগুষ্টি, শালা শালি, মামা মামি, কাকা কাকি, সব সম্পর্ক শিখিয়ে ছাড়ব। এ বছর পারেনি, সামনের বছর ওকে পারতেই হবে।

—সে কী করে হবে? ছেলের বয়স থ্রি প্লাস থেকে ফোর প্লাস হয়ে যাবে না? একদম নিচুতে ভর্তি না করালে পরের ক্লাসে চান্স পাওয়া তো আরও শক্ত।

—কুকুর যেমন, তার মুগুরও আছে। তপতী ক্রূর চোখে তাকাল,—এফিডেভিট করে এক বছর বয়স কমিয়ে নেব। কী গো, করা যাবে না?

—তা অবশ্য করা যায়। কিন্তু...

—কিন্তু কী?

—এবার আর তুমি নয়, পাপুর জন্য টিচার রাখব। ওই সব স্কুলেরই কাউকে

একটা। সে যত টাকা লাগে লাগুক। স্বপন কপাল টিপে ধরল,—ওফ, মাথা ধরে গেছে। এক কাপ চা খাওয়াও তো।

উঠল তপতী। বিষণ্ণ পায়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। সেই সকালে দুটো বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছিল, খিদেয় চনচন করছে, পেট, কিন্তু জিভে আর কোনও স্পৃহা নেই। মনোর মা মশলা বাটছে, তাকে কিছু না বলে গ্যাসে কেটলি চড়িয়ে দিল।

তখনই মনে হল ফ্ল্যাটটা বড় শুনশান। ছুটে স্বপনের কাছে এল,—পাপু গেল কোথায়?

—নেই? এদিক ওদিক তাকাল স্বপন,—এক্ষুনি তো জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল! ঘরে দেখো তো।

দ্রুত ঘর দেখে এল তপতী। নেই। বাইরের ভিজে লনে নেই, উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে নেই, বাবা মার বিমর্ষ চিন্তার মাঝে আবার পাপু পালিয়েছে ফুড়ুৎ।

দুদ্দাড়িয়ে ছাদে উঠল স্বামী-স্ত্রী। ছাদে পৌঁছে থমকে গেল। অপরূপ এক রামধনু ফুটেছে আকাশে, সাত রঙের বাহার নীল শূন্যে স্থির। পাপু নির্নিমেষ চোখে দেখছে প্রকৃতির বিস্ময়।

বাবা মার পায়ের শব্দে চমকে ফিরে তাকাল পাপু। মুহূর্তে মুগ্ধতা সরে গিয়ে চোখের মণিতে ফুটে উঠেছে ভয়। একটু যেন কেঁপে গেল আতঙ্কে। ঘাড় নিচু করে পায়ে পায়ে বাবা মার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। অস্ফুটে প্রশ্ন করল,—আকাশে ওটা কী বাবা?

স্বপন শুকনো হাসল,—ওটাকে বলে রামধনু।

পাপুর ঘাড় আরও ঝুলে গেল,—ওটা সব সময়ে কেন আকাশে থাকে না, মা?

রেগে উঠতে গিয়েও ছেলের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে তপতীর কী যেন হয়ে গেল, বুকটা সহসা মোচড় দিয়ে উঠেছে। কী ছাইপাঁশ সে শিখিয়ে এসেছে এতদিন! শুধু কয়েকটা নাম! কয়েকটা অক্ষর! সংখ্যা! ধ্বনি! কেন? ছেলের পিপাসা জলে না মিটিয়ে কেন সে লাইম জুস গেলাচ্ছে ছেলেকে? একটা মনোরম খাঁচায় ভর্তি করার জন্য?

তপতীর নিজেকে বড় নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল।

পনেরো দিন পরে হোলি অ্যাকাডেমির রেজাল্ট বেরোল। তালিকার মাথায় ঠিক দু'জনের পরে জ্বলজ্বল করছে একটা নাম——ঋতবান পাল। আশ্চর্য!

এই মায়া

এলোমেলো ঘরটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিল অপর্ণা। এত কিছু পড়ে আছে চারদিকে! ঝুমঝুমি থেকে খসে পড়া ঘণ্টি, ফিডিং বটলের চ্যাপ্টা ক্যাপ, বেবি পাউডারের খালি একখানা কৌটো, বোতল পরিষ্কার করার ঝিরিঝিরি ব্রাস, আরও কত কি যে! শেষ মুহূর্তে দোনামোনা করে কিছু জিনিস রেখেও গেছে মিনি। গোটাকয়েক তোয়ালে ন্যাপি, ফোম লাগানো মোটা প্লাস্টিক, বেশ কিছু কাঁথা। পরে আবার এলে কাজে লাগবে।

খাটের বাজু থেকে কাঁথাগুলো তুলে ভাঁজ করল অপর্ণা, আলমারি খুলে তুলে রাখল তাকে। মেঝেতে পড়ে থাকা তুচ্ছ জিনিসগুলো কুড়োল একটা একটা করে, ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলতে গিয়েও কি ভেবে রেখে দিল ওয়ার্ড্রোবের মাথায়। আড়চোখে একবার দেখে নিল আর্যকে।

চোখে হাত চাপা দিয়ে আর্য ইজিচেয়ারে আধশোওয়া। কী যেন চিন্তা করছে।

অপর্ণা গলাটাকে খানিক তরল করে বলল,—হল কি তোমার? একেবারে ধন্দ মেরে গেলে যে!

আর্য চোখ থেকে হাত সরাল না। শরীরটা সামান্য নড়ল শুধু।

—কী ভাবছ তখন থেকে?

—কিছু না।

—মন খারাপ?

—মন খারাপ হবে কেন! এমনিই...

অপর্ণা মুচকি হাসল। আর্য চিরকাল বড় চাপা, সহজে কারুর কাছে হৃদয় খোলে না। নার্সিংহোম থেকে সদ্যোজাত নাতনি নিয়ে সোজা বাপের বাড়ি এসেছিল মেয়ে,

ছিল প্রায় চার মাস। একটুক্ষণ আগে ফিরে গেছে শ্বশুরবাড়ি। এ সময়ে মন খারাপ হতেই পারে, তবু সেটা মুখ ফুটে স্বীকার করবে না আর্য। আঠাশ বছরের পুরনো স্ত্রীর কাছেও না।

অপর্ণা অল্প খোঁচাল,—যা ধরে রাখা যায় না, তার জন্যে কষ্ট পেয়ে কী লাভ?

এতক্ষণে চোখ খুলেছে আর্য। ইজিচেয়ারের হাতল থেকে চশমা খুলে পরে নিল। বসেছে টান-টান,—কষ্ট পাব কেন? আমি শুধু ওদের আক্কেলটার কথা ভাবছিলাম।

—কী রকম?

—পৌঁছে এখনও একটা ফোন করল না।

—করবে। এত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে? এত দিন পর গেল—হয়তো কত লোক এসেছে, কত হৈচৈ...

—বাহ্, চিন্তা হয় না! ওইটুকু একটা বাচ্চা নিয়ে এতটা পথ গেল...চারদিকে ভিড়...জ্যাম...

—যাদবপুর থেকে সল্টলেক এমন কিছু দূর নয়। অপর্ণা খাটে বসল। হাসিটাকে ধরে রেখেছে মুখে জোর করেই। বলল,—ভিড়-জ্যাম কিছুই পড়বে না। বাইপাস দিয়ে হু-হু করে ট্যাক্সি চলে যাবে।

—সেই কথাই তো ভাবছি। আর্যর চোখ সিলিং-এ ঘুরল,—এখান থেকে সওয়া পাঁচটায় বেরোল, এখন বাজে সাতটা। পইপই করে বলে দিলাম পৌঁছেই একটা টেলিফোন করিস...। মিমিটার নয় সেন্স নেই, শ্যামলও তো একটা ফোন করতে পারত। দিস ইজ ব্যাড—অফুলি ব্যাড!

—করবে গো করবে, অত ছটফট করছ কেন? তোমার আবার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি!

—মেয়ে জামাই নাতনির জন্য দুশ্চিন্তা করা বাড়াবাড়ি! এ কথা বলতে পারলে!

অপর্ণার হাসি নিবে গেল। চার মাস ধরে ভরভরন্ত বাড়িটার শূন্য দশা পলকে যেন আরও ভারী হয়ে গেল। কার্তিকের শেষ এখন, বাতাসে আলগা হিমের ছোঁয়া। অপর্ণার বুকেও একটা হিম-হিম ভাব চারিয়ে যাচ্ছিল। একটা শিশু, একটা নবীন প্রাণ—কতটা যে উত্তাপ এনে দিয়েছিল ঘরে!

অপর্ণা বিড়বিড় করে উঠল,—ওরা আমাদের ধার করা সুখ-দুঃখ। সুদে-আসলে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। দুশ্চিন্তা করে কী হবে?

—মিমিও আমাদের নয় বলছ?

—নয়ই তো। মেয়ে কবে আপন হয়! কথাটা বলেই অপর্ণা সংশোধন করে

নিল নিজেকে,—ছেলে থাকলেও অবশ্য এমন কিছু আপন হত না। তার সংসারও পরের সংসারই হত। ছেলেই বলো, মেয়েই বলো—বড় হয়ে গেলে সব্বাই পর।

আর্য মলিন হাসল,—তুমি বড় নিষ্ঠুর অপর্ণা। তোমার মেয়েও তাই এত নিষ্ঠুর হয়েছে। বাবার মন বোঝে না।

—বুঝেই বা কী করত? বিয়ে-থা না করে সারা জীবন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত? তাতে কি তুমি খুব পুলকিত হতে? মেয়ের বিয়ের জন্য তুমিই তো বেশি হাঁচোড়-পাচোড় করেছিলে!

—মেয়ের বিয়ে না হোক, সে কথা তো বলিনি। তবু...

তবুটা যে কী অপর্ণাও বুঝতে পারছিল। স্বামীর মুখ দেখে ভারী মায়াও হচ্ছিল তার। তবু এই মুহূর্তে একটু ঠাট্টা ছোঁড়ার লোভও সামলাতে পারল না। মাথা নেড়ে বলল,—আজ খুব বাবা, নিষ্ঠুর,—এসব কথা মনে পড়ছে, নিজে কী করেছিলে ভুলে গেছ?

আর্য ভুরু কুঁচকোল,—কী করেছিলাম?

—আমাকেও তো তুমি বাবা-মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিলে স্যার।

আর্য ঘুরে তাকাল।

—মিমি যখন হল, আমি যখন হাসপাতাল থেকে সোজা বাপের বাড়ি গেলাম, কদিন তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছিলে সেখানে? এক মাস যেতে না যেতেই কানের কাছে প্যানপ্যান—বাড়ি চলো, বাড়ি চলো—মনে আছে? মিমি তো তাও চার মাস রইল, আমাকে দু মাস থেকেই চলে আসতে হয়েছিল। মেয়ে নিয়ে যখন শ্বশুরবাড়ি ফিরলাম, তখন আমাদের নিরাপদে পৌঁছনোর সংবাদ কদ্দিন পরে বাবাকে দিয়েছিলে মশাই? খবর না পেয়ে বাবাই তিন দিন পরে ছুটে এসেছিল, মনে পড়ে? তখন তো খুব বলেছিলে—ওটা আমার বাবার বাড়াবাড়ি!

আর্য অসহায় মুখে হেসে ফেলল,—সত্যি মেমারি বটে। দাও, সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দাও।

সিগারেট দেশলাই এখন এ ঘরে আর থাকে না। থাকে ড্রয়িংরুমে, টিভির মাথায়। চার মাস ধরে ফ্ল্যাটে অদৃশ্য নো স্মোকিং বোর্ড ঝুলছে। পাছে নিজেই আর্য অন্যমনস্ক ভাবে স্বেচ্ছা-আরোপিত নিষেধটা ভুলে যায়, তাই এই স্থান বদল।

অপর্ণা সিগারেট আনতে উঠল না, বলল, না, এখন সিগারেট খেতে হবে না। কদিন ধরেই খকখক কাশছ।

—সিজন চেঞ্জের সময়, এখন তো একটু সর্দিকাশি হবেই। তা'বলে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে নাকি?

—বন্ধ না করো, অন্তত কমাও। মেঘে মেঘে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল, সে খেয়াল আছে?

—সবই খেয়াল আছে ভাই। কথায় কথায় আর্য অনেকটা সমে ফিরেছে। হাসিমুখে বলল, বাড়িতে এখন দিনেরাতে কটা সিগারেট খাই?

—সে কি স্বাস্থ্যের কথা ভেবে, না আমার কথা শুনে। অপর্ণাও হাসছে ফিকফিক,—ফুটফুট্টি খুব জব্দ করেছিল দাদুকে। নেশা চাপলেই দাদু প্যাকেট দেশলাই নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ছুটছে ব্যালকনিতে। নয়তো বাথরুমে ঢুকে ফুকফুক।

—সে তো তোমার নেশাও ছুটে গেছিল।

—আমার আবার কী নেশা? অপর্ণা চোখ ছোট করল।

—টিভি। বোকা বাক্স। সকাল-সন্ধে সিরিয়াল গেলা নেই, সিনেমা দেখা নেই, অন্তাক্শরি নেই...নাতনিটি একেবারে কান ধরে বসিয়ে রেখেছিল সামনে।

—আর তুমি? তুমি কী করতে? এমনি তো রাত এগারোটার মধ্যে বাবুর বিছানা চাই, নাতনি পেয়ে ঘুম-ফুম সব ভ্যানিশ। মাঝরাত অব্দি রায়চৌধুরী-সাহেব নাতনির হাত-পা ছোড়া দেখছেন! নাতনি আউ-ওউ শব্দ করছে মুখে, তাই বেহাগ মালকোষ ভেবে শুনে চলেছেন মুগ্ধ হয়ে!

—সেকি আমি একা শুনতাম? আর্যর হাসিতে একটা ছায়া পড়ল,—মেয়েটার চিৎকার এখনও কানে বাজছে। কী অদ্ভুত একটা উল্লাসধ্বনি বার করত মুখ দিয়ে, তাই না?

—আর ওই ভুবন-ভোলানো হাসি! দিব্যি কেমন চোখে চোখ রেখে খিলখিল হাসত!

—শুধু জেগে কেন, ঘুমিয়ে হাসত না? মাঝেমাঝেই ছোট্ট ছোট্ট ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে...

—কেমন তিন মাসের মাথায় উপুড় হতে শিখে গেল বলো? মিনিও অত তাড়াতাড়ি উল্টোয়নি!

—দেখে নিও, ও মেয়ে হামাও টানবে তাড়াতাড়ি। বড়জোর আর দু মাস।

ঝনঝন ফোন বাজছে ড্রয়িংরুমে। কেঁপে গেল স্বামী-স্ত্রী। ছিঁড়ে গেল কথার মায়াজাল।

হনহনিয়ে ড্রয়িংরুমে চলে এল আর্য। উচ্ছ্বসিত মুখে রিসিভার তুলেই মিইয়ে গেছে। নিতান্তই কেজো ফোন একটা, অফিস কলিগের।

দরকারি কথা শেষ করে সোফায় বসে সিগারেট ধরাল আর্য, সেণ্টার টেবিলে

পা তুলে দিল। অনেকদিন পর মুক্তভাবে সিগারেট খেতে পারছে ফ্ল্যাটে, তবু যেন ঠিক তৃপ্তি হচ্ছে না। কেমন বিস্বাদ লাগছে ধোঁয়াটা। একটা ছোট্ট শিশু থাকা আর না থাকাতে এত তফাত!

এতক্ষণ টেলিফোনের সামনে স্থির দাঁড়িয়েছিল অপর্ণা, এবার রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। দরজায় দাঁড়াল। উদাস গলায় বলল,—চা খাবে?

—করো।

—সঙ্গে টোস্ট-ফোস্ট দেব?

—না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেব। বলেই একটু গলা ওঠাল আর্য,—তুমি ঠিকই বলেছ। ওসব মায়াটায়া কোনও কাজের কথা নয়। অল ভেগ্ থিংস্! হাতে অনেক কাজ জমেছে, এবার শেষ করে ফেলতে হবে। কালই রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলছি, তাড়াতাড়ি চুনকাম করে দিয়ে যাক। আর তুমি ফার্নিচারগুলো পালিশ করার কথা বলছিলে, সেগুলো এই শীতেই...

অপর্ণা স্বামীকে দেখছিল। নিচু গলায় বলল,—আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম।

—কী?

—চলো না, দুজনে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি। অন্তত দিন সাতেকের জন্য।

—চলো। কোথায় যাবে? দীঘা পুরী গোপালপুর? বলেই উঠে টিভিটা চালিয়ে দিল আর্য, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা খেলার চ্যানেল বার করল। বাইশটা সাহেব লাথি মারছে ফুটবলে, একদৃষ্টে দেখছে আর্য—শূন্য চোখে।

রান্নাঘরে গ্যাসে জল চড়িয়েছে অপর্ণা। দুটো কাপে মেপে মেপে দুধ দিল, চিনি দিল। শূন্য চোখে।

সাড়ে নটার মধ্যে আজ রাত্রের খাওয়া শেষ। তখনও পর্যন্ত ফোনটা এল না। গুনে গুনে দুটো রুটি খুঁটছে আর্য, অপর্ণাও তথৈবচ। চার মাস ধরে ঘরের প্রতিটি বায়ুকণায় ছড়িয়ে ছিল শিশুটা, বড় বেশি ঘ্রাণ রয়ে গেছে তার—তীব্র, মায়ামায়।

রান্নাঘরের বাসনকোসন গুছিয়ে ড্রয়িংরুমে এসে অবাক হল অপর্ণা। আর্য নেই। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল নাকি মানুষটা? শোওয়ার ঘরের দরজায় এসে বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। আলমারি থেকে পুরনো অ্যালবাম বার করেছে আর্য। উল্টোচ্ছে পাতা। ধীরে, অতি ধীরে।

—কী দেখছ?

—মিমির ছবি।

—হঠাৎ মিমির ছবি দেখতে বসলে!

—দেখছি। আর্য ছোট্ট শ্বাস ফেলল,—দেখছি সময় কি তাড়াতাড়ি চলে যায়! এই তো সেদিন জন্মাল...দ্যাখো দ্যাখো, কেমন গামলায় চান করছে!

উত্তরের জানালা দুটো বন্ধ করে সামনে এসে দাঁড়াল অপর্ণা। দেখল ছবিটাকে। তিন মাসের মিমিকে স্নান করাচ্ছে মাসি। ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে মিমি। খালি গা, গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা, মাথায় পাতলা পাতলা কয়েকগাছি চুল।

আর্য পাতা উল্টোল,—এই ছবিটা দ্যাখো, অন্নপ্রাশনের।

—হুঁ। অপর্ণা আনমনে বলে ফেলল,—বড়দা খাওয়াচ্ছে। তখন খুব ঘুম পেয়েছিল মিমির। খুব কাঁদছিল সেদিন।

—চোখ দেখেছ মেয়ের? তখনই কেমন টেরিয়ে তাকাত।

—ফুটফুট্টির চোখ আরও ঘোরে। মিমিকে এক হাটে কিনে এক হাটে বেচে আসবে।

—উঁহু, আর নাতনির কথা নয়। আর্য আলগা ধমক দিল,—ছবি দেখছ ছবি দ্যাখো...যা আমাদের নয়, তাই নিয়ে আর নো মোর মায়া!

অপর্ণা হাসি চাপল। যাকে এখন দেখছে আর্য, সেই বা কার! দু বছরের মিমি! পাঁচ বছরের মিমি। বাবা-মার সঙ্গে কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে দশ বছরের মিমি। সালোয়ার-কামিজ-পরা মিমি! জিনস-টিশার্ট-পরা মিমি। পেঁয়াজরঙা বেনারসি পরা মিমি, মাথায় রেশমি ওড়না, কপালে চন্দন, সিঁথি-ভরা জ্বলজ্বলে সিঁদুর! শ্যামলের সঙ্গে কুলু মানালিতে হানিমুনে যাওয়া মিমি। এত মিমির মিছিলে কোন মিমিটাই বা আর্যর!

কথা বলতে গিয়ে অপর্ণার গলা দুলে গেল,—মিমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর বাড়িটা এরকমই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, তাই না গো?

—হুঁ। আর্যও উদাস আচমকা,—সব সময়ে মনে হত বাড়িটা যেন গিলে খেতে আসছে!

—তুমি বাপু বড্ড বেশি মেয়ে-মেয়ে করতে। তার জন্য কষ্টও পেয়েছ বেশি।

—কষ্ট তো সহ্যও হয়ে গেল। চার মাস পর খাটে বসে সিগারেট ধরিয়েছে আর্য। আঙুল যেন তার কাঁপছে অল্প অল্প।

অপর্ণা একদম নিচু গলায় বলল,—সময় সব কিছুই সহ্য করতে শিখিয়ে দেয় গো।

আর্য হাসার চেষ্টা করল,—নাতনির বিরহও ভুলে যাব বলছ!

—এই দ্যাখো, তুমিই কিন্তু আবার নাতনির কথা তুললে!

—সরি। এসো, পুরনো ছবিগুলোই দেখি।

অপর্ণার আর ছবির দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। কেমন যেন মনে হচ্ছে ছবিতে মোটেই মেয়েকে দেখছে না আর্য, মেয়ের মধ্যে দিয়ে নাতনিকেই ছুঁতে চাইছে তার স্বামী। অথবা মেয়ে নাতনি কাউকেই নয়, প্রিয়জনদের মাঝে নিজেকেই খোঁজে মানুষ। নাতনিকে দেখতে দেখতে কি মেয়েকে খুঁজত আর্য? তবে কি মিমিই আবার সেই ছোট্টটি হয়ে ফিরে এসেছিল? অপর্ণার মনেও মাঝে মাঝে এরকম এক ধন্দ জাগত বটে, পাশেই হাস্যমুখী গিন্নিবান্নি মেয়েকে সশরীরে দেখে ভেঙেও যেত বিভ্রম।

আর্যর ভ্রান্তিটাও বুঝি কাটাতে চাইল অপর্ণা। অথবা পরখ করতে চাইল আর্যকে। বেশ জোরেই বলে উঠল—মিমির মেয়েও দেখতে দেখতে এরকম বড় হয়ে যাবে।

ঝপ করে অ্যালবাম বন্ধ করল আর্য। শব্দ করে আলমারি খুলে রেখে দিল সব কটা অ্যালবাম। পাঞ্জাবি খুলে খাটের বাজুতে রাখল। বিছানায় সটান শুয়ে বলল,—তা হলে কাল অফিসে গিয়ে টিকিটটা করতে দিয়ে দিই?

—কিসের টিকিট?

—বারে, কথা হল না আমরা বেড়াতে যাব। পুরী-ফুরি নয়, আরও দূরে কোথাও যাব...ধরো কন্যাকুমারিকা!

—সে তো লম্বা ট্যুর হয়ে যাবে!

—হবে। অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। কতদিন আমরা দুজন এক সঙ্গে ঘুরিনি বলো তো? লাস্ট বোধহয় সেই হানিমুন...

—আরেক বারও গিয়েছিলাম, স্যার। আমাদের বিয়ের এক যুগ সেলিব্রেট করতে...দীঘা। মিমি তখন সামারে মামার বাড়ি গিয়েছিল।

আর্য হাসল,—তখন তো পিছুটান ছিল। এবার একেবারে খোলা হাত-পায়ে যাব। প্রায় সেই হানিমুনের মতো। যেখানে সেখানে ঘুরব, যেখানে খুশি থাকব...। আফটার অল আমাদের দুজনের জন্য তো শুধু আমরাই আছি, নয় কি?

উচ্ছ্বাসের আড়ালে আর্য নিজেকে গোপন করতে চাইছে। অপর্ণা বুঝতে পারছিল। সাদাসিধে সরল মানুষটাকে এই জন্যই যেন ভাল লাগে বেশি। যত নিজেকে লুকোতে চায়, ততই যেন ধরা পড়ে যায়।

আর্যর কষ্টের স্থানটায় হাত বোলাতে চাইল অপর্ণা। বলল,—সে হবে'খন। এখন কাজের কাজটা আগে সেরে ফ্যালো তো দেখি।

—কী কাজ?

—এখনো দশটা বাজেনি, সল্ট লেকে একটা ফোন করো।

—কেন করব? আর্য ফুঁসে উঠল,—ফোন করাটা ওদের ডিউটি।

—ডিউটি সবই বাবা-মার, এটা বোঝ না?

—না, বুঝি না। বুঝতে চাইও না। বিছানা হাতড়ে আবার একটা সিগারেট ধরাল আর্য। জোরে জোরে টানছে, কাশছে ঘঙখঙ।

হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল অপর্ণা। চোখ পাকিয়ে বলল,—বোঝ না বলেই তো এত ছটফট করছ! ঠিক আছে, আমিই ফোন করছি।

—নো। নেভার। তুমিও করবে না। আই ওয়ার্ন ইউ। ওদের কথা আর একটাও নয়।

আর্যর চিৎকারটাকে হাহাকার বলে মনে হল অপর্ণার। চোখের পাতা ভিজে এল। মেয়ে বোঝে না, জামাই বোঝে না, কেউ কিচ্ছুটি বোঝে না!

অপর্ণা মনে মনে মৃদু অভিশাপ দিল মেয়েকে,—তোদের মেয়ে বড় হোক মিমি, তোরাও টের পাবি!

ফোন শেষ পর্যন্ত এল না। শুয়ে পড়েছে স্বামী-স্ত্রী।

রাত্রে শোওয়ার সময়ে এক জগ জল চাই অপর্ণার। সঙ্গে দুটো গ্লাস। দুটো গ্লাসই জলে ভর্তি থাকবে, রাত্রে ঘুম ভাঙলে দুটো গ্লাস থেকেই এক চুমুক করে জল খাবে, আবার ঢাকা দিয়ে রাখবে জল, এটাই অপর্ণার অভ্যাস। শুধু জল খাওয়ার জন্যই বার বার তার ঘুম ভেঙে যায় রাত্রে। গত চার মাসে তো ঘুম গাঢ়ই হতে পারেনি, কতবার করে যে উঠেছে নাতনি। দুধ খায়, হিসি করে, পটি পরে, কখনও বা জেগে উঠে শুধু অপার্থিব খেলা করে যায়, হেসে ওঠে খলখল।

আজ সম্পূর্ণ অন্য কারণে অপর্ণার ঘুম ভেঙে গেল। শীত করছে বেশ। মিমির খুব গরমের ধাত, নাতনিরও শীতবোধ নেই, পাখা তাই ফুল স্পিডে চলেছে এতদিন। কালও। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগত বটে, কই এত শীত তো অপর্ণার করেনি কোনওদিন।

অপর্ণা শুয়ে শুয়েই মশারির চালে রাখা বেডসুইচ টিপল। আলো জ্বলতেই চমকেছে সামান্য। পাশে আর্য, চার মাস পর, ঈষৎ কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

বিছানা থেকে নেমে পাখা দু পয়েন্ট কমিয়ে দিল অপর্ণা। দুটো পাতলা চাদরও নিয়ে নিল বিছানায়। মুখে জল পুরে আবার শুতেই আরও চমকেছে অপর্ণা। জেগে আছে আর্য!

অপর্ণা কোঁত করে গিলে নিল জলটা,—কী হল, ঘুমোওনি?

—ঘুম আসার উপায় আছে? তোমার আক্কেলটা দেখছিলাম।

—আমি আবার কী করলাম?

—এত জোরে ফ্যান চালিয়ে শুতে রোজ? বাচ্চাটার যে নিউমোনিয়া হয়ে যায়নি, এটাই আশ্চর্য!

অপর্ণা আলো নিবিয়ে দিল,—ভুলে যেও না, ওটা মিমির মেয়ে। তোমার মেয়ের কোনওদিন ঠাণ্ডা লাগতে দেখেছ?

—ফুটফুট্টি যদি মায়ের ধাত না পায়! শ্যামল তো বারো মাসই নাক টানে আর ফ্যাচোর ফ্যাচোর হাঁচে।

—ও মেয়ে মিমিরই কার্বনকপি হবে, বলে রাখছি। থুতনিটা দ্যাখোনি? ছুঁচোলো। মিমির মতো। নাকটা তো পুরো মিমি।

—তাই কি? আমার তো অন্যরকম লাগে। চিবুক কপাল চোখ সবই তো শ্যামলের।

—দূর, তোমার চোখ নেই! ওর হাঁ-মুখ একেবারে বসানো মিমি।

—মনে হয় না। মাথায়ও কত চুল। কোঁকড়া কোঁকড়া। শ্যামলের মতো।

—চুলটুকুই যা শ্যামলের পাবে। হাত-পায়ের আঙুলগুলো লক্ষ করোনি? লম্বা লম্বা। সরু সরু। মিমি হওয়ার পর সকলে বলত, আঙুল না কলাবতীর কুঁড়ি। ফুটফুট্টি হওয়ার পরেও সবাই এক কথা বলেছে!

না চাইতেও এক অনুপস্থিত শিশুর কুহকে জড়িয়ে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী। অর্থহীন কুজনে বাঙ্ময় হয়ে উঠছে অন্ধকার। কালো ঘর ভরে উঠছে নীলাভ দ্যুতিতে। স্বামী স্ত্রী ফিরতে চাইছে, থামতে চাইছে, নিজেদেরকে মুড়তে চাইছে ঘুমের আবরণে। সল্টলেকে এক শিশু শুয়ে শুয়ে হেসে চলে খলখল, কোমল দুটি পায়ের অস্থির নড়াচড়া তার ঝনঝন শব্দ তোলে যাদবপুরের ফ্ল্যাটে।

মায়া, বড় মায়া। এ মায়া কাটে না কিছুতেই। প্রাণপণে চাইলেও না।

খাঁচা

দিনটার কোন পৃথক রূপ ছিল না। একই ছন্দে, একই নিয়মে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে এসেছিল। শীতের সন্ধে। অর্কপ্রভ জানত না শুধু তার জন্যেই দিনটা আজ অন্যরকম।

অফিসে বসে রিপোর্টটা আরেকবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিল অর্কপ্রভ। পার্কার অ্যান্ড স্টিভেনসনের তৈরি প্রোজেক্ট রিপোর্ট, তথ্য আর পরিসংখ্যানে ঠাসা। চা ইস্পাত ফুডপ্রোডাক্ট-এর পর এবার অর্কপ্রভদের কোম্পানি হোটেল ব্যবসাতে নামতে চায়। বিদেশি সহযোগিতায়। একই সঙ্গে তিন শহরে। দিল্লি মুম্বাই কলকাতা।

অর্কপ্রভর হাতে আর সময় বেশি নেই। থাকেও না কখনও। কাল সকালের ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছেই বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে হবে। লা মেরিডিয়ানে। সঙ্গে চেয়ারম্যান থাকছেন, এম. ডি-ও। কালকের মিটিং ফলপ্রসূ হলে বিদেশিদের সঙ্গে 'মৌ' সই হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার জন্যই এই তোড়জোড়। তার জন্যই এই রিপোর্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া। বার বার।

ইন্টারকমে শব্দ বেজে উঠল। অর্কপ্রভর প্রাইভেট সেক্রেটারি ভীরু গলায় ডাকছে,—স্যার।

দুপুরে অর্কপ্রভর ঘরে মিটিং ছিল। তারপর সেই সাড়ে চারটে থেকে লাল আলো জ্বলছে তার চেম্বারের বাইরে। এ সময়ে ফোন দেওয়ারও নিয়ম নেই ঘরে। চেয়ারম্যান বা এম.ডি-র ছাড়া। কিন্তু তাঁরা তো দিল্লিতে!

অর্কপ্রভ যথেষ্ট বিরক্ত হল,—কী ব্যাপার?

—ম্যাডামের কল আছে স্যার।

ম্যাডামের কল! চকিতে অর্কপ্রভর চোখ কবজির প্ল্যাটিনাম ঘড়িতে। সাড়ে

সাতটা। আশ্চর্য, একটা রিপোর্ট স্টাডি করতে তিন ঘণ্টা সময় লেগে গেল? তবে কি অর্কপ্রভর মস্তিষ্ক আজকাল তত দ্রুত কাজ করছে না? নাকি আজ অর্কপ্রভর দিনটাই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল!

অর্কপ্রভর এই ঘরে অবশ্য 'দিন ফুরোল' বলে কোনও কথা নেই। সত্যি কথা বলতে কি চোদ্দতলার ওপর এই অফিস চেম্বারে দিনের তেমন কোনও অস্তিত্বই নেই। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের জানালা সর্বদা মোটা পর্দায় ঢাকা, ঘর জুড়ে শুধুই বিজলিবাতির রোশনাই।

এখানে বারো মাস একই তাপমাত্রা। একই আলো। একই সুরভি।

অন্যমনস্কভাবে অর্কপ্রভ রিসিভার কানে চাপল। কণ্ঠে মাপা আবেগ,—ইয়েস ডার্লিং?

—কী হল তোমার? তুমি কি আজ খান্ডেলওয়ালের পার্টিতে যাচ্ছ না?

—সরি। ভীষণ ফেঁসে গেছি।

—রাবিশ! আমি সেই কখন থেকে তোমার জন্য ওয়েট করছি...

—প্লিজ ডালিং, তুমি চলে যাও! আমি আসছি। একটু পরে!

—না। গেলে দুজনে একসঙ্গে যাব, না হলে যাবই না।

ওফ্, শোভনা হঠাৎ হঠাৎ এমন বাড়াবাড়ি করে। এমনিতে সময় পেলেই মিসেস খান্ডেলওয়ালের বুটিকে গিয়ে হাহা-হিহি চলছে, একসঙ্গে কিটি পার্টি, লেডিজ ক্লাব, আড্ডা কোনও কিছুরই কমতি নেই, আর এখন দুম করে একেবারে...মেয়েরা পারেও বটে।

অর্কপ্রভ আরেকবার ঘড়ি দেখল,—ঠিক আছে, ওয়েট করো তা হলে। আমি কিছুতেই ন'টার আগে যেতে পারছি না। কালকের ব্যাপারে এখনও অনেকগুলো পয়েন্ট নোট করতে হবে।

—কাম অন অর্ক, ও তুমি কাল প্লেনে যেতে যেতে দেখে নিও।

সহজ সমাধান। এতক্ষণ কেন মাথায় আসেনি বুদ্ধিটা? রিসিভার রেখে ঘুরনচেয়ারে হেলান দিল অর্কপ্রভ। এতক্ষণ টের পায়নি, এখন হঠাৎই বেশ ক্লান্ত লাগছে নিজেকে। চোখ টানছে, ঘাড়ের কাছে একটা মৃদু দপদপ ভাব। প্রেশার বাড়ল নাকি?

সাধারণত সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে অফিস ছাড়ে অর্কপ্রভ। বেশির ভাগ দিন অফিস থেকে সোজা ক্লাব। ক্লাবে কোনও দিন টেনিস, কখনও সাঁতার, কখনও বিলিয়ার্ড। সঙ্গে পরিমিত পান, পরিমিত কথা, পরিমিত হাসি। জীবনটাই এখন এক অদ্ভুত পরিমিতির মধ্যে চলে এসেছে। ভোর পাঁচটায় উঠে লেকে জগিং।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ডাক্তারের পরামর্শ মতো ফিরে এক গ্লাস ফ্রুট জুস। কমলা কিংবা আপেলের। আধ ঘণ্টা পর এক কাপ সুগন্ধি চা। দুধবিহীন। চিনিবিহীন। অফিস বেরনোর আগে ব্রেকফাস্ট। সাড়ে আটটায়। মার্জারিন দিয়ে দু পিস টোস্ট। একটা ছোট্ট মুরগির ডিমের পোচ। কলা। অথবা পাকা পেঁপে। দুপুরের লাঞ্চে স্যুপ স্যালাড টক দই। কোনও কোনও দিন স্যান্ডুইচ, চিকেন সেদ্ধ, পুডিং। সকালের জগিং থেকে রাতে শুতে যাওয়ার আগে দেড়খানা ঘুমের ট্যাবলেট সবই নিয়ম আর পরিমাপে বাঁধা। একমাত্র রাতের খাওয়াটাই এখনও বিশৃঙ্খল রয়ে গেছে। অল্প হলেও এখনও একটু ভাত চাই। সঙ্গে পাক্কা বাঙালি মতে মাছ ডাল শাকসব্জি। অর্কপ্রভর এই ভেতো অভ্যাসটাকে কেউ কোনও ভাবেই ছাড়াতে পারেনি। উচ্চ রক্তচাপ নয়। ডাক্তারের সাবধানবাণী নয়। শোভনাও নয়।

অর্কপ্রভ বোতাম টিপে এবার নিজেই ভাস্করকে ডাকল,—ব্যানার্জি, একবার আসবেন।

যতক্ষণ অর্কপ্রভ অফিসে থাকে ভাস্করও ততক্ষণ অ্যান্টিচেম্বারে মজুত। স্মার্ট ঝকঝকে বছর ত্রিশের তরুণ। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সদাসর্বদা তার গলায় টাই-এর ফাঁসটি নিখুঁত। ঠিক যেমনটি অর্কপ্রভ চায়।

অর্কপ্রভ একবার আড়চোখে দেখে নিল ভাস্করকে,—ফিজিবিলিটি চার্টের কপিগুলো রেডি হয়ে গেছে?

—অনেকক্ষণ স্যার। সপ্রতিভ ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে হাতের ফোল্ডার এগিয়ে দিয়েছে, এখানে সব সাজিয়ে দিয়েছি।

—গুড। দিবাকর কোথায়? ওপরে আছে?

—বাইরেই অপেক্ষা করছে স্যার।

—বদরিকে বলুন সব ফাইল আর কাগজ একসঙ্গে গুছিয়ে দিবাকরকে দিয়ে দিতে। আমি এবার বেরোব।

—রাইট স্যার।

—আপনিও এবার চলে যেতে পারেন। মিস্ জোনস্‌কে ছেড়ে দিয়েছেন তো?

—যেতে বলেছিলাম, যাননি। শি নেভার লিভস বিফোর ইউ স্যার।

—সে কি! এত রাত অবধি! না, না, আস্ক হার টু গো।

মুখে বললেও মনে মনে বেশ তৃপ্তি অনুভব করছিল অর্কপ্রভ। তাকে ঘিরে একটি জগৎ আবর্তিত হয় এই চিন্তাতেও যে কী গভীর সুখ। একটু হাসি হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল অর্কপ্রভ। এবার সে অ্যাটাচড্ টয়লেটে ঢুকে মুখেচোখে সামান্য জল ছিটোবে, তুর্কি তোয়ালের নরম আরাম চাপবে দু গালে, পাতলা হয়ে আসা

ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলে আঙুল ডোবাবে। সাদা মার্বেল বসানো টয়লেটের একটা দেওয়াল জুড়ে প্রকাণ্ড পেন্টিং, সেদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকবে কিছুক্ষণ। বিশাল ক্যানভাস জুড়ে সেখানে শুধুই এক রমণীর উন্মুক্ত পিঠ। বাদামি। মাংসল। অল্প বেঁকে থাকা শিরদাঁড়ায় সরু গভীর খাত। এই নারীশরীরটিকে অর্কপ্রভ চেনে না। শোভনা ছাড়াও যে কটি নারীদেহ তার চেনা, তাদের একটির সঙ্গেও মিল নেই ওই রমণীর, অথবা আছে কিনা খেয়াল করেনি অর্কপ্রভ। তবু ওই খোলা পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকলে অর্কপ্রভর পঞ্চাশ বছরের শরীরটা টন্‌কো হয়ে ওঠে, ঝপ করে বয়স অনেকখানি কমে যায় যেন। ক্লান্তিহীন। ব্যাধিহীন। উৎকণ্ঠাহীন। বিষাদহীন। ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার মেয়েটি কি জেনে বুঝেই অর্কপ্রভর টয়লেটে এই ছবি টাঙিয়েছিল? ছবি থেকে চোখ সরিয়ে বার বার আয়নায় নিজেকে দেখে অর্কপ্রভ। উঁহু, ঠিক নিজেকে দেখে না, দেখে পঞ্চাশের অর্কপ্রভকে। পঁচিশের তরতাজা অর্কপ্রভর চোখ দিয়ে। দর্পণের মানুষটা কেমন যেন গাঁট্টাগোট্টা! একটু হোঁতকা ধরনের। চিবুকের নিচে দ্বিতীয় চিবুক। গালের খাঁজে খাঁজে থলথলে চর্বির আভাস। কুঞ্চিত চুলের ফাঁকফোকরে ছোট্ট ছোট্ট সাদা ঢেউ। দেখতে দেখতে অর্কপ্রভ ফিক করে হাসে একবার। একবারই, ব্যাস। ফের গাম্ভীর্যের মুখোশে আড়াল করে ফেলে নিজেকে। অধস্তনদের সামনে সে পারতপক্ষে মুখে হাসি রাখে না। এক চিলতে হাসিকেই ওরা প্রশ্রয় ভেবে মাথায় চড়ে বসতে পারে। হাসির জন্য স্থান-কাল-পাত্র আছে। মাপ আছে। অর্কপ্রভ জানে।

টয়লেটের দরজা খুলে অর্কপ্রভ সোজা বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে। বদরিনাথের সেলাম নিল, নিজস্ব দৃপ্ত ভঙ্গিতে পার হল শূন্যপ্রায় অফিস প্রাঙ্গণ। অফিসের বাইরে লম্বা করিডোর, আধোআলোমাখা। রাত-পাহারার জন্য সিকিউরিটির লোকজন এসে গেছে, তাদের দু-একজনের টুকরো অভিবাদন মাথা ঝাঁকিয়ে গ্রহণ করল অর্কপ্রভ। একেবারে লিফটের কাছে পৌঁছে ঘাড় ঘুরিয়েছে। দিবাকর। একটু পিছনে। দিবাকরের কাঁধে অর্কপ্রভর জলের ফ্লাস্ক, এক হাতে ফাইলের বোঝা, অন্য হাতে ব্রিফকেস।

এক ডাকেই স্বয়ংচালিত লিফট এসে হাজির। স্বমহিমায় অর্কপ্রভ প্রবেশ করল লিফটে। সঙ্গে দিবাকর। লিফট নামছে এবার। দরজার মাথায় টিপটিপ জ্বলছে সবজে বাতি। নিবছে। জ্বলছে। তেরো। বারো। এগারো। দশ। লিফট মসৃণ গতিতে নামছে। নামছে অর্কপ্রভ। নামছে সিংহনিয়া গ্রুপের চিফ অ্যাডভাইজার। নয়। আট। সাত। নামছে দিবাকর। অর্কপ্রভ সেনের সারথি।

তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। সাত আর ছয়ের মাঝখানে। লিফট থেমে গেল আচমকাই।

দুই

লিফট থেমে গেছে।

তীব্র ঝাঁকুনিটা সামলাতে অর্কপ্রভ সেনের সময় লেগে গেল কয়েক সেকেন্ড। আকস্মিক ধাক্কায় অর্কপ্রভর পা টলে গিয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, কোনওক্রমে লিফটের দেওয়াল ধরে সোজা রাখল নিজেকে।

লিফটের উজ্জ্বল আলো নিবে পলকে জ্বলে উঠেছে বিপদকালীন বাতি। সেই আলোতে দিবাকরের দিকে নজর গেল অর্কপ্রভর। দিবাকরের হাত থেকে ছিটকে গেছে জরুরি ফাইল, মেজেতে উবু হয়ে এক হাতে কাগজ কুড়োচ্ছে লোকটা।

অর্কপ্রভ হায় হায় করে উঠল,—ইশ্‌শ, দিলে তো সব নোংরা লাগিয়ে!

দিবাকর অধোবদন। কিছুতেই সে সব কাগজ একসঙ্গে বাগে আনতে পারছে না। ফাইল তুলতে গেলে কাগজ পিছলে যায়, কাগজ তুলতে ফাইল।

অর্কপ্রভ হালকা ধমক দিল,—আচ্ছা স্টুপিড তো! ব্রিফকেসটা নামাও হাত থেকে। দু হাতে তোল।

বহু কষ্টে কাগজ ফাইল বাগে এনেছে দিবাকর। বিব্রত মুখে ফ্লাস্কের স্ট্র্যাপ গুছিয়ে নিচ্ছে কাঁধে। ব্রিফকেস হাতে তুলে একটু হেসে দাঁড়াল।

লিফট এখনও গোঁয়ারের মতো অনড়।

হলটা কী? এতক্ষণ কেন আটকে আছে? পাওয়ার গেল? বিদ্যুতের অবস্থা তো আজকাল তত বেহাল নয়! অর্কপ্রভ বিরস মুখে লিফটের দেওয়ালে চোখ বোলালো। এমারজেন্সি বাতির তীব্রতা খুব বেশি নয়, তবু লিফটের অভ্যন্তর দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল না তার। বর্গক্ষেত্রাকার কামরা, বড় জোর ছয় বাই ছয়। দরজা দেওয়ালের রঙ ইস্পাতনীল। নিশ্ছিদ্র বন্ধ দরজার পাশে সার সার চাকা বোতাম। জি থেকে ষোলো। পিছন দেওয়ালে টুকরো আয়না। লিফটে ঢুকলে প্রথমেই নিজেকে দেখা যায় সেখানে। সকালে ওঠার সময় ওই আয়নাতে এক সুবেশা যুবতী চুল ঠিক করছিল আজ। দরজার বাঁ দিকে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে লিফট সংক্রান্ত নির্দেশনামা। নিচু ছাদে চার ডানার দুটো পুচকে ফ্যান ডানা মেলে নিথর। কোণায় জড়সড় দিবাকর।

কিন্তু এমারজেন্সি বেলটা গেল কোথায়?

অর্কপ্রভর ব্যস্ত চোখ দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরল আবার,—বেলটা কোথায়? বেল?

দিবাকর নড়েচড়ে উঠল। হাতের বোঝা বুকে চেপে পিটপিট তাকিয়েছে প্রভুর দিকে। মিনমিনে স্বরে বলল,—বেল আপনার মাথার পিছনে স্যার।

—তাই তো!

অর্কপ্রভ সুইচ টিপল। একবার। দুবার। কয়েকবার। শব্দ আদৌ বাজছে কি কোথাও? ছ'তলায়? সাততলায়? ভূমিতে? বোঝা যাচ্ছে না। ঘণ্টার চাবি সজোরে চেপে ধরে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। নাহ্, সম্পূর্ণ বদ্ধ ঘরে বাইরের কোনও তরঙ্গই পৌঁছয় না।

হতাশ অর্কপ্রভ ঘড়ি দেখল, স্ট্রেঞ্জ! এখনও জেনারেটার চলল না কেন? পুরো চার মিনিট হয়ে গেল!

দিবাকর ক্ষীণ গলায় বলল,—জেনারেটার তো আজকাল কম চলে স্যার, তাই বোধ হয় চালু করতে সময় লাগছে।

—হোয়াট ডু ইউ মিন? সব সময় জেনারেটার চলে না বলে তার মেনটেনেন্স হবে না? লিফটের জন্য টুয়েন্টি ফোর আওয়ারস একটা আলাদা জেনারেটার রেডি থাকার কথা!

দিবাকর কথা বাড়াল না।

অর্কপ্রভ গজগজ করে চলল,—কালকেই আমি কেয়ারটেকারের এগেনস্টে কমপ্লেন করছি। এরা ভেবেছেটা কী, অ্যাঁ? বিল্ডিং-এর রানিং মেনটেনেন্স-এর জন্য কম টাকা পে করি আমরা! তার পরও যদি এই ছোটখাটো অ্যামিনিটিজগুলো না পাই...! এত্ত ক্যালাস এসব লোকগুলো! দিব্যি নিচে কোয়ার্টার পেয়েছে, বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছে, এদিকে কাজের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দায়িত্বজ্ঞান নেই! কিছু বলতে যাও, ওমনি ঝাণ্ডা নাচাবে! দ্যাখো গে, বাবু হয়ত খেয়ালই করেনি। হয়ত কোনও তাসের আড্ডায় জমে আছে। হয়ত নেশাভাঙ করে পড়ে আছে। হয়ত এই ভরসন্ধেবেলা...

অর্কপ্রভ ঝপ করে থেমে গেল। কাকে এসব কথা বলছে সে? তারই এক নগণ্য কর্মচারীকে? ড্রাইভারকে? এমন একটা নীচের তলার লোকের সঙ্গে এত কথা বলা কি সাজে অর্কপ্রভ সেনের!

দিবাকর অবশ্য ঘাড় গুজে দাঁড়িয়েই আছে। সে এমনিতেই কথা বলে খুব কম। যথেষ্ট বিনয়ী। শান্ত ধরনের। তার কাজ শুধু সামনে চোখ রেখে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলা। মালিককে পৌঁছে দেওয়া স্থান থেকে স্থানান্তরে। এরকম চুপচাপ লোকই অর্কপ্রভর পছন্দ। আগে একটা ড্রাইভার ছিল, তুলসী না কি যেন নাম, বড় ফুট কাটত গাড়ি চালাতে চালাতে। কথায় কথায় দেশগাঁয়ের গল্প জুড়ত। খরা বন্যা মাছ জমি আরও কত কী হাবিজাবি' এতটুকু লঘুগুরু জ্ঞান নেই।

তবে এই মুহূর্তে দিবাকরের একদম চুপ মেরে যাওয়াটাও ঠিক সহ্য হচ্ছিল না অর্কপ্রভর। এরকম একটা খুপরি জায়গায় চকিতে আটকে পড়েছে দুটো মানুষ, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে, একজন একা কথা বলে চলেছে, অন্যজন নির্বাক, অথবা দুজনেই শব্দহীন, ব্যাপারটাই কী অস্বস্তিকর।

অর্কপ্রভ এই প্রথম খুব কাছ থেকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করছিল তার ড্রাইভারকে। পেশীবহুল ডাঁটো চেহারা, অনেকটা অর্কপ্রভর মতনই। মাথাতেও অর্কপ্রভর সমান সমান। বয়সেও। তবে লোকটার কবজি দুটো অসম্ভব চওড়া! লোমশ তামাটে হাতে গোল দড়ির মতো শিরা-উপশিরা প্রকট। জলপাই-রঙ বুশ শার্টের নীচে খয়েরি সোয়েটার। ভি গলা সোয়েটারের ফাঁক দিয়ে নোংরা গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। ভীষণ খর্বাকৃতি গলা। গলা জুড়ে স্বরনালী জমাট ডেলা। চিবুকে হালকা পোড়া দাগ। পোড়া দাগ, না জড়ুল? কপালে পর পর অসংখ্য ভাঁজ। রোজ যে ছায়া ছায়া দিবাকরকে দেখে অর্কপ্রভ, সে যেন হঠাৎই ভীষণভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে সামনে। কায়িক অস্তিত্ব নিয়ে। অস্তিত্বটা এত প্রখর, এত নিকট, যে হঠাৎ কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল অর্কপ্রভ।

সময় কাটছিল। ধীর লয়ে। থেমে থেমে।

লিফটের নড়াচড়ার কোনও চিহ্ন নেই। দিবাকরও একভাবে নিশ্চল। খানিকক্ষণ এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে অর্কপ্রভ গলা ঝাড়ল। একটু লঘু স্বরে বলল,—কী? দুশ্চিন্তা হচ্ছে, না?

দিবাকর এতক্ষণ পর মুখ তুলেছে,—না তো স্যার!

—কতক্ষণ আটকে আছে খেয়াল আছে?

—না স্যার।

—দশ মিনিট। পুরো ছশো সেকেন্ড।

—হ্যাঁ স্যার।

—তোমার বাড়ির লোক তোমার জন্য ভাবনা করবে না? তার জন্যও তোমার কোনও উদ্বেগ নেই?

—না স্যার।

—ধরো আরও এক ঘণ্টা আটকে রইলে, দু ঘণ্টা আটকে রইলে, ধরো এখনও কেউ কোনও খবরই পায়নি। তবু তোমার দুশ্চিন্তা হবে না?

—না স্যার।

—কী তখন থেকে হ্যাঁ স্যার, না স্যার করছ? নতুন করে ধৈর্য হারাচ্ছিল অর্কপ্রভ। বিদ্রূপের স্বরে বলল,—কেন তোমার দুশ্চিন্তা হবে না জানতে পারি?

দিবাকরের ঠোঁটের কোণে ফিকে হাসি ফুটেছে এবারে,—আমার তো স্যার সাড়ে দশটা এগারোটা অবধি ডিউটিই থাকে। বাড়ি ফিরতে আরও রাত হয়। এখন তো স্যার আটটাও বাজেনি।

অর্কপ্রভর ভুরুতে ভাঁজ পড়ল,—কোথায় যেন থাকো তুমি? তোমার মেমসাহেব বলছিল কোথায় একটা নতুন বাড়ি করেছ?

—বাড়ি নয় স্যার। দিবাকর যেন লজ্জা পেল একটু,—ওই মাথা গোঁজার মতন জায়গা। মেমসাহেব কিছু আগাম দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে কষ্টে-শিষ্টে...। সোনারপুর স্টেশন থেকে অনেকটা ভেতরে স্যার। কামরাবাদের দিকে। সাইকেলে গেলে মিনিট পনেরো লাগে। হাঁটাপথে আধ ঘণ্টাটাক।

কামরাবাদ জায়গাটা কোথায় অর্কপ্রভ জানে না। শোভনাই বলছিল দিবাকর বাড়ি করার জন্য কী সব টাকা-ফাকা নিয়েছে। লোকটা অর্কপ্রভর নিজস্ব চালক হলেও কোম্পানিই তার মাইনেটা দিয়ে দেয়। ওভারটাইমও। শোভনা কত টাকা দিয়েছে দিবাকরকে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? মরুক গে যাক, ওসব শোভনার ব্যাপার। সাংসারিক তুচ্ছ বিষয়ে মাথা গলাতে চায় না অর্কপ্রভ।

গলায়ওনি কখনও। তুচ্ছেও নয়, বৃহতেও নয়। ছেলে ঘর বাড়ি চাকরবাকর ড্রাইভার মালি সব মিলিয়ে গোটা সংসারটাই শোভনার দপ্তর। অর্কপ্রভ সেখানে এক সম্মানিত মেহমান।

টাই-এর নট সামান্য আলগা করল অর্কপ্রভ। অল্প অল্প গরম লাগছে। বাইরে ডিসেম্বরের চড়া শীত তবু এক কণা ঠাণ্ডাও ঢুকছে না খুপরিতে। আবদ্ধ বাতাস উষ্ণ হয়ে উঠছে ক্রমশ।

দিবাকর বুঝি অর্কপ্রভর অস্বস্তি টের পেয়েছে, নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল,

—আপনার কি কষ্ট হচ্ছে স্যার? জল দেব? খাবেন?

অর্কপ্রভ জোরে জোরে শ্বাস টানল,—না না, আমি ঠিক আছি।

—আরেকবার বেলটা বাজাব স্যার?

—লাভ হবে না।

—স্‌স্যার, যদি বলেন একবার খুব চেঁচিয়ে দেখতে পারি।

আচ্ছা গাড়ল তো! এখান থেকে চেঁচিয়ে লোক ডাকবে! এই ভাসমান ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে! যেখানে পৃথিবীর একটি শব্দতরঙ্গও পৌঁছচ্ছে না! আধ ঘণ্টা হয়ে গেল এখনও যখন কোথাও কোনও স্পন্দন নেই তখন বোঝাই যায় বৈদ্যুতিক গোলযোগ হয়নি কোনও। না হলে এতক্ষণেও কি জেনারেটার চলত না? একজনেরও নজরে পড়ত না দুর্ঘটনাটা? নাহ্, অন্য গণ্ডগোল হয়েছে। অন্য গণ্ডগোল। লিফটের।

দিবাকর আবার বিনবিন অনুনয় করল,—স্যার, একবার ডেকে দেখি না? চেষ্টা করতে দোষ কি? আমি একটা খুব ভাল ডাক ডাকতে পারি। বলেই অর্কপ্রভর বিনীত সারথি হঠাৎ বিচিত্র স্বরে চিৎকার করে উঠেছে। চিৎকার নয়, গর্জন। তার হাড়কাঁপানো জান্তব ডাকে ছোট্ট ধাতব কুঠুরি থরথর কেঁপে উঠল।

অর্কপ্রভ শিউরে উঠেছে,—এটা কী হচ্ছে!

—এটা স্যার টার্জানের ডাক। লোকটা হাসছে অমায়িক,—যাত্রায় থাকতে শিখেছিলাম। এ ডাক স্যার মরা মানুষকেও জাগিয়ে দেয়। তাও তো হাত দুটোকে চোঙা করতে পারছি না।

অর্কপ্রভর ভেতরে একটা রাগ দানা বাঁধছিল, তবু কেমন যেন হাসি পেয়ে গেল হঠাৎ। মজা করার ভঙ্গিতে বলল,—সেটাই বা বাকি থাকে কেন? মনের সুখে ডাকো।

সঙ্গে সঙ্গে ফাইল বগলে চেপে ব্রিফকেস মেঝেতে নামিয়ে দিয়েছে দিবাকর। দু'হাত মুখের সামনে গোল করে ধরে আবার তুলল আওয়াজটা,—হোওও হো হোওওহ।

করুণ থেকে তেজী, তেজী থেকে হিংস্র, তালে তালে ঝঙ্কৃত হচ্ছে শব্দ। দেওয়াল থেকে দেওয়ালে আছাড়ি-পিছাড়ি খেল। চক্রাকারে পাক খেয়ে ঘুরে চলেছে। শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ রেশ রেখে দিল অর্কপ্রভর কানের পর্দায়।

আজব কাণ্ড! বাইরে থেকে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে না! বহু দূর থেকে কারা যেন সাড়া দিতে চাইছে!

অর্কপ্রভর আগে দিবাকর বলে উঠেছে,—দেখেছেন স্যার, ঠিক শুনতে পেয়েছে। ভাল করে শুনুন, কাছাকাছিই কথা বলছে ওরা।

অর্কপ্রভ দরজায় কান পাতল। খুব কাছে নয়, তবে শব্দ বেশ স্পষ্ট এখন। সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নামতে নামতে আচমকাই থেমে গেল আওয়াজটা। সম্পূর্ণ নিঝুম। মরিয়া হয়ে অর্কপ্রভ গুম গুম ঘুসি মারল দরজায়। দিবাকরও লাথি মারছে। প্রাণপণে।

ফিরছে। শব্দ ফিরছে। ফিরে এসেও ক্ষীণ হতে থাকল ক্রমশ। তারপর একেবারেই মিলিয়ে গেল।

তিন

শব্দ ফিরল না। লিফট জগদ্দল পাথরের মতো স্থির। যেন চলতেই জানে না। চলেওনি কোনও দিন।

অর্কপ্রভ স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল। প্রাথমিক অসহিষ্ণুতা একভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিল সে, এখন একটা গোপন সিরসিরে কাঁপুনি পাক খাচ্ছে তার মেরুদণ্ডে। কম্পনটা সরীসৃপের মতো শরীর বেয়ে উঠছে, নামছে, হাঁটুর কাছে গিয়ে দুলছে ঘন ঘন।

দিবাকরের মুখচোরা ভাব প্রায় নেই। ওই টার্জানের ডাক ডাকার পর থেকেই। সে-ই এখন দেখছে অর্কপ্রভকে। খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়ার স্বরে বলল,—কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না স্যার। আমি আপনাকে বলছি শুনুন, ওরা চেষ্টা করছে। ভয়ের কিছু নেই।

মুহূর্তে অর্কপ্রভর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। পদমর্যাদা ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছে, কে বলল আমি ভয় পেয়েছি?

লোকটা একটুও অপ্রতিভ নয়,—আপনার স্যার নাকে কপালে ঘাম জমে গেছে। আপনি স্যার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না।

লোকটা কি মজা পাচ্ছে! একদিকের দেওয়ালে হাত চেপে অর্কপ্রভ গর্জে উঠল,—চোপ্। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আমি ভয় পেয়েছি? ছোট্ট কামরা জুড়ে দাপাদাপি করছে অর্কপ্রভ,—দেখে নেব। আ'ইল সি দা কেয়ারটেকার। আ'ইল সি দা সিকিউরিটি গার্ডস। কী ভেবেছে কী সব, অ্যাঁ? খেলা হচ্ছে! সিংহানিয়া গ্রুপের চিফ অ্যাডভাইজার এতক্ষণ ধরে লিফটে আটকে আছে, এখনও রেসকিউ করতে পারল না! আ'ইল জাস্ট কিক দেম আউট অফ দিস বিল্ডিং। অর্কপ্রভ মেঝের প্যাডিং-এ পা ঠুকল। দিবাকরের দিকে ফিরল। চোখ কুঁচকে দাঁত কিড়মিড় করল কয়েক সেকেন্ড,—তোমাকেও দেখে নেব আমি।

—আমি কী করলাম স্যার? আমি তো ভালর জন্যই...

—একটা কথা নয়। একটা কথা নয়। অর্কপ্রভর গলার শিরা ফুলে উঠল, —টার্জানের ডাক ডাকা হচ্ছে! এটা কি চিড়িয়াখানা? না বনজঙ্গল?

অর্কপ্রভর হুঙ্কারে দিবাকর খুব ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না, তবে মিইয়েছে একটু। আহত গলায় বলল,—আপনি স্যার মিছিমিছি রাগ করছেন। সেবার রথের মেলায় আমার মেজ ছেলেটা হারিয়ে গিয়েছিল, ওই ডাক শুনেই তো...। ওরা সত্যি আমার ডাক শুনেছে স্যার।

—চোওওপ। আরও জোরে চেঁচাতে গিয়ে অর্কপ্রভর গলা চিরে গেল। এত জোরে চিৎকার করা তার ধাতে নেই, তাই গলাও যেন বিদ্রোহ করছে। ভাঙা ভাঙা কর্কশ স্বর ছিটকে এল,—আমি তোমাকে চুপ থাকতে বলেছি দিবাকর। কিপ মাম্। আদারওয়াইজ আ'ইল থ্রো ইউ আউট অফ দিস লিফট।

কথাটা বলেই অর্কপ্রভ চেতনায় ফিরল। ধুস্, একথা বলার কোনও অর্থ হয়? সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে চোয়াল শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল অর্কপ্রভ। বার কয়েক নিশ্বাস নিল জোরে জোরে। মাথা ঝাঁকাল।

দিবাকর চুপ মেরেছে। লিফটটার মতোই।

অর্কপ্রভ কুলকুল ঘামছিল। গরম স্যুটে জ্বালা জ্বালা করছে শরীর। নিজের হুঙ্কার নিজেকেই কেমন বিবশ করে দিয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে নিল। রুমালে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। আহ্, একটু যেন শীতল হচ্ছে মাথা। উত্তেজনা বাড়লে ডাক্তার ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করতে বলেছে। ত্বকে। ঘ্রাণে। গন্ধ চিকিৎসা! চিন্তাকে যুক্তির খাতে আনতে চাইল অর্কপ্রভ। এত কেন রেগে গেল সে? তবে কি সত্যিই সে ভয় পেয়েছে? এর চেয়ে বেশি বিপদে কি অর্কপ্রভ কখনও পড়েনি? বছর তিনেক আগে তার প্লেন একবার দিল্লিতে ক্র্যাশল্যান্ডিং করেছিল। একবার গৌহাটি ফ্লাইটে দুর্যোগে পড়ে বিমান উথাল পাথাল। বাতাসবিহীন শূন্যতায় ধপাস করে দু'শ পাঁচ'শ ফিট নেমে যাচ্ছে, লাফিয়ে উঠছে ভয়ঙ্করভাবে। কই, সে সব মুহূর্তেও তো এত ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি! তবে কি ভয় নয়, ভয় ধরা পড়ে যাওয়ার গ্লানিতেই এই বিকার? একটা অসম লোকের কাছে?

না, এ-সব মুহূর্তে অন্য ভাবনায় ঢুকে পড়া দরকার। অর্কপ্রভ চোখ বুজে খান্ডেলওয়ালের পার্টিটাকে দেখতে চাইল। উজ্জ্বল হলঘরে বর্ণময় সমারোহ চলছে এখন। হাতে হাতে গ্লাস ঘুরছে, টুং টাং শব্দ উঠছে, মৃদু আলাপচারিতা চাপা গুঞ্জন হয়ে ভাসছে বাতাসে। তানিয়ার ভুবনমোহন আঁখি ছুঁয়ে যাচ্ছে অভ্যাগতদেব। হ্যালো! হাই! হাউ সুইট! হাউ কিউট! নাইস টু মিট ইউ! আজ পার্টিতে তিন-চারটে কনস্যুলেট থেকে কয়েকজন অফিসারের আসার কথা। তাদের সঙ্গে দেখা হলে ভাল হত। সিংহানিয়া গ্রুপ আর শুধু ভারতে আটকে থাকতে চায় না, এ-দেশের বাজারে দিন দিন প্রতিযোগিতা বাড়ছে, অন্য দেশের দিকেও পা বাড়াতে হবে এবার। তাই নিয়ে ছোটখাটো কথাবার্তা সেরে নেওয়া যেত আজ। অর্কপ্রভ ঘড়ি দেখল। আটটা কুড়ি। শোভনা নিশ্চয়ই এখন ঘর-বার করছে। যা জেদ, এর পর অর্কপ্রভ পৌঁছলেও বোধহয় যাবে না পার্টিতে। শোভনার আত্মসম্মানজ্ঞান অত্যন্ত টনটনে, অফিসে আর ফোনও করবে না একবারও। হয়ত বা এর মধ্যেই পোশাক বদলে গ্লাসে জিন নিয়ে বসে গেছে। ফুঁসছে রাগে।

অর্কপ্রভরই-বা আর এত দেরি করে পার্টিতে গিয়ে কী লাভ? এগারোটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে। অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোতেই হবে রাতে। ভোরে

সাড়ে পাঁচটার মধ্যে দমদমে রিপোর্টিং। ভাবতে গিয়ে হঠাৎই একটা আজব প্রশ্ন মাথায় এল অর্কপ্রভর। দিবাকর বলছিল বাড়ি ফিরবে, যদি ফিরে যায়, অত সকালে ডিউটিতে সে আসবে কী করে? অন্যান্যবারই বা কী করে? অর্কপ্রভ বিস্মিত হল। সে গাড়ির পিছনের সিটে বসে থাকবে, সামনে স্টিয়ারিং-এ দিবাকর, ছবিটা এত অবধারিত যে দিবাকরের কার্যকারণের কথা ভুলেও মস্তিষ্কে আসে না কখনও। আসার কথাও নয়। তাদের এই অবস্থান এত সময় নিরপেক্ষ, এত ঋতু-নিরপেক্ষ যে, সকাল দুপুর বিকেল রাত, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সর্বদাই এ ব্যবস্থা ধ্রুব। তবু এই প্রশ্ন কেন জাগল?

দ্বিধা কাটিয়ে অর্কপ্রভ ডেকেই ফেলল দিবাকরকে,—শোনো।

চোখ অর্ধেক বুজে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল দিবাকর, ধড়ফড় করে সোজা হল।

—আচ্ছা তুমি যে বললে রাত্তির সাড়ে এগারোটার পর বাড়ি ফিরবে, অত দূর থেকে ভোর চারটেয় আবার আসবে কী করে?

—ক্যানিং থেকে শেষ রাতে একটা মাছের ট্রেন আসে, ওতেই উঠে পড়ি। ঢাকুরিয়ায় নামি, তারপর যোধপুর পার্ক হেঁটে চলে আসি।

—অ। তা হলে বেশ কষ্ট হয় তোমার!

—কষ্ট কীসের স্যার? শেষ রাত আমার ভালই লাগে। তারা নিবে গেছে, আলো ফোটেনি, ঠান্ডা বাতাস! এখন তো আবার হাড় কাঁপানো ঠান্ডা! চাদর মুড়ি দিয়ে আসতে যে কী একটা আরাম লাগে! দিবাকর সুযোগ পেয়ে কথা বলেই চলেছে,—মাঝে মাঝে রাতে থেকেও যাই স্যার। যাদবপুরে। শালীর বাড়িতে। মেমসাহেব অবশ্য বলেছেন তেমন হলে আপনাদের একতলার কোয়ার্টারেও থাকতে পারি। তা আমার স্যার ভাল লাগে না।

—কেন? তোমাদের জন্য তো নীচে ভাল ব্যবস্থা আছে!

—জানি স্যার। আসলে আমি স্যার...আসলে স্যার একটু আত্মীয়স্বজন...মানে স্যার নিজের লোকজনের সঙ্গে ছাড়া থাকতে পারি না।

কথা বলে বলে স্থিত হচ্ছিল অর্কপ্রভ। রাগটা নিবছে। হাসিমুখে বলল,— আমরা তোমার নিজের লোক নই? আমাদের কাছে তুমি কাজ করছ, মেমসাহেব তোমাকে কত ভালবাসে...বাড়ি করতে টাকা দিয়েছে...ছুটিছাটা পাও...

—তা নয় স্যার। আমার কিরকম লজ্জা করে। আপনারা স্যার...মানে স্যার...ঠিক আমাদের মতো তো নন! আপনারা যেন একটা কীসের মধ্যে রয়েছেন! আপনাদের কাছাকাছি থাকা...

—কীসের মধ্যে আছি বলো তো?

দিবাকর উত্তর দিল না।

অর্কপ্রভ সামনে ঝুঁকল,—কীসের মধ্যে আছি আমরা, দিবাকর?

অর্কপ্রভর দিকে তাকাল না দিবাকর। বিপদকালীন বাতির জোর কমে আসছে, সেদিকে মুখ ফেরাল। যেন অর্কপ্রভর কথা সে শুনতেই পায়নি।

ঝিম ঝিম আলোতে অর্কপ্রভর মাথা দুলে গেল। দিবাকর তাকে অগ্রাহ্য করছে। আরও ঝুঁকে খামচে ধরল লোকটার কাঁধ,—কী হল? তুমি উত্তর দিচ্ছ না যে?

দিবাকরের বিশেষ ভাবান্তর ঘটল না, অলস ভাবে গা মোচড়ালো,—কী হবে স্যার শুনে?

—দ্যাটস নট ইওর বিজনেস। ফট করে একটা কথা বলে দিলে, এখন উত্তর দিচ্ছ না, তুমি কিন্তু অবাধ্যতা করছ দিবাকর।

—আমি দুঃখিত স্যার।

—বাজে কথা ছাড়ো। চড়াং করে অর্কপ্রভর জেদ চেপে গেল,—ইউ মাস্ট আনসার মাই কোয়েশ্চেন। নইলে আমি তোমার এগেনস্টে স্টেপ নেব।

আলো আরও কমছে। কোনও অদৃশ্য ছিদ্রপথে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়ছে তরল অন্ধকার, ধীরে ধীরে গিলে নিচ্ছে উজ্জ্বলতাকে। প্রাণহীন কক্ষে দিবাকর ক্রমে যেন অপ্রাকৃত আবছায়া। যেন সেই ঈগলের মতো ডানা মেলে আড়াল করছে আলোকে।

দু'হাতে দিবাকরকে ঝাঁকাল অর্কপ্রভ,—তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ দিবাকর। জানো, এই অবাধ্যতার জন্য আমি তোমার চাকরি খেতে পারি?

দিবাকরকে শক্ত স্বরনালী নড়ে উঠল একটু,—তা পারেন স্যার।

—পারি মানে? আ'ইল স্যাক ইউ রাইট আফটার দা...

অর্কপ্রভ বাক্য শেষ করতে পারল না, অপ্রাকৃত ছায়া হাসছে ফিকফিক,—আপনি স্যার কী বলছেন, আপনি নিজেই জানেন না। একবার বলছেন লিফট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন, অথচ আপনার লিফটের দরজা খোলার সাধ্য নেই। এখন বলছেন, বেরিয়েই চাকরি খাবেন। আগে তো বেরোন স্যার। যদি আদৌ বেরোতে না পারেন?

—তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? অর্কপ্রভ দিবাকরের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল। নিজেরই উচ্চারিত 'ভয়' শব্দ চকিতে দখল নিয়েছে মস্তিস্কের। ফিসফিস করে বলল,—কী বলতে চাও তুমি?

—আপনিই বলুন স্যার, আপনি এখন কী পারেন? আপনার কিচ্ছু করার নেই।

আপনি ডাক ছেড়ে চেঁচাতে পারেন না। আমার মতো করেও নয়, নিজের মতো করেও নয়। আপনি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারেন না। আপনি পা ছড়িয়ে বসে পড়তে পারেন না। আপনি জোর করেও হাসতে পারবেন না এখন। আপনি আপনার নিজেরই অবস্থা জানেন না স্যার, অথচ আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাকে শাসন করছেন।

অর্কপ্রভ গুম হয়ে গেল। এক রুক্ষ বিষাদ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। ওই দিবাকর, এই শব্দহীন ক্ষীণপ্রভ কুঠুরি যেন তাকে এক গূঢ় উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সত্যি তো, অর্কপ্রভ কী পারে? সে তো শুধুই একটা শূন্যে ভাসমান আবদ্ধ জীব মাত্র। তার বেশি কিছু নয়।

অনেক উঁচুতে উঠবার নেশায় হাতিবাগানের বনেদি বাড়ির ছেলে একদিন শূন্যে পাড়ি দিয়েছিল। তার বাবা ছিল সম্পত্তির তলানি খাওয়া অকর্মণ্য মানুষ। ছেলেটাও ওভাবে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু সে ওভাবে বাঁচতে চায়নি। তার চোখে সূর্য ছোঁওয়ার নেশা। উঠতে উঠতে কখন যে সে মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে গেল, তারা হয়ে ঘুরতে লাগল নিজস্ব কক্ষপথে! ঘুরতে ঘুরতেই ভোগ। বাসনার পূর্ণতা। লালসার নিবৃত্তি। স্ত্রী। সন্তান। সংসার। সমাজ। এক কালের পৃথিবীর মানুষেরা কখন সরে গেল অনেক দূরে। পঁচিশ বছর পর সেদিন হঠাৎ রাণুদি এল বাড়িতে। ছোট ছেলের একটা ভাল চাকরির জন্য তদ্বির করতে। যে রাণুদিকে চোখের দেখা দেখার জন্য ছটফট করত অর্কপ্রভ, তাকে দেখে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হল না তার। বরং উট্‌কো এসে কাজ নষ্ট করার জন্য কী বিরক্তি, কী বিরক্তি! বিধবা ছোট পিসিমা মায়ের চেয়েও বেশি আদর দিত ছোটবেলায়। তার মৃত্যুসংবাদ এল, চোখে জল তো দূরের কথা, তার শ্রাদ্ধের দিনটা পর্যন্ত অর্কপ্রভ ভুলে গেল! এরা তো তাও এখন বাইরের লোক, এক-একদিন ভোরে বিছানা ছাড়ার সময়ে নিজের স্ত্রীকে দেখে কী চমকে উঠে অর্কপ্রভ! তার পাশে মহিলাটি কে! বড় পরিচিত যেন! পর মুহূর্তেই ভুল ভাঙে। ভাঙলেও ভুলের রেশ রয়ে যায়। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, পরিচিত, এই মহিলা ভীষণ পরিচিত। কিন্তু শুধু পরিচিতই, তার বেশি নয়। ছেলে কানপুর আই আই টি-তে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, ছুটিছাটায় আসে, তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় নেই-ই অর্কপ্রভর। যেটুকু দেখা হয়, নিয়ম মেপে। ডিনার টেবিলে। দুই প্রান্ত থেকে দুজনের তখন শুধু হাই ড্যাড! হাই সান! ব্যস।

ব্যস। হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল মম শুন সব জগৎ জনে। ভাঙা রেকর্ড বাজছে অহরহ। বাজনার তালে কক্ষপথে ঘুরছে তারকা। ক্লাব। পার্টি। অফিস। কনফারেন্স।

সংসার। কক্ষপথে ঘুরছে ভাসমান ত্রিশঙ্কু। কক্ষপথ থেকে এতটুকু নড়ার সাধ্য আছে অর্কপ্রভর?

হঠাৎই প্রাণভয়ে নিজেকে ভুল প্রমাণ করতে চাইল অর্কপ্রভ। দিবাকরকে মুখের উপর একটা জবাবও দিতে চেষ্টা করল যেন। শরীরের সব শক্তি গলায় সংহত করে টার্জানের মতো ডেকে উঠতে চাইল। হোওওও হোওহো। একটি শব্দও বাজল না গলায়।

ক্ষীণ আলো নিবে গেল ঝুপ করে। সব অন্ধকার।

চার

সব অন্ধকার। মিশমিশে আঁধারে ডুবে গেছে নির্বাসিত কক্ষ। অন্ধকার এত ঘন যে কিচ্ছু দেখা যায় না। লাল সবুজ বোতাম নেই, সাদা নির্দেশনামা নেই, ঝকঝকে আয়না নেই, এমনকি দিবাকরও মুছে গেছে চোখ থেকে। শুধু কালো দেওয়ালের অপ্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অনুভব করতে পারছিল অর্কপ্রভ।

অর্কপ্রভর ফুসফুস নিংড়ে এক রাশ ফাঁকা বাতাস দৌড়ে এল। বাতাসই প্রতিধ্বনির মতো ফিরল কাছে,—স্যার।

অন্ধকারে সাঁতার কাটছে অর্কপ্রভর হাত। ছুঁল দিবাকরকে,—আমাকে একটু জল দেবে?

হাতে হাত ছুঁইয়ে দিবাকর ফ্লাস্ক এগিয়ে দিল। কাঁপা হাতে ঢাকনা খুলল অর্কপ্রভ। পুরো জল নিমেষে শেষ। যত না খেল তার থেকে বেশি গড়িয়ে গেছে মুখের বাইরে। কোট শার্ট টাই ভিজে একাকার।

সময় কাটছিল।

সময় কাটছিল না।

প্রতিটি মুহূর্ত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর এখন। প্রতিটি মিনিট যেন এক একটা বছর। অন্ধকার যে এত কালো হয় আগে জানত না অর্কপ্রভ। শুধু কালো নয়, ভয়ঙ্কর। হিংস্র অন্ধকার থাবা বসাচ্ছে শরীরে। কামড়ে ছিঁড়ে তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে অর্কপ্রভর অস্তিত্ব। অশরীরী শক্তি হয়ে দুমড়ে মুচড়ে সংকীর্ণ করে তুলল তার চার পাশ। ছয় বাই ছয় ঘর ছোট থেকে ক্ষুদ্র ক্রমশ।

অর্কপ্রভর দম আটকে আসছিল। মরিয়া হয়ে ডাকল,—দিবাকর?

—আছি স্যার।

—তোমার কাছে দেশলাই নেই? লাইটার? টর্চ?

—টর্চ তো স্যার গাড়িতে আছে। দেশলাই লাইটার আমি রাখি না।

মানে, লোকটা বিড়ি সিগারেট খায় না। অর্কপ্রভ নিজেও ধূমপান করে না,

অভ্যাসটাকে অপছন্দই করে সে। তবু এই নির্দয় কালো গহ্বরে নিজের অভ্যাসটাকে গর্হিত মনে হল তার। কাতর গলায় বলল,—তা হলে কী হবে দিবাকর? একটু আলো না হলে...

—ভয় পাবেন না স্যার। এক্ষুনি অন্ধকার সয়ে যাবে।

অর্কপ্রভ ভরসা পেল না। তবে সত্যিই একটু পরে অন্ধকার সয়ে এল খানিকটা। একটা খুব আবছা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আলোর আভাসও নয়, চোখ বাঁধা মানুষ অন্ধকার থেকে আলোকিত ঘরে গেলে ইন্দ্রিয়ে যতটুকু অনুভূতির তফাত হয় ঠিক ততটুকুই তফাৎ এখন আলো অন্ধকারে।

সেই ক্ষণে অর্কপ্রভ একটা ঘণ্টাধ্বনিও শুনতে পাচ্ছিল। অতি অস্পষ্ট. ওই আলোরই মতো। যেন বহু দূর থেকে, অর্কপ্রভর যৌবন কৈশোর শৈশবের ওপার থেকে ভেসে আসছে ধ্বনিটা। ভেসে আসছে মাতৃজঠরের আঁধার আশ্রয় থেকে। অর্কপ্রভ দিবাকরের হাত চেপে ধরল,—শুনতে পাচ্ছ?

—কী স্যার?

—ঘণ্টা বাজছে। শোনো শোনো, ঘণ্টা বাজছে কোথাও।

দিবাকর দু-এক সেকেন্ড স্থির। তারপর বলল,—না তো স্যার। আপনি ভুল শুনছেন। মনের ভুল।

শব্দটা উবে যাচ্ছে। অর্কপ্রভ এখন চৈতন্যের শেষ সীমায়। ভয়ার্ত স্বরে বিড়বিড় করে উঠল,—বাতাস এত ভারী হয়ে গেছে কেন দিবাকর?

—কই, না তো!

—আমার তা হলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কেন? আমি কি তবে মরে যাচ্ছি দিবাকর?

অর্কপ্রভ টলে পড়ে যাওয়ার আগে দিবাকর ধরে ফেলেছে তাকে। চওড়া কবজিঅলা হাত স্পর্শ করল অর্কপ্রভর কপাল ঘাড় গলা,—এ কী! আপনি এত ঘামছেন কেন স্যার? আমি তো আছি।

দিবাকর সযত্নে মেঝেতে বসিয়ে দিল অর্কপ্রভকে। শরীরটাকে হেলিয়ে দিল দেওয়ালে। ক্ষিপ্র হাতে খুলে ফেলল অর্কপ্রভর কোট, শার্টের বোতাম মুক্ত করল, আলগা করল কোমরবন্ধনী। ফাঁকা ফ্লাস্ক উপুড় করে ঝাঁকাল মুখের কাছে,—মনে জোর আনুন স্যার। নিজেকে শক্ত রাখুন। জোরে জোরে শ্বাস নিন।

ঘরে কোথাও রন্ধ্র নেই, তবু যেন বাইরের কনকনে বাতাস এবার ঢুকে পড়েছে অর্কপ্রভর শরীরে। ঘাম আর শীত জড়িয়ে গেল। দেহের খাঁচা থরথর। রক্তকণিকা অশ্রু হয়ে ঠেলে আসতে চাইছে।

অর্কপ্রভ শিশুর মতো দিবাকরকে আঁকড়ে ধরল,—তুমি ঠিক বলেছিলে দিবাকর। আমি কিছুই পারি না। আমি নিজের হাতেই বন্দী।

অর্কপ্রভ অজ্ঞান হয়ে গেল।

পাঁচ

অর্কপ্রভ ঠিকই শুনেছিল। সত্যিই ঘণ্টাধ্বনি বাজছিল বাইরে। দমকলের ঘণ্টা। বিদ্যুৎ যায়নি, কোন এক যান্ত্রিক গোলযোগে অচল হয়েছিল লিফট। রক্ষণাবেক্ষণের লোকজন অনেকক্ষণ ধরে সারাবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। তার পরই খবর দিয়েছে দমকলে।

দমকলের অভিজ্ঞ কর্মীরা সময় নেয়নি বেশি। মিনিট পনেরোর মধ্যে উদ্ধার করে ফেলেছে দুই বন্দীকে। অর্কপ্রভ তখনও সংজ্ঞাহীন। দিবাকর তখনও পার্কার অ্যান্ড স্টিভেনসনের মোটা প্রোজেক্ট রিপোর্ট দিয়ে বাতাস করছে প্রভুকে।

ভূতলে এসে দু-চার মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরল অর্কপ্রভর। জলের ঝাপটা খেয়ে। কেয়ারটেকার ব্র্যান্ডি মিশিয়ে গরম দুধ এনেছে, তাই পান করে সে এখন চাঙ্গা অনেক।

ছোটখাট ভিড় জমে গেছে। সিকিউরিটির লোকজনরা তো এসেছেই, আশেপাশের আরও কিছু মানুষ ভিড় ঠেলে দেখছে দিবাকর, অর্কপ্রভকে। কেয়ারটেকার অর্কপ্রভকে জিজ্ঞাসা করল,—একটু সুস্থ বোধ করছেন স্যার?

—হ্যাঁ। এবার যাব।

—কাউকে সঙ্গে দিয়ে দেব স্যার?

—না। থাক। দিবাকরের হাতে ভর দিয়ে অর্কপ্রভ উঠে দাঁড়াল। ধীর ক্লান্ত পায়ে কোর্টইয়ার্ড পেরোচ্ছে। রাস্তার ওপার থেকে দিবাকর গাড়ি সামনে নিয়ে এল। বিদেশি গাড়ির পিছনের সিটে শরীর এলিয়ে দিল অর্কপ্রভ। নরম তুলতুলে গদিতে ডুবে গেল।

দিবাকর স্টিয়ারিং-এ বসে ঘাড় ঘোরাল,—বাড়ি যাবেন তো স্যার?

অর্কপ্রভ ঘড়ি দেখল। ন'টা পঁচিশ। এমন কিছু রাত হয়নি, এখনও একবার খাণ্ডেলওয়ালের পার্টি থেকে ঘুরে যাওয়া যায়। চোখ বুজে বলল,—নাহ্‌, আলিপুর চলো। যদি তোমার মেমসাহেব ওখানে গিয়ে থাকে...। ঘুরেই যাই একবার।

বিপন্ন খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে অর্কপ্রভ। সে এখন আবার তার নিরাপদ খাঁচায়।

আত্মহত্যার পরে

লাঞ্চ সেরে সবে অফিসে ঢুকেছে শ্যামলেন্দু, রিসেপশান কাউণ্টার থেকে টেলিফোন অপারেটার মেয়েটি বলে উঠল, স্যার, আপনার বাড়ি থেকে তিন-চারবার ফোন এসেছিল।

এনি মেসেজ?

না স্যার। আপনি ফিরলেই মিসেস সেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ধরে দিতে বলেছেন—,

ধরে দেওয়া কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করল মেয়েটা, যেন শ্যামলেন্দু কোনো পলাতক আসামী। কিম্বা বন কি চিড়িয়া।

শ্যামলেন্দু হেসে ফেলল। সকাল থেকে মেজাজটা আজ তার ফুরফুরে হয়ে আছে। তিন সপ্তাহ টালবাহানার পর আজই মালহোত্রাদের ফাইলটা ছেড়েছেন এম. ডি। টেণ্ডার অ্যাকসেপটেড! মাথার কমপিউটারকে আরেকবার অন করে দিল শ্যামলেন্দু। আঠার লাখের ওয়ান পারসেণ্ট। মানে আঠারোহাজার। সঙ্গে আজই বিকেলে ডিনার। তাজ বেঙ্গলে। এমন একটা শুভদিনে স্বপ্নার হাতে ধরা পড়াটা মোটেই কাজের কথা হবে না।

স্বপ্নার জরুরি দরকারের রকমফের জানে শ্যামলেন্দু। হয় গাড়ি পাঠিয়ে দাও, বেহালায় অনুরাধাদের বাড়ি যাব, নয় তাড়াতাড়ি চলে এস, মেজমামা এসেছেন অথবা নিউমার্কেট থেকে সাড়ে পাঁচটার সময় পিক-আপ করে নিও লক্ষ্মীটি। পনের বছর বিয়ে করা স্ত্রীর এর বাইরে আর কি-ই বা কথা থাকতে পারে স্বামীর সঙ্গে? একটা সময়ের পর বিবাহিত জীবন শুধুই কতগুলো অভ্যাস আর চাহিদা মাত্র। তবু এই মুহূর্তে সামনে দাঁড়ানো তন্বী মেয়েটির সঙ্গে একটু রঙ্গরসিকতা

করার সুযোগ হাতছাড়া করতেও ইচ্ছা হল না। রিসেপশান কাউণ্টারের সামনে গিয়ে গলা নামাল শ্যামলেন্দু, ওয়ারেণ্টটা কিরকম ছিল বলে মনে হয়েছে ম্যাডাম? বেলেবল্? না ননবেলেবল?

উত্তরে মেয়েটিও এক টুকরো মাপা হাসি উপহার দিল ডেপুটি পারচেজ ম্যানেজার শ্যামলেন্দু সেনকে, তা তো বলতে পারব না স্যার। তবে ম্যাডামকে খুব টেন্স মনে হচ্ছিল।

রসিকতার সুর কেটে গেল। বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি? কোনো দুর্ঘটনা? বুবলার কিছু হল? নাকি ভবানীপুর থেকে মা-বাবার কোনো খারাপ খবর এসেছে?

অনেক কিছুই হতে পারে। আবার কিছুই না। স্বপ্না সবসময়েই ছোটখাটো ব্যাপারে অকারণে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কাজের লোকের সঙ্গে ঝগড়া হলেও...। অহেতুক উদ্বিগ্ন হওয়াটা মেয়েদের চারিত্রিক ধর্ম,

ঠিক আছে, ঘরে দিয়ে দিন লাইনটা।

শ্যামলেন্দু নিজের চেম্বারে ফিরল। প্রখর রোদ থেকে হিমশীতল ঘরে ফিরলে এক ধরনের নরম আরাম শরীরকে আলগাভাবে জড়িয়ে ধরে। চেয়ারে গা ছড়িয়ে আয়েস করে একটা সিগারেট ধরাল। দুটো টান দিয়েছে কি দেয়নি, পিপপিপ শব্দ বাজিয়ে স্বপ্না এসে গেছে দূরভাষে, এই শোন, সর্বনাশ হয়ে গেছে!

সর্বনাশ! শ্যামলেন্দু পলকে টান-টান। যে কোনো কথাই স্বরের ব্যঞ্জনায় নিজস্ব গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। স্বপ্নার এখনকার সর্বনাশ মোটেই বুবলার অঙ্কে কম নম্বর পাওয়ার সর্বনাশ নয়। কি হয়েছে?

মালা সুইসাইড করতে গিয়েছিল। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছে। বাথরুম ভেঙে বার করতে হয়েছে ওকে।

শ্যামলেন্দু চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। নাহ্ এই সংবাদের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

স্বপ্না বলে চলেছে, বোধ হয় বাঁচবে না। বিশ্রীভাবে পুড়ে গেছে।...হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ তুমি? হ্যালো-ও?

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য শ্যামলেন্দুর হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়েগিয়েছিল। সম্বিতে ফিরতে সময় লাগল আরও কয়েক সেকেণ্ড। বহু কষ্টে একটাই স্বর ফোটাতে পারল গলায়, কেন?

কেন কি করে বলব? ঘণ্টাখানেক আগে ওর হোস্টেল থেকে ফোন এসেছিল। আমি সেই থেকে তোমাকে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

স্বপ্নার গলা থরথর করে কাঁপছে। শ্যামলেন্দু চোখ বুঁজে ফেলল।

ওকে হসপিটালে নিয়ে গেছে। পিজিতে। আমি পাশের ফ্ল্যাটে বুবলার জন্য চাবি রেখে এখুনি বেরিয়ে পড়ছি। তুমিও চলে এসো, যত তাড়াতাড়ি পার।

টেলিফোন কেটে যাওয়ার পরও শ্যামলেন্দু রিসিভার চেপে রইল কানে। যেন আরও কিছু কথা শোনার আছে। আরও কিছু কথা বাকি রয়ে গেল। অথবা এতক্ষণ ধরে যা শুনেছে তা সত্যি নয়। ভুল খবর দিয়ে স্বপ্না তাকে পরীক্ষা করতে চাইছে না তো?

মালা হঠাৎ এমন কাজ করে বসবে কেন? যথেষ্ট ধীরস্থির বুদ্ধিমতী মেয়ে। ক'দিন আগেই তো চাঁদিপুর বেড়িয়ে এল শ্যামলেন্দুর সঙ্গে। নিজে থেকেই এবার বলেছিল, দোলে পরপর তিনদিন ছুটি আছে শ্যামলদা। চল ক'দিন নির্জন সমুদ্রের ধারে ঘুরে আসি। সবসময় হোটেলের বন্ধ ঘর আর ভাল লাগে না।

—নো প্রবলেম। চল।

—প্রবলেম আছে মশাই। স্বপ্নাদিকে কি বলবে?

—যা বলি। অফিস ট্যুর।

—স্বপ্নাদি যদি আমার হোস্টেলে ফোন করে?

—করবে না। তোমার খোঁজ নেওয়ার এখন ওর সময় নেই। বুবলার পরীক্ষা নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। যদি করেও, অসুবিধে কি? হোস্টেলে বলে যাবে বাড়ি যাচ্ছ, মার কাছে। যেমন বল প্রতিবার।

সেই মালা গায়ে কেরোসিন ঢেলে! কেন?

টেলিফোন অপারেটার পি বি এক্স বক্স থেকে খুট খুট আওয়াজ তুলে চলেছে, কিছু বলছেন স্যার?

চমকে উঠে শ্যামলেন্দু রিসিভার নামিয়ে রাখল। আঙুলে ধরে থাকা সিগারেট পুড়ে পুড়ে বিশাল লম্বা একটা ছাই তৈরি করেছে। চেপে চেপে অ্যাশট্রেতে আগুনটাকে নেভাল শ্যামলেন্দু। হাত বাড়িয়ে টেবিলে রাখা জলের গ্লাসটাকে খামচে ধরল সজোরে। এক ঢোকে খেয়ে নিল পুরো জলটা।

বিবশ স্নায়ুগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। প্রাথমিক আঘাত কেটে যাওয়ার পর মন চেতনায় ফিরছে। মস্তিষ্কের কমপিউটার আপনা-আপনি অন হয়ে গেল। এবার? এরপর? কি কি ঘটতে পারে এখন? হয় মালা বাঁচবে, নয় মারা যাবে—স্বপ্নার কথা শুনে মনে হল মারা যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি মারা যায়, শ্যামলেন্দু কি ধরা পড়ে যাবে?

শ্যামলেন্দুর শিরদাঁড়া বেয়ে সহসা একটা কনকনে স্রোত বয়ে গেল।। সুইসাইড

কেস যখন, তখন নিশ্চয়ই পুলিশ এনকোয়ারি হবে। হয়তো ইতিমধ্যে শুরুও হয়ে গেছে। মালা কি সুইসাইড নোট রেখে গেছে কোনো? আমার মৃত্যুর জন্য আমার জামাইবাবু শ্যামলেন্দু সেন দায়ী, এরকম কোনো? অসম্ভব। মালা তা করতেই পারে না। মালার একটা সরল আনুগত্য আছে তার প্রতি। অন্ধ ভালবাসা। শ্যামলেন্দু জানে।

শ্যামলেন্দু আরেকটা সিগারেট ধরাল। মালা কি এখন সজ্ঞানে আছে! ছিল! কথা বলতে পারছে! মৃত্যুর আগে মানুষ নাকি সবসময় সত্যকে প্রকাশ করে দিয়ে যেতে চায়। ডাইয়িং ডিক্লারেশন না কি যেন বলে। পুলিশ না হোক, ওর হোস্টেলের কাউকে বলে থাকতে পারে কিছু। কিম্বা যে শোরুমে কাজ করে সেখানকার কোনো বন্ধুকে। মারা যাওয়ার আগে স্বপ্নাকেই হয়তো বলে ফেলল সব কথা!

শ্যামলেন্দুর আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট টিপটিপ কেঁপে উঠল। এয়ার কণ্ডিশনড় ঘরে বসেও ঘামছে প্রচণ্ড। তেমন হলে শ্যামলেন্দুকে অ্যারেস্টও করতে পারে পুলিশ। তারপর? শ্যামলেন্দু মুখ দেখাবে কি করে? আত্মীয়স্বজন বলবে, কি বাবা শ্যামল, তোমাকে আমরা ভাল লোক বলে জানতাম—সেই তুমি একটা বাপমরা অসহায় মেয়ের অভাবের সুযোগ নিয়ে...ছি ছি ছি! বন্ধুরাও টিটকিরি দেবে, আসলের সঙ্গে সুদও জুটিয়েছিলি মাইরি। ফেঁসে গেলি তো। অফিস কলিগরা হাসবে, মিস্টার সেনের পেটে পেটে এত ছিল, অ্যাঁ? আর স্বপ্নার কাছে মুখ দেখানোর তো প্রশ্নই ওঠে না। তাদের এতদিনকার নিখুঁত নিশ্চিন্ত জীবন...। সব কটা থিয়োরি মেনে চলা সুখের সংসার...। স্বপ্না হয়তো লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে মালার মতোই কিছু করে বসবে। তারপর? বুবলা? বুবলা যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে, বুবলা কি কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবে তার বাবাকে?

শ্যামলেন্দুর পায়ের নিচে চাপা ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ধকধক ধকধক। কি ভয়ানক প্রতিরোধহীন গতি। ধকধক ধকধক।

অসম্ভব। শ্যামলেন্দু এক ঝটকায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। প্রকৃত সর্বনাশটাকে আটকাতে হবে। আটকাতেই হবে। শ্যামলেন্দু কলিং বেল চেপে ধরল।

বেয়ারা এসেছে, হ্যাঁ সাব?

—শোন, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কেউ খুঁজলে বলে দিও আজ আর ফিরব না।

লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল শ্যামলেন্দু। সোজা গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসেছে, পিজি হসপিটাল চল। জলদি।

ডালহাউসি পেরিয়ে রেড রোড ধরে দুরন্ত গতিতে ছুটছে বাদামি মারুতি। চৈত্রের শেষে এ সময় বড় ধুলো ওড়ে। এলোমেলো হাওয়ার সঙ্গে অসংখ্য ধুলোর কুচি দৌড়ে এসে শ্যামলেন্দুর চুল-মুখের দখল নিয়ে নিল। নিজেও জানে না কি ভীষণ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। রেয়ারভিউ মিরারে তাকে দেখে ড্রাইভার পর্যন্ত অবাক হয়েছে, আভি, ইস ওয়াক্ত, অসপাতালমে কিউ স্যার? ঘরমে কুছু হুয়া কেয়া? কৌন হ্যায় অসপাতালমে?

কোই হ্যায়। শ্যামলেন্দু সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। তার ড্রাইভার মালাকে চেনে না এমন নয়, অনেকবারই দেখেছে। তবে মালার সঙ্গে অভিসারে যাওয়ার সময় সে কখনই ড্রাইভার নেয় না। এসব ব্যাপারে সে অত্যন্ত সাবধানী। যদিও লং ড্রাইভে গেলে আজকাল হঠাৎ হঠাৎ বড় ক্লান্ত বোধ করে। গাড়ি চালানোর জন্য বড় বেশি মনঃসংযোগ দরকার। শ্যামলেন্দুর ধৈর্য একটু কম। তার ওপর মধ্য চল্লিশেই দু-একখানা উটকো উপসর্গ এসে গেছে শরীরে। কোলেস্টেরল বাড়ছে, রক্তচাপ কখনও কখনও মাত্রা ছাপিয়ে যায়। ডাক্তাররা বলে ড্রিঙ্ক করা কমাতে—সিগারেটও। শ্যামলেন্দু কোনোটাই মানে না। আরে বাবা, জীবন তো একটাই। মাত্র ক'দিনের। মিছিমিছি ওইটুকু সময়কে অত বাধানিষেধে আটকে ফেলার কোনো মানেই হয় না।

মালা প্রায়ই বলে, এভাবে কত দিন চলবে শ্যামলদা?

—কেন? আটকাচ্ছে কোথায়?

—আটকাচ্ছে। তুমি বুঝবে না।

—বোঝালেই বুঝব।

—সব সম্পর্কেরই একটা পরিণতি থাকে। কোথাও একটা গিয়ে থামতে হয়।

—তুমি কি চাও বল তো? বিয়ে-থা করবে? ছেলেটেলে দেখব?

—আমি কি তাই বলেছি? তুমি আমার জন্য অনেক করেছ। চাকরিটা থেকে শুরু করে যখন যা আমার দরকার হচ্ছে...তুমি না থাকলে আমাদের সংসারটাই তো ভেসে যেত।

—ব্যস? এটুকুই? তোমাকে আমি ভালবাসি না?

—বাসো?

মালা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হোটেলের জানলা দিয়ে দূরে কোনো গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। অথবা আকাশের দিকে। সেই মুহূর্তে মালা ভয়ংকর অচেনা। সেই অচেনা মালা হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, তুমি স্বপ্নাদিকে আর ভালবাসো না?

—না, বাসি না। চিরকাল মানুষকে একজনকেই ভালবেসে যেতে হবে তার

কোনো মানে নেই। শ্যামলেন্দু বিশ্বস্ত প্রেমিকের মতো ঝটপট উত্তর দিয়ে যায়, স্বপ্নার সঙ্গে অনেকদিন আগেই একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে।

ভুল। ভুল। শ্যামলেন্দু সোজা হয়ে বসল। স্বপ্না বা বুবলা কাউকেই হারাতে রাজী নয় সে। নিজের ভাবমূর্তি কোনোও মূল্যেই হারাতে চায় না মানুষ।

হাসপাতালের মেইন গেট দিয়ে ঢুকছে গাড়ি।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কিস তরফ জানা হ্যায় স্যার?

উত্তর দেওয়ার আগেই শ্যামলেন্দুর চোখ পড়ে গেছে এমারজেন্সির সামনে। স্বপ্না দাঁড়িয়ে আছে। পাশে আরো দু'তিনজন মহিলা।

গাড়িটা দেখতে পেয়ে স্বপ্নাই দৌড়ে আসছে। ফ্যাকাশে নীরক্ত মুখ। শ্যামলেন্দুর এক্কেবারে সামনে এসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, নেই। এখানে আনার কিছুক্ষণ পরেই মারা গেছে। এমারজেন্সিতেই।

বিকেল মরে আসছে। হাসপাতাল চত্বরের পুকুরটার কাছে গিয়ে একটুক্ষণ একা দাঁড়িয়েছিল শ্যামলেন্দু। দুটো বাচ্চা ছেলে পাল্লা দিয়ে পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে চলেছে। ঢিলটা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে জলের গায়ে বৃত্তাকার কাঁপন। শ্যামলেন্দু এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সেদিকে।

মালার মৃত্যুসংবাদ পলকের জন্য আরেকবার সমস্ত অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছিল। পলকের জন্যই। তারপরই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বরাভয় দেয় তাকে, যারে শালা, জোর বাঁচা বেঁচে গেলি এযাত্রা! মালা খুব তাড়াতাড়ি মরে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে শ্যামলেন্দুকে।

মালা কোথাও কাউকে কিছুই বলে যায়নি।

শ্যামলেন্দু দ্রুত সামলে নিয়েছিল নিজেকে। এসব সময়ে মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখা দরকার। ঠাণ্ডা মাথাতেই অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলো করে যাচ্ছে একে একে। তবুও ভাবনারা পথ ছাড়ে কই। ভাবনা না অস্বস্তি? অস্বস্তি না ভয়?

স্বপ্নার ছোট মামা কখন কাছে এসে হাত রেখেছেন শ্যামলেন্দুর পিঠে, মায়াদিকে কিভাবে খবর পাঠানো যায় বল তো?

শ্যামলেন্দু তখনও পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্ন করে ফেলল, কে মায়াদি?...ও হ্যাঁ। ভবানীপুর থানায় গিয়েছিলাম। পুলিশকে দিয়ে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। আজ রাত্তিরেই ওরা খবর পেয়ে যাবেন।

—পুলিশ কিছু বলল?

—যা বলে।, চান্স পেয়ে একগাদা ক্রস করে নিল।

—সত্যি, তোমারই জ্বালা সব থেকে বেশি। আফটার অল তুমিই ওর লোকাল গার্জেন ছিলে তো।

—আরো প্রচুর হ্যাপা বাকি। বডি না ছাড়া পর্যন্ত...

'বডি' শব্দটা নিজের কানেই লাগল খট করে। বডি! বডিই তো।

বেশ খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে স্বপ্না কথা বলছে মালার হোস্টেলের কয়েকজনের সঙ্গে। শ্যামলেন্দুর দৃষ্টি সেদিকে স্থির হল। ওদের মধ্যে হোস্টেলের ডেপুটি সুপার মহিলাটি মোটেই সুবিধার নয়। ভদ্রমহিলার মুখে চোখে সব সময় কেমন সন্দেহ লেগে থাকে। বছর পঞ্চাশেক বয়স, বিয়ে-থা করেননি। এই ধরনের মহিলারা সাধারণতঃ পুরুষবিদ্বেষী হন। এমন রুক্ষ ভাবে তখন কথা বলছিলেন শ্যামলেন্দুর সঙ্গে, যেন মালা তাঁকেই সব থেকে বেশি বিপদে ফেলে গেছে, আপনার কথাতেই ওকে আমরা থাকতে দিয়েছিলাম। এভাবে ঝামেলায় পড়ে যাব কে জানত।

শ্যামলেন্দু স্বপ্নাকে কাছে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে মহিলাও এগিয়ে এসেছেন, তা হলে কখন পোস্টমর্টেম হচ্ছে?

শ্যামলেন্দুর হয়ে স্বপ্নার ছোটমামা উত্তর দিলেন মনে হয় সকালের আগে হবে না।

—কাল বিকেলের আগে তা হলে ছাড়া পাচ্ছে না?

—কি জানি, পুলিশ আটকালে পরশুও হতে পারে।

স্বপ্না বলে উঠল, তোমার কে এক বন্ধু লালবাজারে আছে না? তাকে বলে দ্যাখো না, যদি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা যায়।

স্বপ্নার মুখ চোখ ফোলা ফোলা, চুল উস্কখুস্ক। কান্নাকাটির ছাপ এখনও অত্যন্ত স্পষ্ট। মাসতুতো বোনের শোকে খুবই কাতর হয়ে পড়েছে।

স্ত্রীর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিল শ্যামলেন্দু। স্বপ্নার কি নির্বোধের মতো আস্থা শ্যামলেন্দুর ওপর। আস্থা কেন, নির্ভরতাও।

শ্যামলেন্দু বলল, দেখি কি করা যায়।

সকলেই হঠাৎ চুপ হয়ে গেছে। হাসপাতালে সান্ধ্য ভিড় আর কোলাহলের মাঝেও প্রত্যেকেই নৈঃশব্দ্যের অস্বস্তিতে ভুগছে যেন। প্রত্যেকেই চায় কেউ কিছু বলুক, যা হোক কিছু। সেটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় হোস্টেলের এক মহিলা বলে উঠলেন, মেয়েটা যে কেন এভাবে মরল!

আরেকজন বলল, ওকে দেখে কিন্তু কালও বোঝা যায়নি এমন একটা কাজ করে বসবে।

—কি মিষ্টি স্বভাব ছিল। ধীর, স্থির। কারুর সঙ্গে কখনও ঝগড়াঝাঁটিতে যেত না।

অল্পবয়সী একটি মেয়ে বলে উঠল, ভীষণ চাপাও ছিল। কি জানি চাকরির জায়গায় কোনোও গণ্ডগোল হয়েছিল কিনা!

ডেপুটি সুপার মহিলা বললেন, না না, সেসব কিছু না। ওর দু'জন কলিগ তো একটু আগে এসেছিল। ওরাও কেউ কিছু বুঝতে পারেনি।

—ওর রুমমেট মেয়েটা কিরকম হাসপাতালে একবার মুখ দেখিয়েই চলে গেল দেখলেন? ও হয়তো কিছু জানলেও জানতে পারে।

—না না, ওর সঙ্গেও তেমন ইনটিমেসি ছিল না।

—তা ছিল না। তবে গত সপ্তাহেও তো বলছিল...

স্বপ্না ফ্যাকাসে মুখে জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিল?

—বলছিল ওকে নাকি মাঝে মাঝেই একটা লোকের সঙ্গে গাড়িতে করে ঘুরতে দেখেছে। দেশে যাচ্ছি বলে হুটহাট করে যে দু'তিন দিনের জন্য চলে যেত, ওর ধারণা ও নাকি বাড়ি যেত না। ওই লোকটার সঙ্গেই...

—ও কি করে বুঝল?

—সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাতে উত্তর দিল, মলিনাদি, আমরা মেয়ে মেয়েদের চোখ দেখেই অনেক কিছু বুঝে ফেলতে পারি।

—লোকটাকে ধরতে পারলে...। নিশ্চয়ই কোনো বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছিল।

শ্যামলেন্দুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। প্রসঙ্গটা কি কোনোওভাবেই ঘোরানো যায় না?

ওদের মধ্যে আবার একজন বলল, লোকটার বর্ণনা কিছু দেয়নি?

—এরকম লোকেদের আর কি বর্ণনা হয়! গাড়ি-টাড়ি আছে যখন, নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের মতোই। ভদ্রলোকরাই তো এরকম মেয়েদের ওপর আগে সুযোগ নেয়।

—আপনারা থামুন তো। স্বপ্না এতক্ষণে পরিত্রাতার ভূমিকায় এসেছে, আমি আমার বোনকে চিনি, কখ্খনো কোনো বাজে কাজ করতে পারে না। তাছাড়া সেরকম কারুর সঙ্গে ভাব হয়ে থাকলে আমাকে নিশ্চয়ই জানাত। ওর মতো একটা সরল পবিত্র মেয়ে...

—সরল পবিত্র বলে কি আর ফাঁদে পড়তে পারে না? বরং এইসব মেয়েরাই আগে ফাঁদে পড়ে।

—ঠিক বলেছেন। প্রায়ই তো একটা পুরুষমানুষের ফোন আসত। তার সঙ্গে দশ মিনিট ধরে, পনের মিনিট ধরে, গল্প করছে তো করছেই। জিজ্ঞাসা করলে বলত জামাইবাবুর ফোন...

শ্যামলেন্দু স্থির হয়ে গেছে। স্বপ্নার হাতের চাপে সাড় এল শরীরে। স্বপ্না বিরক্ত মুখে ঠেলছে তাকে, এখানে দাঁড়িয়ে ফালতু কথা গিলবে? নাকি ডাক্তারের কাছ থেকে আরেকবার খবর নিয়ে আসবে? ছোটমামা, তুমি আরেকবার ওর সঙ্গে যাও তো, দ্যাখো বলেকয়ে যদি তাড়াতাড়ি...

শ্যামলেন্দু ছোটমামার সঙ্গে আর এম ও'র অফিসের দিকে এগোল। বুক টিপটিপ করেই চলেছে। স্বপ্নাকে ওই মহিলাদের মাঝখানে রেখে আসাটা ঠিক হল কি?

এমারজেন্সির কাছে পৌঁছে নাকে রুমাল চাপা দিয়েছেন ছোটমামা। একজন ঝাড়ুদার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ময়লা ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের নিজস্ব উৎকট গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে প্রায়। তিন-চারটে লোক স্ট্রেচারে করে এক বৃদ্ধকে নিয়ে হৈ-হৈ করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। তাদের রাস্তা দিতে সরে দাঁড়াল দু'জনে।

—সত্যিই কি মালা কোনও বদমাইশের পাল্লায় পড়েছিল?

শ্যামলেন্দু উত্তর না দিয়ে হাঁটতে থাকল।

—ওরা বলছে বটে, তবে আমারও বিশ্বাস হয় না। স্বপ্না ঠিকই বলেছে। তেমন কিছু হলে তোমরা কি একটুও আঁচ পেতে না? তোমাদের সঙ্গেই সম্পর্কটা সব থেকে ডিপ ছিল। আমাদের কাছে তো আসতই না।

শ্যামলেন্দুর মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কেন যাবে? বিপদের দিনে আপনি ভুলেও খোঁজখবর নিয়েছেন ওদের? সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন, যদি সাহায্য চায়। যদি জায়গা চায় বাড়িতে।...

ভদ্রলোক বলে চলেছেন, তবে যাই হয়ে থাক, মেয়েটার এভাবে মরা উচিত হয়নি। বাড়ির একমাত্র আর্নিং মেম্বার। ওদের সংসারটার এবার কি অবস্থা হবে ভাব তো? ভাইটার একটা চাকরির জোগাড় না হলে...

শ্যামলেন্দু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক ছটফট করে উঠল। নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছে, ও সব কথা থাক না মামা।

—থাক বললেই কি আর সব থাকে? রইল কি? খাবে কি?

শ্যামলেন্দু কলের পুতুলের মতো আর এম ও'র ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল। ডাক্তারটির বয়স ত্রিশের বেশি নয়। ঝকঝকে চেহারা।

শ্যামলেন্দু নিচু গলায় বলল, আমাদের কেসটা...?

—ওহ, সেই বার্ন কেস? আপনারটা কাল বিকেলের আগে হবে না।

—বিকেল কেন?

—তার আগে আরও চারটে বডি আছে। একটা মার্ডার আফটার রেপিং। ওটা আগে দিতে হবে। বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছে, চিন্তা করবেন না, আমাদের এখানে অনর্থক দেরি হবে না। বরং থানাতেই...আপনারা পুলিশের সঙ্গে আগে কথা বলে রাখুন যাতে কাল বিকেলে ক্রিমেট করতে পারেন।

শ্যামলেন্দুরা বাইরে এসে দেখল স্বপ্নার দুই দাদা পৌঁছে গেছে। দু'জনেই দারুণ উত্তেজিত। শ্যামলেন্দুকে দেখেই দৌড়ে এসেছে, কি হয়েছিল শ্যামলদা? মালা সুইসাইড করল কেন?

কেন যে করল সেটা পুরোপুরি শ্যামলেন্দুই কি ছাই বুঝতে পারছে?

বড়দা বলল, শুধুই কি প্রেমঘটিত ব্যাপার?

ছোড়দা বলল, দ্যাখ, মফঃস্বলের বোকা হাবা মেয়ে শহরে এসে কোথায় কোন চক্রে জড়িয়ে পড়েছিল।

—কিছু বলা যায় না, কেউ হয়তো এমন অপমান করেছিল...

—আমার তো মনে হয় না। সেলসগার্লের চাকরি করলে মান-অপমান-বোধ অনেক ভোঁতা হয়ে আসে। একমাত্র প্রেমট্রেম কেসেই...

শ্যামলেন্দু একটু সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। ভাল একটা চাকরির জন্য এই দুই দাদার কাছে মালা কম ঘোরেনি! দু'জনেই ইন্‌জিনিয়ার, বড় ফার্মে চাকরি করে। মালা একদিন বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল, তুমি জানো, বুবাইদা তপাইদা আমাকে দেখলে কিভাবে আঁতকে ওঠে। বুবাইদার বাড়িতে বসে আছি, ভেতরে বুবাইদা বউদিকে বলছে, ও কি এখানে সারা দিনের জন্য বডি ফেলল নাকি! ওকে বল আমরা বেরুবো। বৌদি বলছে—তোমার বোন, তুমি বল। বুবাইদা বাইরে আসার আগেই আমি বেরিয়ে এসেছি।

শ্যামলেন্দু নিজের মনকে বস্তুনিরপেক্ষ করার চেষ্টা করল। একটা মেয়ে কলকাতায় এসে মাসতুতো দিদির বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে, যদিও আপন মাসতুতো দিদি নয়। তার মা দেড়শ কিলোমিটার দূরে এক মফঃস্বল টাউনে থাকে। সংসারে পাকাপাকিভাবে আয়ের সংস্থান নেই, কলকাতার আত্মীয়স্বজনরা নিয়মমাফিক উদাসীন। সেখানে এক জামাইবাবু তাকে একটা ছোট্ট কাজের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, মাসের শেষে দেশে মা ভাই বোনেদের কাছে পাঠানোর মতো টাকাপয়সার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে, নিজেও সাহায্য করে যায় সাধ্যমত, সাহিত্যের ভাষায় বলতে গেলে এক নিমজ্জমান সংসারকে উদ্ধার করেছে। মেয়েটির ভাইবোন এখন খেতে পায়, স্কুলে যেতে পারে, মাকে আধা ভিখারির মতো ঘুরে বেড়াতে হয় না—এর কোনও দাম নেই? আর যদি মূল্য থাকেই সে মূল্য চোকাবে কে? এবং কিভাবে? মূল্য

দিতে হলে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত, শ্যামলেন্দুর সঙ্গে মালার সম্পর্ক কি তার থেকে বেশি গভীর ছিল না? বয়সের অনেক তফাত থাকলেও? তাদের গোপনীয়তা তো ছিল শুধু স্বপ্নার সম্মান রাখার জন্য। আত্মীয়স্বজনরা যাতে মুখ খোলার সুযোগ না পায় তার জন্য।

বুবলা যেন তাকে অশ্রদ্ধার চোখে না দেখে তার জন্য।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? শ্যামলেন্দু নিজের কাছেই নিজে হোঁচট খাচ্ছে বারবার।

একটা মায়াবী বিকেলের কথা মনে পড়ে গেল। ডায়মণ্ডহারবার থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে, রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে গিয়েছিল তারা। নদীর ধারে সার সার নারকেল গাছ। একটা গাছে হাত রেখে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল মালা। পিছন থেকে মালার শরীরের আদলটুকুই দেখা যাচ্ছিল। বেতের মতো ছিপছিপে সতেজ শরীর। শ্যামলেন্দুর বহুবার ব্যবহার করা চেনা শরীর। হঠাৎই কোত্থেকে দুটো ক্ষ্যাপা মোষ দিগভ্রান্তের মতো দৌড়তে দৌড়তে মালার একদম কাছে এসে পড়ল। শ্যামলেন্দু ছিটকে সরে গিয়েছিল, মালা সাবধান। সরে যাও, সরে যাও।

মালা ঘুরেও তাকায়নি।

শ্যামলেন্দু কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি ভয় পাও নি? সামনে অত বড় নদী—পেছনে মোষ!

মালা সোজাসুজি তাকিয়ে ছিল তার দিকে। মালার চোখে সেই মুহূর্তে হাসি. বিষাদ, আশা, নিরাশা কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ শূন্য দৃষ্টি।

—কি হল, কিছু বলছ না যে? মোষদুটোকে দেখেও তুমি দাঁড়িয়ে রইলে? ভয় পেলে না?

দৃষ্টি এতটুকু বদলায়নি। কেবল ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটেছিল, ভয়? কই না তো!

সেদিন ওভাবে কেন তাকিয়ে ছিল মালা?

রাত্রে ডাইনিং টেবিলে বসে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল শ্যামলেন্দু। প্রচণ্ড খিদেয় নাড়িভুড়ি জ্বলে যাচ্ছে, কিন্তু খাবারের দিকে তাকালেই গা গুলিয়ে বমি উঠে আসছে। স্বপ্নাও স্থিরচোখে সাজানো খাবারের দিয়ে তাকিয়ে।

শ্যামলেন্দু একবার বুবলার ঘরের দিকে তাকাল। খাওয়াদাওয়া সেরে বুবলা অন্যান্য দিন এ সময় শুয়ে পড়ে। আজ চুপচাপ সেও বসে আছে পড়ার টেবিলে।

পর্দার ফাঁক দিয়ে বুবলার শরীরের অংশ দেখতে পাচ্ছে শ্যামলেন্দু। এ বাড়িতে আজ শব্দ নিষেধ।

নিষেধ ভেঙে স্বপ্নাই কথা বলল প্রথম। বহুক্ষণ পর। রুটির একটা কোণ নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে লম্বা শ্বাস ফেলল, আমি খালি ভাবছি, মায়া মাসিকে কি করে মুখ দেখাব?

শ্যামলেন্দু চুপ।

আমাদেরই উচিত ছিল ওকে হোস্টেল-ফোস্টেলে যেতে না দেওয়া। এখানে থাকলে চোখে চোখে তা থাকত। কোথায় কার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল...।

শ্যামলেন্দু খাবার টেবিল ছেড়ে ছুটে গেল বেসিনের দিকে। পেট মুচড়ে বমি উঠে আসতে চাইছে। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বমি-ভাবটাকে সামলাল কোনও রকমে। বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে। রাতের দিকে এসময় রোজ একটা হাওযা ওঠে। আজ সেই হাওয়াটাও নেই। খোলা ব্যালকনিতে ভ্যাপসা গুমোট।

স্বপ্না পাশে এসে দাঁড়াল। গলার স্বর ঘড়ঘড় করছে, প্রেগনেণ্ট-টেগনেন্ট কিছু হয়ে গিয়েছিল হয়তো। সেই লজ্জাতেই...

সামনের রাস্তার সব কটা আলো যেন দপ করে নিভে গেল চোখের সামনে থেকে। গত মাসেই মালা এরকম একটা কথা বলেছিল না।

—আমার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় শ্যামলদা। আমরা বোধহয় ঠিক কাজ করছি না।

—ও সব কথা এখন বাদ দাও তো। শ্যামলেন্দু তখন ডুবতে চাইছিল মালার শরীরে।

—না শ্যামলদা, আমার আজকাল কেমন ভয় ভয় করে। খালি মনে হয় স্বপ্নাদির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তোমাদের বাড়িতে গেলে বুবলার দিকে পর্যন্ত ভাল করে তাকাতে পারি না।

—এ তোমার ফালতু কমপ্লেক্স।

—কমপ্লেক্স নয়। আমার সত্যি ভয় করে। ধর যদি কিছু হয়ে যায়? স্বপ্নাদিকে কি বলব?

—হলে হবে। এটা কোনো প্রবলেম হল? হাজার রকম ওষুধ আছে। লক্ষটা নার্সিংহোম। নার্সিংহোমে এসব তো আজকাল জলভাত।

—না—

—কি না?

—আমি ওসব কিছু করব না।

—মানে?

—যদি কেউ আসে তো আসবে।

—তারপর?

—তারপর তুমি ভাববে।

ঝনঝন করে মাথায় হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। গত সপ্তাহে মালা একবার টেলিফোনে বলেছিল না শরীরটা ভাল নেই? তবে কি...তবে কি...। পোস্টমর্টেমে সেরকম কিছু পাওয়া গেলে পুলিশ সহজে ছাড়বে না, প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করবে।

শ্যামলেন্দু আর ভাবতেই পারল না। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে।

—আপনি মালা রায়ের জামাইবাবু?

—হ্যাঁ, মাসতুতো দিদির হাজব্যান্ড!

—আপনি বলছেন আপনিই ওঁর লোকাল গার্জেন ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—হোস্টেলে আসার আগে উনি তো আপনাদের বাড়িতেই থাকতেন?

—হু।

—হোস্টেলে চলে এলেন কেন?

—আমাদের বাড়িতে স্পেস প্রবলেম। বোঝেনই তো, আজকাল একটা এক্সট্রা লোক বাড়িতে থাকলে...

—সে সময়ও কি ওঁর কোনও পুরুষবন্ধু ছিল?

—নাহ্।

—না জানেন না? আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর কিরকম সম্পর্ক ছিল? আবার প্রশ্ন।

—ভাল। কর্ডিয়াল। বোনে বোনে যেমন থাকে আর কি।

—আপনার সঙ্গে?

—বয়স্ক জামাইবাবুর সঙ্গে শালীর যেরকম সম্পর্ক থাকে। আমি ওকে খুবই স্নেহ করতাম।

—আপনার শ্যালিকার মৃত্যুর পেছনে কোনও একজনের পরোক্ষ হাত আছে। আছেই।

—আপনারা শিওর? কমপিউটারের গলা কেঁপে গেল।

—শিওর।

—কি করে?

—ওর হোস্টেলের বোর্ডারদের রিপোর্ট, ওর শো-রুমের কলিগদের কথাবার্তা সেরকমই ইঙ্গিতই দেয়। মে বি হি ইজ এনি বডি। এনি ড্যাম পারসন!

পুলিশ অফিসার শীতল চোখে তাকিয়ে আছেন, অথচ আপনারা কেউ তাকে চেনেন না?

রক্তমাংসের কমপিউটার কপাল চেপে ধরল, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কি তেমন কোন...?

—ও নো। পোর্স্টমর্টেম বলছে ইটস অ্যা প্লেন কেস অফ সুইসাইড। আপনারা যা ভয় পাচ্ছেন তা নয়। শী ওয়াজ অ্যাবসোলিউটলি ক্লিন।

—দেন্?

—সেটাই তো ভাবাচ্ছে। আপনাদের ভাবাচ্ছে না?

শ্যামলেন্দু যন্ত্রের মত মাথা নাড়ল।

—লোকটিকে কোনোওদিনই ধরা যাবে না। এ সব ক্ষেত্রে ধরা যায়ও না। হি হ্যাজ সাকসেসফুলি এসকেপড। এনি ওয়ে, লাশ আপনারা নিয়ে নিতে পারেন।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শ্যামলেন্দু।

লাশ ঘর থেকে লাশ বেরিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বহুক্ষণ। আর কোথাও কোনও চিহ্নই নেই। তবু যে কেন ঘুম আসছে না শ্যামলেন্দুর? খোলা চোখের সামনে শুধুই গাঢ় অন্ধকার। গাঢ় নীল নয়, গাঢ় কালো অন্ধকার। সেই অন্ধকারটাই এখনও হাতড়ে চলেছে শ্যামলেন্দু। এখনও মনে হচ্ছে, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে সত্যিই অন্য কোনও ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল মালার। শ্যামলেন্দু ছাড়াও। হতে পারে—হতেই পারে। মালার সঙ্গে তার দেখা হত আট দশ দিন পরপর। কখনও তারও বেশি। মালা কিভাবে কাটাত মাঝের কটা দিন? হোস্টেলের মহিলারা বলছিল তাদের কারুর সঙ্গেই তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না মালার। অতএব তাদের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রশ্ন ওঠে না। শো-রুমের কলিগরা অবশ্য একটু অন্যরকম বলছিল। মালা নাকি কাজে গিয়ে খুব উচ্ছল থাকত, যেটা একেবারেই মালার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে ছুটির পর কখনই এক সেকেন্ডও কাটাত না তাদের সঙ্গে। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িও যেত খুবই কম। তাহলে সে সব দিন কি করত মালা? অবশ্যই কারুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। হয়তো যে তাকে ফোন করত, সে সব সময় শ্যামলেন্দুই নয়, হয়তো সে ছাড়াও অন্য কেউ। সেই জন্যই বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে যেত যখনতখন। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই। শ্যামলেন্দুর কাছে মালা কৃতজ্ঞ থাকতে পারে কিন্তু তাকে হয়তো সে পুরোপুরি ভালবাসতে পারেনি। ভালবাসা

অর্থাৎ পুরুষরা মেয়েদের কাছ থেকে যা চায়। শতকরা একশ ভাগ বিশ্বস্ততা। তাই যদি হয় তবে শ্যামলেন্দুই বা কেন মালার মৃত্যুর জন্য দায়ী ভাববে নিজেকে? মালার মৃত্যুর আড়াই দিন পরেও মালার চিন্তাতে নষ্ট করবে এক রাত্রির নিশ্চিন্ত ঘুম?

শেষ যুক্তিগুলো প্রাণপণে গ্রহণ করার চেষ্টা করে চলেছে শ্যামলেন্দু। বাইরে কোথাও আচমকা একটা শব্দ বেজে উঠল। শব্দ না পাখির ডাক?

রাত্রিবেলা কলকাতায় কোন পাখি ডাকে? শ্যামলেন্দু একা বিছানায় উঠে বসল। স্বপ্না আজ পাশে নেই। পাশের ঘরে মালার মার সঙ্গে শুয়েছে। নিকষ অন্ধকারে হাত বাড়িয়েও শ্যামলেন্দু বেডসুইচ খুঁজে পেল না।

আবার শব্দটা বাজছে। ভীষণ চেনা শব্দ। কোথায় শুনেছে? গাদিয়াড়ার ট্যুরিস্ট লজে? কোলাঘাটের ডাকবাংলোয়? পারমাদানের হোটেলে? চাঁদিপুরের সি বিচে? কোথায়?

শব্দের স্থানটা মনে না পড়লেও রাতটাকে মনে করতে পারছে শ্যামলেন্দু। বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে কোনও এক নারী-শরীরকে সে বলেছিল, আমি তোমাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। যখনই চোখ বুজি তোমাকে দেখতে পাই।

নারীশরীর কি ধরে ফেলে শ্যামলেন্দুর ছলনা? তবে কেন হেসে ওঠে অত জোরে? অত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তেও?

আমি মরে গেলে তিনদিনও আমাকে মনে রাখবে তো! এই সত্যটা জানার জন্যই কি শুধু মরে যায় মালারা? মরে গেল? আবার শব্দ বাজছে। শ্যামলেন্দু দু'হাতে কান ঢেকে ফেলল।

দাগবসন্তী খেলা

সকাল সকালই বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়েছিল পৃথা। খুব দূরের পথ যদিও নয়, কাছেরও তো নয়। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরলে চল্লিশ মিনিট। অবশ্য রেলকোম্পানির লিখিত সূচী যেমন। আদতে লাগে আরও বেশি। আজও লাগল। ঠিক আগের আগের স্টেশনটাতে শুধু শুধুই দশ মিনিটটাক থম্‌কে রইল গাড়ি। কি, না ট্রেনে ট্রেনে কাটাকুটি হবে ছেলেবেলার দাগবসন্তী খেলার মতন। ওপার থেকে আপ্‌ আসছে কুউউ দম বেঁধে বুকে। ডাউন রইল চোখ বুঁজে পড়ে। আপ্‌ এসে হাঁপ জিরোল খানিক। ফের ছুটল শ্বাস টেনে। শেষ দাগ সে পেরিয়ে গেলে তবে ডাউনের নড়ার পালা। এরকমই নিয়ম খেলাটারও। দৌড়তে দৌড়তে আপ হয়ে যাবে ডাউন। তখন ডাউন নতুন করে আপ হয়ে ছুটে আসে দান দিতে। আপ ডাউনের এই খেলার মাঝেই কখন যে ঘড়ির কাঁটা দশের ঘর পার।

প্ল্যাটফর্মে পা রেখে পৃথা এদিক ওদিক তাকাল। ট্রেনটা তাকে ফেলে চলে যেতেই বুক জুড়ে আচমকা ডুবডুব ভয়। মাঘ সকালেও হাতের তেলো ঘামে বিজবিজ। সদ্য নামা ঝুড়ি, বস্তা আর কেজো হেটো মেয়েপুরুষ যে যার মত ব্যস্ত সবাই। চোখ যদিও উলুক ঝুলুক দামী মোড়কের পৃথার দিকে। ভাবটা এমন তুমি আবার কোন পৃথিবী থেকে এলে হে সুন্দরী? ডানামেলা শিরীষ গাছের ছায়ায় তাড়ির হাঁড়ির পাহারাদার এক কানাবুড়ো। চোখ দ্যাখো তার, এদিকেই স্থির। পৃথা ঘুরে দাঁড়াল। যেদিকে তাকাও শুধু অচেনা মানুষ, অদেখা আকাশ আর অনাত্মীয় গাছগাছালি। ধোপ দুরস্ত জনা চার পাঁচও নেমেছিল বটে। ফোলিও হাতে প্যাণ্ট সার্ট, ঝোলা কাঁধে পাজামা পাঞ্জাবী। একে একে তারাও এখন স্টেশন-

শেষের ঢালের আড়াল। কাঁচা পাকা স্টেশন ঘিরে মরচে লোহার ভাঙা বেড়া। বেড়া ছুঁয়ে এখান সেখান শিরীষ, শিমূল, কৃষ্ণচূড়া। তাদেরই এক গুড়ি ঘেঁসে আধবয়সী দুই মহিলা ঝগড়া করে চলেছে প্রাণভরে। বাপ রে বাপ, কী তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ। পৃথা মিছিমিছিই সেদিকে এগোল। কার কাছে যে হদিশ পাওয়া যায়? কানা বুড়োটাকেই ধরবে নাকি? একা একা ঠিকানা খোঁজা কি সহজ কাজ? তার ওপর সে ঠিকানা যদি হয় চেনা দেখা জগতটার বাইরে, এরকম এক ছবি-ছবি পৃথিবীর মেঠো রাস্তায়? যে রাস্তা গেছে তেপান্তরের মাঠের ভেতর দিয়ে। যে মাঠে শুধুই মাটির আঁচল কামড়ে ধরে হি হি হাসে শিশু ফসলের দল, বাতাস খোলাখুলি চুমু খায় গাছের শরীরে, হঠাৎ কোন একলা পাখি হারিয়ে যায় প্রকাণ্ড আকাশটায়। ভাবতে ভাবতে আরও একটু এগোল পৃথা। এগোতে এগোতে ফিরে তাকাল শূন্য রেললাইনটার দিকে। যেন বালিগঞ্জের ট্রেন নয়, তার শেষ পরিজনটি একটু আগে ছেড়ে চলে গেছে তাকে। মেয়েটাকেই না হয় জোর করে সঙ্গে আনলে হত। কেউ একজন সঙ্গে থাকলেও অনেকখানি ভরসা পাওয়া যায়।

—কোথায় যাওয়া হবে গো দিদিমণি?

পৃথা ফিরে তাকাল। ময়লা ছেঁড়া মিলের শাড়ি যেমন তেমন, গাঁয়ে মুখে শীতের খড়ি, কালোকুলো বাচ্চা কোলে বউটি খানিক দূরে তফাত রেখে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় এক গাড়িতেই ছিল। এক কামরায় ছিল কি? পৃথা ভাবার চেষ্টা করল। গরিব গুবরো মানুষগুলোকে তার সব কেমন একরকম লাগে। রুখুসুখু চুল, ছেঁড়াফাটা চামড়া আর চোয়ালভাঙা মুখের খাঁজে খাঁজে খিদে। আলাদাভাবে ওদের কারুরই কোনও পরিচয় নেই। বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর জীবমাত্র যেন।

গায়ে পড়া বউটি কাছে এগোল, কখুন থিকে দেঁড়িয়ে আছ, তাই ভাবলম জিগিস্ করি। বিডু আপিস যেতি হলে কিন্তুন উদিকে যাও। সেই নাইনের ওপার...

যাক, একজনকে তবে পাওয়া গেছে। পৃথার শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হোল। জংলা ছাপ পিওর সিল্কের আঁচল আলতোভাবে জড়িয়ে নিল কোমরে, নক্সাপেড়ে উলের শাল ছড়িয়ে দিল বুকের ওপর, ঢাউস ভ্যানিটি ব্যাগখানা এহাত ওহাত, মনসাপুকুর গ্রামটা কোথায় বলতে পারো? সেই সাতবিবি না কি যেন ছাড়িয়ে যেতে হয়?

—ওমা; সে তো আমাদেরই গেরাম গো। সিখেনে কাদের ঘরে যাবেন তুমি?

পৃথা চোখ বুঁজল। নামটা ছাই আবার ভুলে গেছে। কি করে থাকবে মনে? কিছু কিছু মানুষ যে আছে যাদের কোনও নাম থাকতে নেই। থাকলেও জানে না কেউ। যেমন আলতাবৌ, বামুনদিদি কিংবা ঠাকুরমশাই। আদ্দিকালের পোস্টকার্ডে সেদিন নামটাকে দেখে বাড়িসুদ্ধ সবার তাই সে কি হাসি, ও বাবা, আলতাবৌ-এর এমন একটা দাঁত কাঁপানো নাম ছিল নাকি! বজ্রবালা দাসী!

কথা বলতে বলতে এগিয়েছে ওরা। প্ল্যাটফর্মের ধুলো নাচিয়ে দোল দোল দুলছে হিমেল বাতাস। দোলনা দুলে একবার এদিকে আসে তো আবার ঘুরে সেই স্টেশনের ওপার, একেবারে ঝাঁকড়াচুলো গাছগুলোর মাথায়। তাদের ঝুঁটি ধরে নামিয়ে আনে রাশ রাশ শুকনো পাতার ঝাঁক।

—তা হ্যাঁ গো দিদি, তোমার মতন মানুষ হঠাৎ পানগোপালের ঘরে কেন গো?

—কে প্রাণগোপাল?

—তা জানোনি? সেই যে তোমার বজোবুড়ির ছেলে।

জড়াতে জড়াতে বৌটির চোখে ক্রমশ চাক বেঁধেছে কৌতূহল। এমন আজব ঘটনা বুঝি জন্মে একবারই ঘটে। কলকাতার বড়বাড়ির, বড়লোকের বউ সে কিনা এসেছে একা একা গ্রামেগঞ্জে? তাও এক গরীব বুড়ির খোঁজে?

—তা হ্যাঁগো, বজোবুড়ি শুনিচি এককালে কলকেতাতে খুব যেত। অনেক ঘর যজমান ছিল সিখেনে। তা তখুন থিকে চেনা বুঝি?

—ঠিক ধরেচ। পৃথার ঠোঁটে আলগা হাসি, আলতাবৌ আমাদের অনেকদিনের চেনা। সেই যখন ছোট আমি, এত্তটুকুন, তখন প্রায়ই যেত। কি সুন্দর যে গান গাইতে পারত। নখ কাটতে কাটতে গান, ঝামা ঘসতে ঘসতে গান, গুনগুন গান শুধু। এখন কেমন আছে গো সে?

—ভাল নেই গো দিদিমণি, মোটে ভাল নেই। একে বয়সের জোর কামড়, তার ওপর হাত গেছে, পা গেছে, কোমর গেছে। চোখেও তেমন দেখতি পায় না কো। যে ঠাঁয়ে খাওয়া, সিখেনেই গু মুত, সিখেনেই ঘুম।

—বলো কি? কেউ নেই তাকে দেখার?

—থাকবে নি কেন? সবই আছে। ছেলে, বউ, লাতি, লাতিন। তবে কেউ তেমন ফিরে চায় না। কারুর যদি মন হল তো দিনমানে একবার সাপসুরত করে দিল বুড়িকে। নইলে যেমন ছিল রইল পড়ে। বউ তো সাঁঝ সকাল গাল পাড়তেচে। শুধু শাউড়ির মরণকামনা। দশবার চাইলি তবে তেষ্টার জলটুকুন দেয়। তা শকুনির শাপে কি আর গরু মরে গো দিদিমণি? সে যত গাল পাড়ে, পেরমায়ু তত বাড়ে বজোবুড়ির।

—ছেলেটা কি করে? তোমাদের প্রাণগোপাল?

—সে আর কি বলবে? একে ঘরে অমন গনগনে বউ, তার সোমসারে নিত্যি অভাব, নিত্যি যাতনা। পাঁচ পাঁচটা পেট হাঁ হাঁ জ্বলতেছে সব্বোসময়। মা মরলে তাও যদি কিছু সুরেহা হয়...। তার ওপরি নেশা ভাঙ-এর বিরাম বিছরাম নেই তার। আতদিন তাড়ি মদ গিলে...

পৃথা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। বউটির ঠোঁটে দুঃখ কাপছে—জগতের এমনই রীত গো দিদি। যে কঁ্যাথায় একদিন জাড় কাটাতে, তাই যখন পুরনো হোল, ছুঁড়ে ফেল তাকে।

ঠিক কথা, ঠিক কথা। এই হোল সাতকথার এক কথা। ছেঁড়া বাসির আদর নেই কোথাও, কোনখানেই। তা সে গরিবের ঘরই বলো আর বড়লোকের। চুপচাপ হাঁটতে থাকে পৃথা। অনেকখানি চলে এসেছে তারা। স্টেশন থেকে নেমে বেশ খানিক হাঁটাপথ, খোয়া বাঁধানো। শেষে ডানদিকে মোড় নিলে ডিগডিগে মজা খাল একখানা। খালের মাথায় বাঁশের সাঁকো। সাঁকো বলতে গোটা তিনেক কাঁচা বাঁশ গায়ে গায়ে ফেলা। তার ওধারে, শরীরে শরীরে জড়ামড়ি আদ্যিকালের দুই সন্ন্যাসী বটগাছ। জটার ভার যেখানে এলোমেলো, ঠিক তার নিচে নিঝুম দাঁড়িয়ে গোটা তিনেক ভ্যান-রিক্সা।

—এখানে সাইকেল রিক্সা পাওয়া যায় না?

—না গো দিদি, দরকারে নোক ভ্যানেই চাপে। তা হেঁটেই চলো না কেন? এমন কি আর পথ? সামনে হোল মাকা লতলা, তা বাদে কারখানার চক, তা পেরোলে সাতবিবি। তারপর মনসাপুকুর আর কতটুকুন?

—নারে বাবা, পাগল নাকি? পৃথা মাথা ঝাঁকাল, আমার মোটে হাঁটার অভ্যেস নেই। তাছাড়া ফিরতেও হবে তাড়াতাড়ি...

ভ্যান-রিক্সায় পা ঝোলাতেই মনটা হঠাৎ খুশি খুশি। শেষ পর্যন্ত ঠিকানাটা খুঁজে তো পাওয়া যাবে। না হয় হোল আলতাবৌ আজ অথর্ব, তবু তাকে খুঁজে পাওয়াটাই যে ছিল আসল কাজ। একা একা জেদ দেখিয়ে আসছে বলে কম ঠাট্টা ছুঁড়েছিল সবাই! পৃথা যেন কোন অসাধ্য কাজে হাত দিয়েছে! রূপক তো শুনে হেসেই অস্থির, তুমি নাকি যাবে সুদুর গাঁয়ে? তাও আবার একা? অ্যাবসার্ড।

—কেন? এমন কিছু হিল্লি-দিল্লি তো আর যাচ্ছি না। শহরতলি পেরিয়ে গেলে কতটুকুই বা পথ?

—তা অবশ্য দূর নয়। তবে তোমার যা নার্ভের জোর, একা এখনও শ্যামবাজারেই যেতে পারো না। ঘাবড়ে টাবড়ে একসা হও। সেই তুমি যাবে কোথায় ধেধধেড়ে, মনসাপুকুর!

—কি আর করি বলো, তুমি যখন যাবেই না আমার সঙ্গে দোকা হতে।

—উপায় নেই। অফিসে এখন বেজায় চাপ। ফাইনাল অডিট, ব্যালান্সশিট...একদিনও কামাই করার জো নেই।

পৃথা কথা বাড়ায়নি। জো'টাই বড় কথা নয়, ইচ্ছেও নেই কারুর। ভাইয়ার না, দাদাবৌদির না, তার আরামপ্রিয় স্বামীটির তো নয়ই। এমনকি মুনিয়া যে মুনিয়া,

তারও নয়। একটা সাতকালে ঠেকা ঝরঝরে বুড়ির অবুঝ খেয়ালে ঠেকনা দিতে কোন বোকা আর মাথা বাড়ায়? একমাত্র কাদা কাদা মনের পৃথা ছাড়া? একটুতে যার মন তলতল, বুকভরা গরম বাতাস, আর চোখ ছাপিয়ে লেবুর জল!

বৌদি তো শুনে মুখ বেঁকিয়ে সারা, বলিহারি শখ যা হোক তোমাদের মায়ের। মানলাম ছেলের বিয়েতে নানারকম শখ আহ্লাদ করতে ইচ্ছে হয়, তা বলে...

দাদা হেসেছিল ঠোঁট চেপে, ভীমরতি, ভীমরতি, এ সব হোল ভীমরতির লক্ষণ। কত বয়স হোল রে মার? পঁচাত্তর পেরিয়েছে?

ভাইয়া আদৌ পাত্তাই দেয়নি, দূর, যত সব আবোল তাবোল ডিস্‌কাশন। কে কবে মরে হেজে পচে গেছে কবে...মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট বায়না ধরে মা...

—বায়না ধরে তো রাখলেই পারিস। পৃথা না বলে পারেনি, এতদিন ধরে যে তোদের বায়নাই শুধু রেখে এসেছে তার একটা মাত্র ইচ্ছেটাকে এভাবে উড়িয়ে দিবি? মনে রাখিস তোর বিয়েটাই মার জীবনের শেষ উৎসব। হয়ত...

—জ্ঞান দিস্ না তো দিদি। যা খুশি শখ হোলেই হোল? কোথায় পাবি তুই এখন সেই বামুনদিদিকে? কিংবা পৈতে বুড়িকে? তারা তো কবেই পটল তুলে...

—আরও আছে রে আরও আছে। দ্যাখ্ গিয়ে হয়ত আলতাবৌই বেঁচে আছে এখনও। নয়ত ধূপওলি মাসি। মনে নেই তাকে? মাস পোহালেই ধূপের গোছা হাতে থেবড়ে বসত মেঝেতে...। বলতে বলতে পৃথার চোখে ঝিকঝিক হাসি, তারপর কী ঘোঁট, কী ঘোঁট। এর হাঁড়ি, ওর হাঁড়ি, তার হাঁড়ি...

—আর সেই বাসনওলিটা? ঠিক কেমন পটিয়ে-পটিয়ে বাসন গছিয়ে যেত মাকে!

—আর ব্ল্যাকজাপান মেছুনিটা? কতবার যে পচা মাছ নিয়ে ঠকেছে মা। মনে আছে বাবা কত বকাবকি করত মাকে? রাগ করত...

—মা কিন্তু বদলায়নি তাতেও।

—চিরকালই মা একরকম। ভালমানুষ, ফুল অফ সেন্টিমেন্টস।

—তবে?

—তবে কি?

—মার এই শেষ সেন্টিমেন্টটা বুঝব না আমরা? এমন কি আর ধন দৌলত চেয়েছে বল্? সাধ হয়েছে ছোট ছেলের বিয়েতে এক সময়ের সব মানুষগুলোকে...

—তুই-ই তবে মেটা সে সাধ। আমাদের অত সময় নেই পাগলামিতে তাল দেওয়ার।

—বেশ তাই দেব। আমিই না হয় যাব আলতোবৌ-এর খোঁজে...

—তাহলে আগে ভুশণ্ডির মাঠে গিয়ে খোঁজ করে দ্যাখ। একসঙ্গে সকলের ঠিকানাই পেয়ে যাবি সেখানে।

ভুশণ্ডির মাঠ নয়, ঠিকানা পাওয়া গেল মার কাছেই। মায়ের বিয়ের পাওয়া মেহগনি আলমারি, তার ভেতরে চোরা খোপ, সেখান থেকে বেরিয়ে এল কাশ্মিরী কাজের গয়নার বাক্স। ডালা খুলতেই, ও মা গয়না কোথায়! এ তো দেখি শুধু কাগজ আর কাগজ। মখমলের ক্যাসকেটটা বোঝাই কেবল পুরনো চিঠি আর বিবর্ণ কাগজ।

মায়ের তখন ফোকলা গালে বালিকা হাসি,

—গয়না আর থাকবে কোথথেকে? তোর বিয়েতে দিয়েছিলাম দশভরি, বউমাকে পাঁচ, তোর মেয়েকে দুই, মানিকের ছেলেকে দুই, কত রইল আর?

—সে তো তুমিই বলবে।

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, ছিল মোটে মটরমালা আর মকরমুখো বালা একজোড়া আর কটা আংটি। রেখেছিলাম ছোটর জন্য। তা ডিজাইন সব সেকেলে বলে এই তো সেদিন বউমা সেসব দিয়ে এল নতুন করতে গড়তে।

পৃথা তখন কথা বলবে কি! গলা ভেঙে কি যে টনটন ব্যথা তখন। চোখ ছাপিয়ে টিলটিল জল। চিরকাল মায়েরা বুঝি এভাবেই ভাগ করে দেয় নিজেকে। তারপর নিজের থাকে কি? থাকে গো থাকে। ওই তো গয়নার বাক্স আবার টইটুম্বুর কেমন। কত লোকের যে ঠিকানা সেখানে—হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া—বাবার চিঠিই দ্যাখো না কতগুলো। গোছায় গোছায় যত্নে বাঁধা। বিয়ের পর পর, সেই যখন মা বাপের বাড়ি, তখন লেখা। কিছু আরও পরে, কখনও সখনও। জমতে জমতে, জমতে জমতে, সুতো কাগজ সবই এখন হলুদ বরন। দূর পাগল, হলুদ কোথায়? হলুদ রঙ কোন ফাঁকে যে টুকরো টুকরো সোনা হয়ে গেছে—সাতনরী, সীতাহার, ব্রেস্‌লেট, মানতাশা।

আলতাবৌ-এর ঠিকানাও বেরোল সেই অলঙ্কারের স্তূপ থেকে। পঁচিশ বছর আগে লেখা পাঁচ পয়সার পোস্টকার্ড একখানা। না হয় তাতে বানান ভুল হাজার, হাতের লেখা কাকের ঠ্যাং, সবই এখন আবছা নীল মিনে করা কাজের মত।

মা বলল, একবার দ্যাখ না গিয়ে পাস কি না তাকে। পৈতেবুড়ি মারা গেছে কবেই। বামুনদি তো চলে গেল তোর বাবার যাওয়ার বছরেই। থাকলে আলতাবৌই আছে...এই না বলে চোখ মুছল কিছুক্ষণ, খোঁজ পেলে বলিস একবার যেন আসে। এ বংশের সব কাজেই তো আসত একসময়—বিয়ে. শ্রাদ্ধ, আঁতুড়তোলা। তারপর

কত যুগ যে কোন খোঁজ নেই আর। সেই যে কী একটা রোগে ধরল তাকে, তারপর থেকেই...

রোগের পর থেকেই কি তবে আলতাবৌ...পৃথা নড়ে চড়ে বসল। ফাঁকা মাঠের সিঁথি ছিঁড়ে ছুটে চলেছে ভ্যান-রিক্সা। মাকালতলা পেরিয়ে গেল। কারখানার চক পেরোব পেরোব। এবড়ো খেবড়ো এঁটেল পথে মাঝে মধ্যেই ঝিকিড় মিকিড় ঝাঁকুনি। শুকনো মাটি এই উঁচু তো নিচু একহাত। শরীরটা হেলে পড়তেই পৃথা পাটাতন খামচে ধরল। অনভ্যস্ত পথে শরীর মন দুইই এখন সামাল দিতে ব্যস্ত। শরীর স্থির তো মন চঞ্চল। মন উদাস তো বেসামাল হাত, পা, কোমর। উদাসী চোখ আকাশ ছুঁল বারকয়েক। আকাশ যেন আকাশ নয়, মাথার ওপর মেলে ধরা ইয়া বড় ঝকঝকে নীল দৈত্যছাতা। তার নিচে আলগা পৃথিবীটা দুপুরবেলা একলা শোয়া খোলামেলা যুবতীর মত শরীরের আড় ভাঙছে। পৃথা নতুন পৃথিবীর শরীরে চোখ বোলাল বারবার। মাঘবেলার সূর্যিরাজা যদিও বেশ নরম সরম, হাওয়া কিন্তু তলোয়ার, ঝকঝকে ধারালো। শালটাকে ভালমতন সাপটে নিল গায়ে। মনসাপুকুরের রোগা বৌ দিব্যি কেমন নির্বিকার। আঁচলখানা যেটুকুনি শীতের আড়াল। তার ভেতরে গুটিসুটি দুধের শিশুটা চুকুর চুকুর দুধ টানছে মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে তার মায়ের মুখও চলছে অবিরাম। এতাল বেতাল কত কথা, বকবক বকবক। জানারও তার আছে কত কিছু; হাজার প্রশ্ন, লক্ষ কৌতূহল।

—হায় মা, তোমার মোটে একটা ছাওয়াল? তাও কি না মেয়ে? ছেলে হবেনি? নাকি অ্যাপ্রশন করেচ? তোমাদের কলকেতাতে তো শুনি দুটো হলেই সব...এই তো আমার ভাসুরপো বউ, যাদবপুরের দিকি থাকে, যেই না তিনটে নামল পেট থেকে, ওমনি ছুট, ওমনি ছুট। কি, না এবার কাটাতি হবে।

বিরক্তি নয়, পৃথার মুখে মজার হাসি, তা তোমার মোট কটা গো?

—কোলেরটাকে ধরলি পরে হয় মোট পাঁচ। তিন ছানা, দুই ছানি।

—আরও হবে?

—সে কথা কি কেউ বলতে পারে দিদি? সবই ভগমানের হাত। তবে গেরামেও এখুন হাওয়া ঢুকছে গো। এই তো সেদিন কুমোর ঘরের নতুন বৌটা...কি সাহস, কি সাহস,...কাউকে কিছু জানতি দিলে না পর্যন্ত...করলে কি না ভাতারকে সঙ্গে নে...মরে যাই কি লজ্জা...কথার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে মনসাপুকুরের বউ কখন ধূপওলি মাসি হয়ে গেছে। ভরা দুপুরে পা ছড়িয়ে বসেছে মেঝেতে, এক গালে টোপলা পান, আরেক গালে রাজ্যের কেচ্ছা কথা। পৃথা হাসছে ঝিলিক ঝিলিক, স্বামী তোমার কি করে গো? জমিজিরেত আছে কিছু?

—নাগো দিদি, তাইলে কি আর ভাবনা ছিল? ঘরে আমরা গুড় বানাই গো। নলেন গুড়, পাটালি গুড়। কারবার বলো কারবার, ওজগার তো ওজগার, তিন পুরুষের এই কাজ। ধরো জাড়ের মুখে ধারকর্জ করে বায়না নিলাম কিছু খেজুর গাছ। যখন যেমন খ্যামতা। তারপর অস নামাও, জাল দাও, পাক মারো...

বারে বা, বারে বা, পৃথার চোখে সত্যিকারের মুগ্ধতা, ছেলেপুলে, ঘরদোর সামলেও তুমি এত কিছু করো?

—তা করি গো দিদি। ভাতার আমার অস পেড়ি আনে, আমি জাল দিই। ছাওয়ালগুলোও খাটে সঙ্গে। এই তো এলাম চাম্পাহাটি থিকে, মহাজনের ঘরে পাটালি দিয়ে।

কথায় কথায় কথা বাড়ে। পথ ফুরোলে কথা ফুরোয়। তারপরই জল ঢলঢল এও বড় দীঘি একখানা। তারই নামে গ্রামের নাম মনসাপুকুর। পুকুরধারে শানঘাট। ঘাট বরাবর দাঁড়িয়ে যায় ভ্যান-রিক্সা। নামার আগেই বউটির নামকরণ করে ফেলেছে পৃথা—নলেন বৌ। নলেন বৌ গাঁয়ে নেমে মাথায় আঁচল টানে, তবে এসো দিদিমুণি, তোমাকে বজোবুড়ির ঘর দেখিয়ে দিই।

ঢোলকলমির ঝোপ বসিয়ে ঘর আর বার পৃথক করা। ঘর বলতে হাত ছয়েক উঁচু এমন এক কুঁড়ে। পুড়ে ভিজে খড়গুলো তার বাদামকালো। কালো চালায় হামা টানছে লিকলিকে উচ্ছে লতা। মেটে দেওয়ালের পিঠ জুড়ে যেখান সেখান ঘুঁটের মিছিল। বাতাস এলেই গন্ধ ঝাঁপায়। কাঁচা ঘুঁটের গোবরগন্ধ। দাওয়া বলতে তেমন কিছুই নেই। উঠোন ফেলে ঘর, ঘর পেরোলে উঠোন। ঘরের ভেতর একটু কোণে পোঁটলা মতন পড়ে আছে কেউ। চারপাশে তার নোংরা কাঁথাকানির ডাঁই। ওটাই আলতা বৌ নাকি? নাকি এ গাঁয়ের বজোবুড়ি? ভেজা ভেজা অন্ধকারে ভালমতন বুঝতে পারল না পৃথা। কিংবা চাইল না বুঝতে। হাসিলেপা ভরাট মুখখানা এখনও ভাসছে যে বুকে। কপালজোড়া মেটে সিঁদুরের টিপ, ঠোঁট দুখানা খয়েরলাল। বড়িখোঁপায় আঁচল ওঠালে কী অপরূপ যে দেখাত আলতা বৌকে।

এক পা ঘরে, বাইরে এক পা, পৃথা দাঁড়িয়ে রইল খেজুরপাতার খোল্‌পাখানা ধরে। ঠিক তখনই রোগে ভেজা বৃদ্ধাকণ্ঠ ভেতর থেকে থরোথরো, কে এল রে? ওরে কে এল? বল্‌ না বউ কে এল?

প্রাণগোপালের বউ-এর গলায় ফিসফিসানি, যাও না কেন ভেতরে, ও দিদি।

যাই গো যাই। এর জন্যই তো আসা এতদূর। পৃথা ফিরে তাকাল। প্রাণগোপালের বউ কখন গামছা ছেড়ে কাপড় জড়িয়েছে শরীরে, সবুজ ডুরের সস্তা শাড়ি। তাও

আবার শতেক ফাটা। ডাগর চোখ শান্ত নরম। ও চোখেও নাকি আগুন নাচে! কে জানে! কাক চিলও নাকি হাঁক শুনলে দৌড়ে পালায়! নলেনবৌ এরকমই বলেছিল বটে। পৃথার সামনে রূপ কিন্তু অন্যরকম। একটু আগে, এই তো কেমন নিজের হাতে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে দিল শাশুড়িকে। গন্ধ তাড়াতে ঘরে ধোঁয়া দিল গুগ্‌গুলের। ছেলে দুটোকে পাঠাল বাপের খোঁজে। পৃথাকেও কত খাতির, কদ্দুর থিকে এসেছ। জিরোও দিকিন আগে। এত পথ এলে, গরিব ঘরের জলবাতাসা টিকুনখানিক মুখে দাও দিনি।

কোন মানুষ যে কখন কিরকম! এই যদি ভাল দ্যাখো তো, এই মন্দ। মন্দ ভাল মিশলে পরে তবে না মানুষ, মানুষ হয়। আহা বেচারী, দুঃখে অভাবে জেরবার হয়ত। অন্নের জন্য দুঃখ, বস্ত্রের জন্য দুঃখ, তাড়িখেকো মাতাল স্বামীটার জন্য দুঃখ! কতটুকুন ঘরটাতে কচিকাচা মিলিয়ে এতগুলো মানুষের থাকা। তায় দোসর ওই পঙ্গুবুড়ি।

আবার গলা কাঁপছে ঘরে, ও বউ, কেমন যেন বাস আসতেছে না? চেনা চেনা, পুরনো অনেক। কে এসেচে, বল্‌ না, ও বউ।

ভ্যানিটি ব্যাগের মুখ খুলে মিষ্টির বাক্সখানা বার করল পৃথা। বুদ্ধি করে খানদুয়েক সস্তা দামের শাড়ি আনলে হোত। কিংবা নিজেরই কোন পুরনো ছেঁড়া। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা অবাকচোখ বাচ্চাগুলোরও নেই কিছুই। ভাবতে ভাবতে এগোল আলতাবৌ-এর কাছে, চেনা চেনা লাগছে নাকি সত্যি? দ্যাখো তো ভাল করে।

ভাঙা মাজা চেপে ধরে টান টান আলতাবৌ। কাদাগোলা ছানি চোখের পাতা দুটো পিটির পিটির, কে বলতো? ঠিক ঠিক চিনতি পারছি নি।

—সেই যে গো, একডালিয়ার বাগচী বাড়ি। ভুবনমোহন বাগচী নয়নমোহন বাগচী...

বুড়ি তবু উথাল পাথাল কথা হাতড়ায়, একডালিয়া? সে আবার কাদের গেরাম? কোন পথ দে যেতি হয়?

প্রাণগোপালের কিশোরী মেয়ে খিলখিল হেসে উঠল। পৃথা বুড়ির শরীর ছুঁল, গ্রাম নয় গো। একডালিয়া সেই কলকাতায়। বালিগঞ্জে নামলে পরে এগিয়ে গিয়ে ডানহাত মোড়ো, তারপর আবার ডান, আবার ডান...

বুড়ির গলা প্যাঁ প্যাঁ বাজে এবার, অনেকটা ঠিক হার্মোনিয়াম রিডের মত, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, পড়েচে গো, মনে পড়েচে। বউমাদের শউড় ঘর তুলল সেবার, সেই নড়াই-এর কালে। সব ত্যাখন পেইলে যাচ্চে কলকেতা ছেড়ে...

আরও ঝুঁকেছে পৃথা। ব্যগ্র মন ঝোকা শরীরে টলমল, চিনেছ তবে?

আলতাবৌ শিশুর মত কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে হাত বোলাল পৃথার মুখে। শক্ত বরফ কাঠি আঙুল, পুরনো বাসি মড়ার যেমন। কপাল থাবড়ায়, চুল থাবড়ায়, গালে হাত, চোখে এসে হাত টিপটিপ। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হাতে প্রাণ ফিরছে, ভাঙা মুখে আলোর আভাস,—চিনেছি গো ছিনেছি। এ চোখ কি আর ভোলা যায় গো? তুমি আমার ছোটবৌদিদি, নয়নদাদার আহ্লাদী বউ, তাই নয়? একইরকম আছ দিকি! বদলাওনি!

পৃথা বুঝি ছিটকে গেল। হায় রে হায়, শেষে তাকে মা বলে ভেবে নিয়েছে আলতাবৌ।

—এতদিন পর কুথথেকে এলে গো ছোটবৌদিদি? কোথায় ছিলে গো এতটা দিন? কতদিন যে দেখিনি তোমাদের...

ধীরে ধীরে কান্না সুর হয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া সেই নখকাটানির সুর। পৃথার ভেতর সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। এমনটা যে হবে একটা আগেও কি ভেবেছিল? ভুলটাকে ভেঙে দেবে নাকি? মা বলে মেয়েকে চেনার ভুল? কি লাভ তাতে? একেবারে ভুল তো নয়। সব মা'ই তো একটু একটু করে একদিন ঢুকে পড়ে মেয়ের মধ্যে। ভাঙতে ভাঙতে, ভাঙতে ভাঙতে, কখন মেয়েরাই যে মা হয়ে যায়। যুবতী মা, যুবতী মা থেকে প্রৌঢ়া মা, প্রৌঢ়া মার দিন ফুরোলে বৃদ্ধা মা। অসম্ভব, এ ভুল ভাঙতে আর যে পারুক, পৃথা পারে না। যে সময়ে বেঁচে ছিল প্রাণভরে, সেই সময়টাকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে বজোবুড়ি।

—হ্যাঁ গো ছোটবৌদিদি, ছেলেমেয়ে সব কেমন আছে? নয়নদাদা? এখনও সেই ছুটির দিনে আপিস করে?

আলতাবৌ কে ছিল মার? বোন? বন্ধু? কাছের আত্মীয় কোন? পৃথা দু আঙুলে কপাল টিপে ধরল। হারানো মানুষগুলো হঠাৎ হঠাৎ এমন হৃদয় মাড়িয়ে যায়!

—বড়বৌদিদি এলনি কেন? ভুবনদাদার বউ? শরীল থাকলি যেতাম তারে একদিন আলতা পরাতি। তোমাদের সক্কলকার বে'তে আমিই ছিলাম, মনে পড়ে? সেই কর্তামার আমল থিকে...

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল পৃথা। মনে শুধুই জবাব সার সার। নয়নদাদা, ভুবনদাদা কোন দাদাই নেই যে গো আর। বড় বৌ তো কবেই চলে গেছে শেষ যাত্রার আলতা পরে।

বুড়ি ব্যস্ত হোল এবার, ও বউ, আমার নরুনখানা খুঁজে দ্যাখ না মা। আর আলতার শিশিখান। ছোটবৌদিদিকে কদ্দিন পর পরান ভরে আলতা পরাই।

এবার বুকের জবাব জল হয়ে নামছে চোখ বেয়ে। পৃথা দাঁতে আঁচল চাপল।

ছোটবৌদিদি তোমার আর কোনদিনই আলতা পরবে না গো। আলতা পরার কাল কবেই তার শেষ হয়েছে।

খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছে প্রাণগোপালের বউ। নাকি হাতের কাছেই ছিল? নরুন, ঝামা, পেতলের ছোট আলতাবাটি, রাঙাজবার শিশি একখানা। ছেলের বউই শাশুড়ির কাজ করে নাকি এখন? নাকি নাপিতঘরে মজুতই থাকে এসব? ঠকঠকে হাত পা ছুঁয়েছে। পৃথার শরীর জুড়ে শিহরণ খেলে গেল। এ দৃশ্য দেখলে মুনিয়াটা হেসে কুটিপাটি যেত, মা, তুমি আলতা পরছ নাকি! কোনদিন তো দেখিনি!

—দেখিসনি তো কি আছে, দ্যাখ্। মানায়নি আমাকে?

—মোটেই না, মোটেই না। তোমার পায়ে আলতা! ওফ, হরিবল্। ব্যাপারটাই ভীষণ প্রিমিটিভ।

হ্যাঁ প্রিমিটিভ। সেই প্রিমিটিভ হাত এখন নরুন ধরেছে। নরুন ছুঁল নখ, নাকি নখই ছুঁল নরুনকে। দেখতে দেখতে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছড়িয়ে গেল চারদিকে। আঙুল থেকে গোড়ালি, আবার আঙুল। আলতাবৌ এও ভুলেছে, এসব তাকেও ছুঁতে নেই আর। পৃথা উঠে দাঁড়াল। দুটো পায়ের গোটা পাতাই রক্তে রক্তে টসটস। এ রক্ত বড় সুখের রক্ত। এ রক্তে বাঁধা পড়ে মায়া। বোধহয় এরই নাম ভালবাসা।

ফেরার পথে পা পড়ছে এলোপাথাড়ি। এত দূর ভেসে গেলে ফিরে যাওয়া কি সহজ হয়? ঢোল কলমির বেড়ার ধারে প্রাণগোপালের বউ দাঁড়িয়ে, একা। কচিকাচাগুলো গেল কোথায়? প্রাণগোপালও এল না তো?

—ও বৌদিদি, ইদিকপানে এসো এট্টু, কথা ছিল।

পৃথা চমকে তাকাল। একটু আগের দিদিমণি ডাক বদলে হঠাৎ বৌদিদি যে? নাকি ছোঁয়াচ লেগেছে শাশুড়ির? তা বলুক না হয়। বাগচী বাড়ির বউ না হোলেও, পৃথা বৌ তো বটে। আরেক বাড়ির।

—কি বলছ?

—জিগিস্ করতিচি শাউড়িকে কিছু বলতি এস্ছিলে নাকি?

—কেন বল তো?

—শাউড়ির মতন আমিও এখুন আলতা পরাই দোরে দোরে। এ ঘর ও ঘর থিকে ডাক আসে। প্রাণগোপালের বউ গলা নামাল, তা গেরাম দেশের গরীব যজমানদের থিকি কত আর উপায় হয়। ঘরে এদিকে বড় অভাব...

প্রাণগোপালের বউ তাকিয়ে আছে আশায় আশায়। পৃথা নীরব। কথা বলবে কিভাবে? দুজন মানুষ যে ঢুকে গেছে বুকের ভেতর। পৃথার মা হাসতে চাইছে মধুর করে, তবে এসো মাঝে মাঝে। বাড়ি এসে আলতা পরিয়ে যেও।

মুনিয়ার মা বলছে, পাগল নাকি? ওসব এখন আউটডেটেড। দরকার নেই।

প্রাণগোপালের বউ বলছে, তুমি ডাকলেই যাই গো বৌদিদি। কলকেতাতে দু চার ঘর যজমান যদি পাইয়ে দাও...

কলকাতাতে মানুষ কোথায় আলতা পরার? তেমন তেমন প্রয়োজনে বিউটি পারলার মোড়ে মোড়ে। তাছাড়া মানুষ এখন...মুনিয়ার মা গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে চাইল অনেক কথাই। তার আগেই কি করে যেন কথা বলে ফেলেছে পৃথার মা, আমি থাকি বাবুর বাগান, ঢাকুরিয়ায়।

উঠোন পেরিয়ে রাস্তা, রাস্তা পেরিয়ে মাঠ, তারপর আকাশ। দিক্‌বিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে ঠিকানাটা—বাবুর বাগান, ঢাকুরিয়া। এই মাত্র ঢুকে গেল ঘরে ঘরে। এ ঘর থেকে ও ঘর, কুমোরপাড়ার ঘর, মালোপাড়ার ঘর...ও নলেন বউ, তুমিও এসো তবে। গুড় রাখব। ঝোলা গুড়, তালপাটালি, যখন যেমন। খেজুর রসও এনো শীতে। তারপর গল্প কোরো পা ছড়িয়ে। এর কথা, তার কথা।

এক ঠিকানা খুঁজতে এসে, এক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া। মনে মনে তাই কুড়িয়ে পৃথা কোথায়, পৃথার মা ফিরছে যেন শেষে। ভ্যান রিক্সায় একা একা। নীল সাদা শাল নেমে গেছে কোলের ওপর, জংলা আঁচল বাতাস বাতাস। বুকটা যখন তাপে তাপ, তখন কি আর ঠান্ডা লাগে? মাঘ-বিকেলেও?

নারীতান্ত্রিক

ভেতর বারান্দায় কলিংবেল বেজে উঠতে ধড়মড় করে উঠে পড়ল বিমান। রতনের বাপ কাজে এসে গেল? বাজে কটা? চোখ কচলে দেওয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। ছটা পঁয়ত্রিশ। ইশ, এত বেলা হয়ে গেছে! এরপর কখনই বা টুবলিকে স্কুলের জন্য তৈরি করবে, কখনই বা রান্না চড়াবে...! কালও অনুরাধাকে ভাত না খেয়ে অফিসে ছুটতে হয়েছে। রোজ রোজ এমনটা হলে অসুখে পড়ে যাবে না অনু! নাঃ, অতক্ষণ রাত জেগে কাল টিভি দেখা বিমানের উচিত হয়নি, নেশাটা এবার কমাতে হবে।

কদিন ধরে জম্পেশ শীত পড়েছে। গত সপ্তাহে কোথ্থেকে এক নিম্নচাপ এসেছিল কলকাতায়, ভরা ডিসেম্বরে ঝমঝম তিন দিন বৃষ্টি ঝরিয়ে যেই না মেঘ সরেছে ওমনি বাতাস একেবারে বরফ। বিছানা থেকে নেমে বিমান একখানা হাফ সোয়েটার চড়িয়ে নিল গায়ে, অনুরাধার কিনে দেওয়া জয়পুরী চাদর তার ওপরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বাইরে এসে দরজা খুলেছে।

ঘুম জড়ানো গলায় বলল—এত দেরি?

—বাপ্‌স, যা কুয়াশা! রতনের বাপ টুক করে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে, —টেরেন একেবেরে টিকির টিকির চলে, নড়তেই চায় না, নড়তেই চায় না।

—আসবে তো দুটো স্টেশন, তার জন্য কত বাহানা! সাধে কি তোমার দিদি ট্রেনের লোক রাখতে বারণ করেছিল! গজ গজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগোল বিমান—বাসনের কাঁড়ি জমে আছে, চটপট মেজে মশলাটা করে দাও।

রতনের বাপ আর বেশি রা কাড়ল না। বাসনের স্তূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সিংকের সামনে।

বিমান গ্যাস জ্বালিয়ে চায়ের জল বসাল। ফ্রিজ থেকে দুধ বার করে বসিয়েছে পাশের বার্নারে। কাপে চিনি দিতে দিতে টেরচা চোখে রতনের বাপের দিকে তাকাল—কাল ডুব মারলে যে বড়?

—গা গতরে কাল বড় বেদনা ছিল গো জামাইবাবু! বিছানা ছেড়ে উঠতিই পারিনি।

—শুধু মিথ্যে কথা। পরশুও বাড়ি যাওয়ার সময়ে দিব্যি সুস্থ ছিলে...

—নাগো জামাইবাবু। সত্যি। মহাদেবের দিব্যি। পরশু রাতে রতনের মা এমন পেটাল...মিছিমিছি...

—মিছিমিছি কেন হবে? নিশ্চয়ই কিছু করেছিলে।

—কিচ্ছু করিনি। কাজ সেরে ফেরার পথে ধরমবোনের সঙ্গে একটু দেখা করতে গেছিলাম, তাই নিয়ে সন্দেহ।...পুরুষমানুষ হয়ে জন্মানোটাই পাপ জামাইবাবু।

রতনের বাবার ওপর এবার একটু মায়া হল বিমানের। সত্যিই, রতনের মা-র বেজায় সন্দেহবাতিক, কারণে অকারণে বরকে মারধর করে। মহিলাকে দেখেছে বিমান, শুটকো হাড়গিলে চেহারা। ওই চেহারায় অত বল আসে কোত্থেকে কে জানে! বাজারে ডিম বিক্রি করে রতনের মা। পাঁচ বাড়ি ঠিকে কাজ করে রতনের বাপ যে কটা টাকা কামায় মাস পয়লায় তাও ছিনিয়ে নিয়ে বোতল বোতল চুল্লু গেলে। বেচারা রতনের বাপ!

চা নাড়তে নাড়তে বিমান বলল,—তুমিও বাপু কেমন যেন আছ। বউ যখন পছন্দ করে না, ধরমবোনের কাছে যাওয়া কেন? তোমার দিদি যদি কোন মেয়ের সঙ্গে মিশতে বারণ করে, আমি তার সঙ্গে মাখামাখি করতে যাব? পুরুষমানুষের স্বভাব চরিত্র নিয়ে কথা ওঠা কি ভাল?

রতনের বাপ শার্টের হাতায় চোখের জল মুছছে। বিমান চায়ের কাপ নিয়ে শোওয়ার ঘরে এল। অনুরাধা এখনও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে, কোলের কাছে টুবলি। মা মেয়ে দুজনেই খুব আরামপ্রিয়, কিছুতেই লেপের ওম ছাড়তে চায় না।

মশারি তুলে খুনসুটি করার ভঙ্গিতে লেপ টানল বিমান,—টুবলি ওঠ। স্কুল যাবি না? ...অ্যাই শুনছ? চা নাও!

টুবলি নড়েচড়ে উঠল। অনুরাধা নতুন করে লেপ ঢেকেছে গায়ে।

—ওঠো। উঠে পড়ো। সাতটা বাজে।

—উমমম্।

—আলসেমি কোরো না। যাও, চা খেয়ে নিয়ে আগে বাজারটা করে দাও।

অনুরাধা পাশ ফিরে শুল,—আঃ, জ্বালিও না তো। চা ড্রেসিং টেবিলে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও।

বিমান মুখ টিপে হাসল। কি বললে এক্ষুণি অনুরাধা লাফিয়ে উঠবে তা তার জানা। যেন দেওয়ালকে শোনাচ্ছে এমনভাবে বলল,—খবরের কাগজে আজ একটা দারুণ নিউজ আছে। তোমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টের এগারো পারসেণ্ট ডি-এ বেড়েছে।

কাজ হল। তড়াং করে লেপ ছেড়েছে অনুরাধা,—কই, কাগজ কোথায় দেখি।

—ব্যালকনিতে পড়ে আছে। বিমান মশারির খুঁট খুলতে খুলতে হাসছে,—গুলটা না মারলে তুমি উঠতে।

অনুরাধা বেজার মুখে চায়ে চুমুক দিল,—উফ, তুমি না—

বিমান আর দেরি করল না। মেয়েকে টেনে ঘুম থেকে তুলেছে। টানতে টানতে নিয়ে গেল বাথরুমে, হাতে ধরিয়ে দিয়েছে পেস্ট আর ব্রাশ। তারপরেই ছুট, দুদ্দাড়িয়ে রান্নাঘর। মেয়ের স্কুলবাস এসে যায় ঠিক পৌনে আটটায়, তার আগে মেয়ের একটা মোটামুটি জলখাবার তৈরি করে ফেলতে হবে। কি করবে? চাউমিন? হুঁ, ওতে সময় কম লাগে। সেদ্ধ করো আর ভাজো। মেয়েও ওটা পছন্দ করে। সঙ্গে একটু দুধ কর্নফ্লেক্সও খাওয়াতে হবে। দিন দিন সিড়িঙ্গে হয়ে যাচ্ছে মেয়ে। টুবলির স্কুলের টিফিন নিয়ে অবশ্য সমস্যা নেই। অফিস থেকে ফেরার সময়ে অনু কাল কলা আঙুর এনেছে, সঙ্গে ডিমসেদ্ধ আর চার পিস মাখন পাউরুটি দিলেই যথেষ্ট।

গরম জলে নুডল্‌স ছেড়ে দ্রুত হাতে পাঁউরুটিতে মাখন মাখাচ্ছে বিমান। কত কাজ এখন হাতে, কত কাজ। মেয়ের ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করতে হবে, স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে দিতে হবে, জামা জুতো পরাতে হবে মেয়েকে—। অনুরাধা তো একটু নড়েও বসবে না, পা ছড়িয়ে এখন খবরের কাগজ গিলবে। বাজারের থলি, তেলের শিশি সব মুখের সামনে ধরে না দিলে গাত্রোত্থানই করবেন না তিনি। টিকু টিকু করে বাজার এনেই চেঁচাতে শুরু করবে, শীগগীর ভাত দাও, আমার দেরি হয়ে গেল! বেরনোর আগে তারও আবার শতেক প্যাখনা। পাট পাট শাড়ি চাই। ব্লাউজের হুকটা ঢলঢল করছে, দুটো ফোঁড় দিয়ে দাও না! কাচা রুমাল কই আমার, কাচা রুমাল! টিফিনে আজ একটু স্যান্ডউইচ করে দিও না সোনা, রোজ রোজ রুটি তরকারি খেতে খেতে জিভে চড়া পড়ে যাচ্ছে! ও হ্যাঁ, বাজার যাওয়ার সময়ে অনুরাধাকে একটা ফিনাইল আনার কথা বলতে হবে, আর একটা আজিনামটোর প্যাকেট। আর এক ছড়া তেঁতুল। আর একটা কি যেন? আর একটা কি যেন? মনে পড়েছে। সুজি। মা মেয়ে কদিন ধরে সুজির পায়েস সুজির পায়েস করছে। সঙ্গে নতুন গুড়ের কথাও মনে করিয়ে দিতে হবে। নিজে থেকে তো কিচ্ছু গুছিয়ে আনে না অনুরাধা।

রতনের বাপ দুধের প্যাকেট এনে দিয়ে রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে অন্য বাড়ির বুড়ি ছুঁতে চলে গেল। গ্যাসের সামনে দাঁড়িয়ে খচাখচ ছুরি চালিয়ে পেঁয়াজ কুচোচ্ছে বিমান, টসটস জল গড়াচ্ছে চোখ বেয়ে।

দিন শুরু হল।

বছর দুয়েক হল অফিস থেকে লোন নিয়ে দু কামরার এই ফ্ল্যাটখানা কিনেছে অনুরাধা। বিয়ের পর থেকে একতলা ভাড়া বাড়িতে দিন কেটেছে বিমানের, বড় সাধ ছিল নিজস্ব আস্তানাটা অন্তত দোতলা তিনতালায় হোক। লটারিতে অনুরাধার একতলাই উঠল। কি আর করা, সব কিছু তো আর মনের মতো হয় না। আরও কত কীই তো মনে মনে ভেবেছিল। ডাক্তার বউ হবে, ইঞ্জিনিয়ার বউ হবে, নিদেনপক্ষে সিভিল সারভেন্ট কি প্রফেসার। কপালে যদি গভর্নমেন্ট অফিসের ইউ ডি লেখা থাকে তো বিমান করবেটা কি!

মনের দুঃখ মনে রেখে একতলার এই ছোট্ট ফ্ল্যাটখানাকেই সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়েছে বিমান। খাট, আলমারি, ড্রেসিংটেবিল, সোফা, টিভি ক্যাবিনেট, শোকেস, ডাইনিং টেবিহল, ফ্রিজ, ওয়াটার ফিল্টার সব মাপা জায়গায় ঠিকঠিক করে রাখা। বিমানের গোছানো রান্নাঘর যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। অনুরাধার বান্ধবীরা গা টেপাটেপি করে, কপাল করে এসেছিলি বটে অনু, এমন একখানা বর পেয়েছিস। আমাদের বরগুলো সব ন্যাদোসেরও ন্যাদোস। ঘর সাজানোর টেস্টই নেই। রান্না করতে গিয়ে হ্যালহ্যাল ঝ্যালঝ্যাল দশা। তাদের চোখ আরও কপালে তুলে দিতেই নিউমার্কেট গড়িয়াহাট ঘুরে ঘুরে টুকটাক শোপিস কিনে আনে বিমান। চিনেমাটির পুতুল, পিতলের ফ্লাওয়ার ভাস, পোড়ামাটির মুখোশ, আরও কত কি। ফ্ল্যাটের ছোট ব্যালকনিটা অনুরাধার ভীষণ প্রিয়, সময়ে অসময়ে ওখানে বসে থাকতে খুব ভালবাসে অনুরাধা। বসে বসে তারা দেখে, পথচলতি মানুষদের দেখে, অনেক রাত অবধি বিমানকে পাশে বসিয়ে অফিসের গল্প শোনায়, কিম্বা ছুটির দুপুরে চুল শুকোয় রোদ্দুরে। শুধু অনুরাধার ভাল লাগবে বলেই ব্যালকনিতে পাতাবাহারের টব সাজিয়েছে বিমান, অনুরাধার জন্য সুদৃশ্য একটা বেতের চেয়ারও কিনে রেখেছে।

গ্রিলঘেরা সেই ব্যালকনিতে এখন মিঠে রোদ খেলা করছে। মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে অনুরাধার চেয়ারটিতে এসে বসল বিমান। ভাত খেয়ে ওঠার পর এতক্ষণে কেমন গা ছেড়ে আসছে। মা মেয়ে দুজনেই নটার মধ্যে বেরিয়ে যায় বটে, তারপও কি হাঁপ জিরোবার অবসার আছে! কাজ কাজ আর কাজ। ঘরেও কোথাও এতটুকু ধুলো ময়লা বিমান একদম সহ্য করতে পারে না, আজও ঘুরে ঘুরে ঝাড়ল সব।

পনেরো দিন ধরে জমাদার ডুব মেরে বসে আছে, অ্যাসিড ফিনাইল দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করল। ওবেলার জন্য বাঁধাকপির তরকারি রাঁধল, আলুর দম করল...। তার মধ্যেই ঘোড়ায় জিন টেনে রতনের বাপ হাজির। একটুখানি নজর সরালেই বাবু ঘর দুটোকে ন্যাতাজোবড়া করে মুছে রেখে যাবে, তার পিছনে লেগে থাকতে হল কিছুক্ষণ। রতনের বাপের কাপড় কাচাও বিমানের একটুও পছন্দ নয়। সাবানজল থেকে তুলল, থুপল কি থুপল না, ধুয়ে মেলে দিল। আজও রতনের বাপ ধুয়ে যাওয়ার পর অনুরাধার অফিসে পরার শাড়িসায়াব্লাউজ আর সিল্কের সালোয়ার কামিজটা নতুন করে কাচতে হল বিমানকে। এতসব কিছু সারতে সারতে টুবলি ফিরে এল, তখন তাকে নিয়ে পড়ো। চান করাও, খাওয়াও, ঘুম পাড়াও। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে না নিলে সন্ধেবেলা পড়তে বসেই টুবলি ঢুলতে শুরু করে। আজ হোমটাস্কে টুবলিকে প্রচুরঅঙ্ক দিয়েছে, মেয়ের স্কুল ব্যাগ খুলে দেখে নিয়েছে বিমান। সন্ধে হলেই মেয়েকে ঘেঁটি ধরে বসাতে হবে।

ভাবতে ভাবতে ম্যাগনাম সাইজের চার পাঁচটা হাই তুলল বিমান। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে। উঁহু, ঘুমোলে চলবে না। এই শীতের বেলায় ঘুম মানেই সারা সন্ধে গা ম্যাজম্যাজ। সকাল থেকে খবরের কাগজে চোখ বোলানো হয়নি, উঠে নিয়ে আসবে ঘর থেকে? থাক, আলিস্যি লাগছে।

পাশের ফ্ল্যাটের সুব্রত ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে,—কি দাদা, কাজকর্ম সব সারা?

—এই খেয়ে উঠলাম। বিমান আর একটা হাই তুলল,—আপনার?

—আর বলবেন না। আমার ম্যাডাম আজ বাজার থেকে ইয়া ইয়া গলদা এনে হাজির। মালাইকারি খাওয়ার শখ হয়েছে। বসে বসে ছাড়াও, নারকেল কুরে দুধ বার করো, কম হ্যাপা!

সুব্রত শোনাচ্ছে। বর গভর্নমেণ্টের ইন্সপেক্টর তো, খুব.কাঁচা পয়সা। পোলাও মাংস কাবার ছাড়া কথা বলে না। তিনতলার অরিন্দম বলে সুব্রতর বউ নাকি বাজারে গিয়ে মাছ টাছের দর করে না। মাছওলার সামনে ঝড়াৎসে বাজারের থলি ফেলে দিয়ে বলে,—ওই ইলিশটা তুলে দাও, ওই চিতলটা কেটে দাও—! কপাল!

সুব্রত গ্রিলের ধারে সরে এসেছে। চোখের ইশারায় বিমানদের দোতলাটা দেখাল। চাপা স্বরে বলল,—ওপরে কি হচ্ছিল বলুন তো রাতে? চেঁচামেচি শুনছিলাম?

—যা হয় রোজ। বিমানের স্বরও সতর্ক, অফিস থেকে ফিরে শমিতা পেটাচ্ছিল রণজিৎকে।

—সেই মেয়েটা আবার বুঝি রণজিতের কাছে এসেছিল?

—তাছাড়া আর কি! ওই মেয়েটাকে নিয়েই তো যত গণ্ডগোল। রোজ দুপুরে ফ্ল্যাটে ঢলানি করতে আসবে...বউ যতই লিবারাল হোক, তারও তো সহ্যের একটা সীমা আছে দাদা। অমন মেয়েচাটা পুরুষ আর আমি দুটো দেখিনি। এত মার খায় তবু শিক্ষা হয় না! যে তোর ভাত কাপড় দেয় তুই তার কোন কথা মান্য করবি না!

—রণজিৎ তো বলে মেয়েটা তার পিসতুতো বোন।

—ছাড়ুন তো। যদি পিসতুতো বোনই হয়, কখনও সকাল বা সন্ধেয় আসে না কেন? শমিতা যেদিন লাথি মেরে বের করে দেবে সেদিন টেরটি পাবে। বাপের বাড়ি গিয়ে তো অনাহারে থাকতে হবে। জানেন তো, শ্বশুরবাড়ির সংসারও শমিতাই টানে। সাহায্য করে বলে দুটো খেতে পায় বুড়োবুড়ি। শমিতার মা তো শুনি পেনশানও পান না!

—হুঁ, রণজিৎটা...। সবই বুঝি, আবার মায়াও হয়। বেচারাদের এখনও বাচ্চাকাচ্চা হল না...কিছু নিয়ে তো একটা থাকতে হবে রণজিৎকে...সারাটা দিন একা একা বেচারা কাটায় কি করে!

—হচ্ছে না কেন? খুঁতটা কার?

—কি করে বলব দাদা! শমিতা তো একদিন আমার ম্যাডামকে বলছিল, রণজিৎকে এবার একদিন ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে।

—তাই?

কথা বলতে বলতে ঘুমঘুম ভাব পুরোটাই কেটে গেল বিমানের। এইসব পরনিন্দা পরচর্চা তার বেশ লাগে, শরীর মন ঝরঝরে হয়ে যায়। অনুরাধা এসব কূটকচালি পছন্দ করে না, এ ফ্ল্যাট ও ফ্ল্যাটের গোপন কথা শোনাতে গেলে বিরক্ত হয়। বলে, এসব না করে দুপুরবেলা তো কোন কাজের কাজ করতে পারো। অর্থাৎ সেলাই ফোঁড়াই, কি নতুন কিছু রান্নাবান্না, কিম্বা উল বোনা—।

কথাটা মনে হতেই বিমান নাড়া খেয়ে গেল। অনুরাধার কার্ডিগানটা অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে, ফাঁকা দুপুরে ওটা নিয়ে তো বসাই যায়। শীত থাকতে থাকতে তৈরি না হলে ওটা আর অনুরাধার কী কাজে লাগবে!

সুব্রত ব্যালকনিতে মেলা কাপড়চোপড় তুলে ভেতরে ঢুকে গেছে। ঘর থেকে উল কাঁটা নিয়ে চেয়ারে ফিরল বিমান। বুনছে টুকটুক। আর ইঞ্চিখানেক ঝুল বাড়ানোর পর বগল ফেলতে হবে। কাঁটা চালানোর ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট শ্বাস পড়ছে বিমানের। কত কিছুই তো শিখেছিল জীবনে। এম এ করেছে, কম্পিউটারের

একটা ছোট কোর্স নিয়েছে, এক মাস মাস-কমিউনিকেশনের ক্লাসেও তো—সব ভুলে গিয়ে উলের কাঁটাই এখন মোক্ষ। বিয়ের পর পরই যদি জেদ করে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়ত তাহলেই বোধহয় ভাল হত। পেয়েও ছিল তো একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে। অনুরাধা তখন করতে দিল না। বলল, বরের চাকরি করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। ঘরের বর ঘরের বরের মতো থাকো। সেই অনুরাধা এখন গল্প শোনায়, অমুকের বর এই চাকরি করছে, তমুকের বর ওই চাকরি করছে! নাঃ, বিমানেরই ভুল হয়েছে। জোর করে চাকরিটায় ঢুকে পড়লে অনুরাধা হয়ত এতদিনে মেনে নিত। সংসার ঠিকই চলত, টুবলিরও কিচ্ছু অসুবিধে হত না, কথায় কথায় বিমানকে হাত পাততে হত না অনুরাধার কাছে। নয় একটা রাতদিনের লোকই রেখে নিত। রতনের বাপকেই না হয়—

বিমানের বুক বেয়ে এবার একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস গড়িয়ে এল। যা হয়নি তা ভেবে আর কি লাভ! এবারকার পুরুষজন্মটা এভাবেই কেটে গেল। হাঁড়ি ঠেলে, ঘর সামলে, আর মেয়ে মানুষ করে।

টুবলি উঠে পড়েছে। উলকাঁটা গুছিয়ে ঘরে এল বিমান। সাড়ে তিনটে বাজে, মেয়েকে এবারে জিমন্যাস্টিকের ক্লাসে নিয়ে যেতে হবে।

ঘুম থেকে উঠেই টুবলি বল নিয়ে খেলতে শুরু করেছে। বিমান আলগা ধমক দিল মেয়েকে,—খেলা নয় টুবলি। দুধ খেয়ে রেডি হয়ে নাও।

সঙ্গে সঙ্গে টুবলি নাকি সুরে বায়না জুড়েছে,—উহুঁহু বাবা, আজ জিমন্যাস্টিকের ক্লাসে যাব না।

—কেন?

—এমনিই! ভাল্লাগছে না। আজ একটু শম্পা তিতলিদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলি না বাবা।

—না। তোমার মা খুব রাগ করবে। তোমাকে তো আর কিছু বলবে না, আমাকেই কথা শুনতে হবে।

টুবলির মুখ পলকে ভার। মেয়েকে পাত্তা না দিয়ে বিমান রান্নাঘরে এল, দুধের সঙ্গে চায়ের জলও বসিয়েছে। দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে আলমারি খুলে মেয়ের জিমন্যাস্টিকের পোশাক বার করল, ভরে নিল ব্যাগে। আজ মেয়েকে ক্লাবে ঢুকিয়ে অন্য বাবাদের সঙ্গে আড্ডা মারলে চলবে না, ঝট করে একবার গড়িয়াহাট ঘুরে আসতে হবে। লেপের ওয়ারগুলো ফেঁসে ফেঁসে গেছে, বদলানো দরকার। 'কৃষ্ণ সাজো' বুটিকে ভাল ভাল প্যান্টের পিস্ এসেছে, ফরেন জিন্‌সও—মোটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছে—ওখানে একবার ঢুঁ মারলে হয়। থাক গে, মাসের শেষ, এখন বুঝেশুনে

খরচা করাই ভাল—সামনের মাসের গোড়ায় বরং দেখা যাবে। আর এত জামাকাপড়ে তার হবেই বা কি! কবে কখন অনুরাধার সময় হবে, বর মেয়ে নিয়ে বেড়াতে যাবে, ঘরে তো আর নিত্যনতুন প্যান্টশার্ট পরে সঙ সেজে বসে থাকা যায় না! ও হ্যাঁ, মনে করে ফেরার সময়ে ইস্ত্রিওয়ালার কাছ থেকে পাঞ্জাবিটা নিয়ে নিতে হবে। অফিস থেকে ফিরে বিমানকে ফিটফাট না দেখলে মহারাণীর আবার গোঁসা হয়। আজ একবার সেলুনে ঢুকতে পারলেও বেশ হত। দাড়িটা একটু ট্রিম করাতে হবে, ঘাড়ের কাছের চুলটাও একটু...সময় কি হবে?

টগবগ জল ফুটছে চায়ের। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্য সোনালি আলোর আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছে জানালা দিয়ে। বিকেলটাকে ছকছে বিমান।

—এটা কী রান্না হয়েছে, অ্যাঁ? পুরো নুনকাটা!

—কোন্‌টায় নুন বেশি হয়েছে? বাঁধাকপি?

—আজ্ঞে না, তোমার এই আলুরদম। মুখে দিয়ে দেখেছ?

—এ হে হে হে, তাহলে বোধহয় দুবার নুন পড়ে গেছে। সরি৷

—পেঁয়াজও তো দিয়েছে গেদে। এখন কত দাম যাচ্ছে পেঁয়াজের জানো?

—অত চোটপাট করছ কেন? বললাম তো সরি।

—সরিতেই সাত খুন মাপ! অনুরাধা ভুরু কুঁচকোল,—বাজার হাটে তো যেতে হয় না। খাচ্ছ দাচ্ছ আর ঢেসকুমড়ো হয়ে বসে থাকছ। শুধু একটু খুন্তি নাড়ার কাজ, তাতেও এত হেলাফেলা!

বিমানের মুখ চুন হয়ে গেল।

অনুরাধার তবু রোষ কমল না। বিরক্ত মুখে বলল,—কোথায় মন পড়ে থাকে সারাদিন?

—মন সংসারেই থাকে। বিমান গোমড়া,—সংসারের বাইরে মন যাওয়ার উপায় রেখেছ? মুখ বুজে জোয়াল টানতে টানতেই তো জীবন গেল।

অনুরাধা আর কিছু বলল না। চুপচাপ খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। শাল জড়িয়ে ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে টিভি দেখছে।

বিরস মুখে টেবিল পরিষ্কার করল বিমান। রান্নাঘরে বাসন নামিয়ে ফ্রিজে তুলল খাবার দাবার, জগে জল ভরল। যান্ত্রিক হাতে পান সেজে অনুরাধার কাছে এসে বাড়িয়ে দিয়েছে।

পানটা মুখে পুরে আড়চোখে বিমানকে দেখল অনুরাধা, ঠোঁট টিপে হাসল। বিমান সরে যাচ্ছিল পাশ থেকে, খপ করে ধরেছে তার হাত—রাগ হয়েছে?

বিমান চুপ।
—একটা রিকোয়েস্ট করলে আরও রেগে যাবে?
বিমান গোঁজ।
—ঠাণ্ডায় উঠতে ইচ্ছে করছে না, একটু পিকদানটা এনে দাও না প্লিজ। কচকচ পান চিবোচ্ছে অনুরাধা—আর ওই টেবিলের ওপর রাখা জর্দার কৌটোটাও এনো।
এমনভাবে বলা যেন রাতে খাওয়ার পর বিমানের আয়েশ নেই, বিমানের শীতবোধ নেই, বিমানের কষ্ট নেই! নারী জাতটা কি এমনই নিষ্ঠুর হয়!
নিঃশব্দে আদেশ পালন করে খানিক তফাত রেখে সোফায় বসল বিমান। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট খাওয়া তার একমাত্র বিলাস, সেটাও ইচ্ছে করছে না আজ। স্থির চোখ এঁটে আছে টিভির পর্দায়। বীভৎস এক হরর মুভি চলছে, অনুরাধা এখন এসবই গিলবে। বিমানের আজ আর ফার্স্ট চ্যানেলের 'আ যা মেরি বাহোঁ মে' সিরিয়ালটা দেখা হবে না। কি আর করা, কর্ত্রীর ইচ্ছায় কর্ম।
আরও একটুক্ষণ বসে থেকে রান্নাঘরে চলে গেল বিমান। গ্যাস মুছল, সকালের মশলাপাতি বার করে রাখল, কোণের নর্দমার মুখটা ইট দিয়ে বন্ধ করল চেপে চেপে। রতনের বাপ দুধের ডেক্‌চি ঘষে না ভাল করে, ওষুধের খালি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে মাজল বাসনটাকে। কনকনে ঠাণ্ডা জল, হাতের আঙুলগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। শোওয়ার ঘরে এসে দেখল অনুরাধা মশারির ভেতর ঢুকে পড়েছে।
রাতবাতি জ্বালিয়ে বিমানও বিছানায় এল। টুবলির শোওয়া খুব খারাপ, গা থেকে লেপ সরে গেছে, মেয়েকে টেনে সোজা করে শুইয়ে ঢেকে দিল। নিজের লেপ গায়ে চাপিয়ে চোখ বুজেছে। বড় ক্লান্তি, বড় ক্লান্তি, মাথাটা টিপটিপ করছে।
হঠাৎই শরীরে অনুরাধার ছোঁয়া। লেপের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কাঁধ ধরে টানছে অনুরাধা। আলতো ঝাঁকি দিয়ে সরে গেল বিমান।
অনুরাধা বিমানের লেপের তলায় চলে এল,—এখনও রাগ করে আছ?
বিমান উল্টোদিকে ফিরে শুল।
—আর বোলো না, অফিসে আজ যা একটা বিশ্রী ব্যাপার হল না! ডেপুটি সেক্রেটারি বিনা কারণে আমাকে ডেকে ধাতাল। কি, না তার কোন রিলেটিভের পেনশান ফাইল নাকি আটকে আছে! যত বলি ম্যাডাম, ওটা আমার কাছে নেই—
ও, এই ব্যাপার। অফিসের রাগ বাড়ির বরের ওপর এসে দেখানো। বিমান ফোঁস করে শ্বাস ফেলল। বর তো ডাস্টবিন, বাইরের যত রাগ অপমান আক্রোশ, সব কিছু তার গায়ে ছুঁড়ে দাও।

অনুরাধা আর একটু ঘন হল,—এসো, কাছে এসো।

বিমান শক্ত হয়ে গেল। তপ্ত নারীনিঃশ্বাস ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর, সরু সরু পাঁচটা আঙুল মাকড়সার মতো খেলা করছে বুকে।

বিমান অল্প ঝেঁঝে উঠল,—আহ্ ঘুমোতে দাও।

—অমন করছ কেন? এসো না।

—আমার মাথাব্যাথা করছে। ভাল লাগছে না।

অনুরাধা বিমানের চুল ঘেঁটে দিল,—ঠিক আছে, অন্যায় হয়েছে। আর বকো না।

—সত্যি আমার মাথা ধরেছে।

—এসো, টিপে দিচ্ছি।

জোর করে নিজের দিকে বিমানের মুখটা ঘোরাল অনুরাধা। কপালে চকাঃ করে চুমু খেল। ঠোঁটেও।

আর উপায় নেই। যতই মাথা ধরুক আর যাই হোক, সব শরীর খারাপ এখা শিকেয় তুলতে হবে। বিমানের ইচ্ছে অনিচ্ছে ভাললাগা মন্দলাগা সমস্তই মূল্যহীন।

ধরা ধরা গলায় বিমান বলল,—এত করেও তোমার মন পাই না। সকা ক রাত উদয়াস্ত খাটছি, তোমার সংসার ছাড়া কিচ্ছু ভাবি না—কত কা বাবার সঙ্গে দেখা করতে পর্যন্ত যাই না—তবু পান থেকে চুন খসলে তোমা মুখ ঝামটানি।

অনুরাধা নয়, ছায়া ছায়া অন্ধকারে খল খল হেসে উঠল কেউ। অন্য কেউ। হাজার হাজার বছর ধরে আমরা অনেক সহ্য করেছি, এবার তোমাদের পালা। দ্যাখো কেমন লাগে!